ভ্রমণগদ্য

ভ্রমণসাহিত্যের কাগজ

বর্ষ ৮ সংখ্যা ১৯ ॥ মে ২০২৫

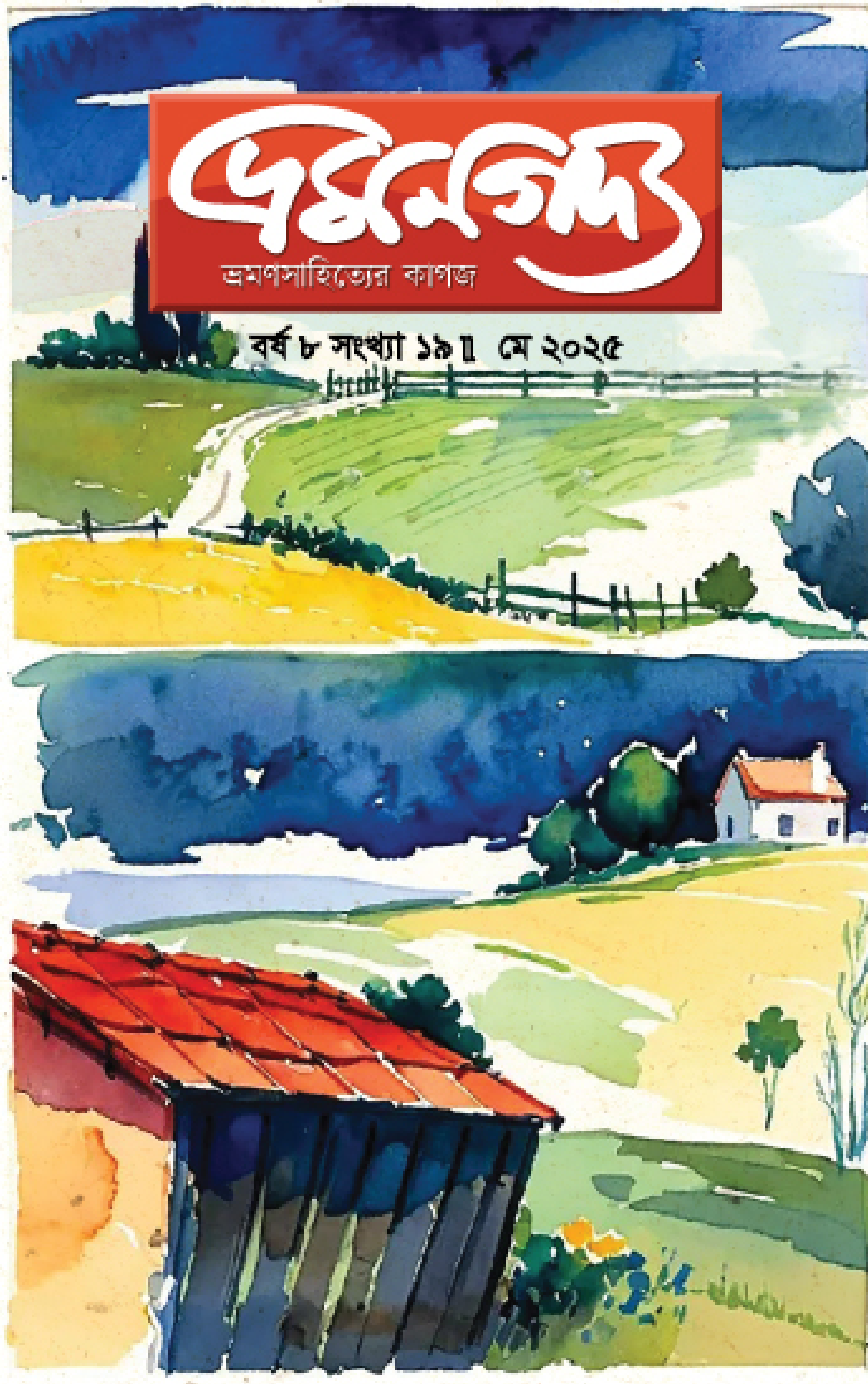

ভ্রমণগদ্য

ভ্রমণসাহিত্যের কাগজ

বর্ষ ৮ সংখ্যা ১৯ • মে ২০২৫

সম্পাদক

মাহমুদ হাফিজ

বর্ষ ৮ সংখ্যা ১৯ • মে ২০২৫

সম্পাদক
মাহমুদ হাফিজ

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
জুলেখা ফেরদৌসী

প্রচ্ছদ শিল্পকর্ম
আল নোমান

কর্মাধ্যক্ষ
হোসেন সোহরাব

অক্ষর বিন্যাস
আশিক হোসেন

মুদ্রণ
খাজা এন্টারপ্রাইজ
২২১/এ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মূল্য
২০০ টাকা

যোগাযোগ
প্রযত্নে- লিটল ম্যাগাজিন প্রাঙ্গণ
৭৯ আজিজ মার্কেট (দোতলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

Bhromongoddya
A Travelogue Magazine
Year 8 Issue19 || May 2025
Editor|| **Mahmud Hafiz**
Managing Editor|| **Zulekha Ferdousi**
Cover Art|| **Al Noman**
Illustration || **Ashik Hossain**
Manager|| **Hossain Sohrab**

Printing: **Khaza Enterprize**
221/A Fakirapool, Dhaka-1000
Price: **BDT 200 IR 150 USD 5**

Contact
C/O: Little Magazine Prangyan, 79 Aziz Market (1st Floor) Shahbag, Dhaka-1000
Email: bhromongoddya@gmail.com
FB: Facebook.com/bhromongoddya

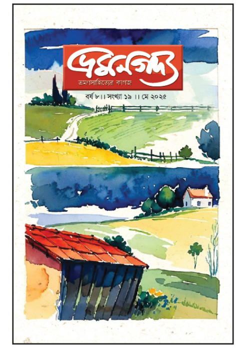

সূচিপত্র

ফকির আকতারুল আলম	৭	ভ্রমণ বিড়ম্বনা
কাজল চক্রবর্তী	১৩	মোদের গরব মোদের আশা
কাজী এনায়েত উল্লাহ	২১	ওন্টারিও লেক ॥ বেঁচে ফেরার বোটিং
কামরুল হাসান	২৬	ডুয়ার্স জঙ্গলে, সাহিত্য উৎসবে
চপল বাশার	৫৬	মালাক্কা: সংস্কৃতির সম্মিলন
জিকরুর রেজা খানম	৬৪	ভাইকিংদের দেশে
ড.ডি.এম. ফিরোজ শাহ্	১০৪	গাজী-কালু-চম্পাবতী
ফরিদুর রহমান	১০৯	মাল্টা: মদিনা থেকে রাবাত
বিশ্বজিৎ বড়ুয়া	১২০	বহুরূপী পাপের শহরে
মাসরুর-উর-রহমান আবীর	১৩৪	এক খণ্ড ঝাড়খণ্ড
মাহমুদ হাফিজ	১৪২	কালিম্পঙয়ের সেই সন্ধ্যা
লিজি রহমান	১৪৯	নায়াগ্রা ফলস দেখে মুগ্ধ
সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫৫	শরৎ কুঠি
সেলিম সোলায়মান	১৬৩	আমিরাত ভ্রমণে বিভ্রাট
স্বপন ভট্টাচার্য	১৬৯	হো চি মিন-এর দেশে

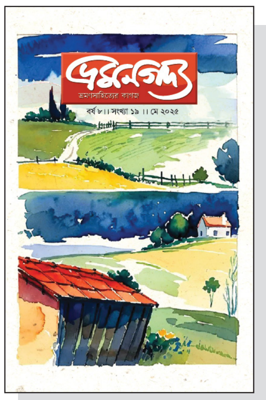

লেখা পাঠানোর নিয়ম

অভিজ্ঞতাময় ভ্রমণগদ্য পাঠানো সবার জন্য উন্মুক্ত

প্রথিতযশা ভ্রমণলেখকের পাশাপাশি নবীন ভ্রামণিক ও ভ্রমণলেখকদের লেখা সাদরে গৃহীত হয়
ইউনিকোড সমর্থিত ফন্টে ই-মেইলে সংযুক্ত করে লেখা পাঠাতে হয়
লেখার সঙ্গে ছবিতে ক্যাপশন সেভ করে ছবি পাঠাতে হবে
যোগাযোগের পূর্ণ ঠিকানা দিতে হবে যাতে লেখককে
সৌজন্য সংখ্যা পাঠানো যায়
ব্যক্তিগত যোগাযোগ অপ্রয়োজনীয়
প্রয়োজনে ভ্রমণগদ্যের পক্ষ থেকেই যোগাযোগ করা হয়

যোগাযোগ

E mail: bhromongoddya@gmail.com
https://www.facebook.com/Bhromongoddya

বাংলার স্বনামখ্যাত ভ্রমণকাহিনীসমূহ চমৎকার মুগ্ধপাঠের সাহিত্য– তা মীমাংসিত। সাহিত্য ক্যাটাগরির নাম ও কাঠামোয় নতুনত্বের প্রয়াসে 'ভ্রমণগদ্য' কাজ শুরু করে প্রায় দশক আগে। লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলেও শুরুয়াত করে দেয়া গেছে এবং ভ্রমণজনদের উৎসাহিত করা গেছে, তা কম কথা নয়।

প্রায়ই বলি, নতুন ঘরানায় পথ হেঁটে আকস্মিক ছবি ও ইতিহাস হয়ে যাওয়া ছোট কাগজের ভবিতব্য। ভ্রমণগদ্যের ক্ষেত্রে সেই নিয়তি দ্রুত অঙ্গীভূত হওয়া অনিবার্য, কারণ লেখা সঙ্কট। বাঙালির ভ্রমণ-পর্যটন চর্চা সনাতনকালীন ভূ-ভারতের গণ্ডি ছাড়িয়ে সপ্তাকাশে উড্ডীন হয়েছে, উৎকর্ষের শিখরে পৌঁছেছে; লেখার অভ্যেস রয়েছে তিমিরেই।

ভ্রমণগদ্যর শুভাকাঙ্ক্ষী ভ্রামণিকগণ দেশ-বিদেশ চষে বেড়াচ্ছেন। পাহাড়, নদী, মরু ও মেরু জয়ের খবর নিয়ত আসছে, কিন্তু ভ্রমণগদ্যের দফতরে আসছে না লেখা। এ নিয়ে আমাদের অভিমানের সীমা নেই! এ সংখ্যার লেখা আহ্বানের সময়ও নিয়মিত ও সম্ভাবনাময় ভ্রমণগদ্যকারদের ভ্রমণরত থাকতে দেখা গেছে। বৃন্দবার্তায় বার বার তাগাদা দেয়া হয়েছে ডেটলাইন দিয়ে। প্রত্যাশিত সাড়া মেলেনি। এখানে কবি নীরব।

বলা সঙ্গত, ভ্রমণগদ্যে যুক্তদের যুক্ততায় এ নগরে ভ্রামণিকদের প্রাতরাশ আড্ডার অভূতপূর্ব সকাল সম্মিলন শুরু হয়েছিল। সাতসকালে গল্পে বসে প্রাতরাশ করার সে সম্মিলন এখন 'দ্বিধা থর থর'। সম্পাদকের আগ্রহের আরেক কেন্দ্র অনলাইন 'ট্রাভেলটক'-এর ভ্রমণকথনও এখন নেই। 'সবেধন নীলমণি' ছোট কাগজের প্রকাশনাটি কেবল টিকে আছে।

ভ্রমণগদ্যর জীবনচক্র ছোট কাগজের নিয়তি-নির্ধারিত সময়ের চেয়েও কম প্রলম্বিত বলে ধারণা করি। দ্রুতই যদি এর প্রকাশনার পাট চুকোয়, সেটাই স্বাভাবিক হবে। যদি হয় তার ব্যত্যয়, বুঝতে হবে, এ ঘরানার নিয়মিত লেখকগণ কিংবা সম্পাদক স্বয়ং অতিনিবেদিত। সঙ্কটকে তুড়ি মেরে জাদুকরী হাতে বাঁচিয়ে চলেছেন ভ্রমণকে গদ্য বলার নতুন সাহিত্যচিন্তার প্রাণবায়ু!

ভ্রমণ বিড়ম্বনা

ফকির আকতারুল আলম

১০ জুলাই, ২০২৩। সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দর থেকে আমাদের দেশে ফেরার ফ্লাইট নম্বর SV-3802। জেদ্দা থেকে ফ্লাইট স্থানীয় সময় ১৪-৫৫ মিনিটে উড়ে বাংলাদেশের স্থানীয় সময় ১২-৪০ মিনিটে ঢাকায় পৌঁছানোর কথা ছিল। যাবার দিন ফ্লাইট নম্বর SV-3805, তারিখ ছিল জুন মাসের ১।

২০২৩ সালের হজ পালন শেষে আমরা আবার মক্কা শরীফ ফিরে এসে পবিত্র হারাম শরীফ থেকে ৮/১০ মিনিটের হাঁটা পথ দূরত্বের একটা হোটেলে উঠলাম। আটতলার একটা রুমে আমার সহযোগী সেনা কর্মকর্তা লে. কর্নেল হাফিজ আল আসাদ, অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৈয়দ শামসুল হক এবং আমার ছোট ভাই আবরার।

একদিন দুপুর ১২টায় সেনা কর্মকর্তা ও আমার ছোট ভাই আবরার হারাম শরীফে চলে যাবার পর আমি গোসলের জন্য বাথরুমে ঢুকলাম। হোটেলটা অনেক পুরোনো। সে জন্য এর সব ফিটিংসও পুরোনো আমলের। এসব

হোটেলে কাপড় শুকানোর বন্দোবস্ত তেমন ভালো নয়। সে জন্য আমরা চেষ্টা করতাম কাপড় যত কম ভেজানো যায়। আমি একটা বড় গামছা পরে বাথরুমে ঢুকে আরেকটা গামছা দরজার বাইরে রাখলাম। দরজা লক না করে ভেজিয়ে দিলাম। গোসল শেষে গামছা নিতে গিয়ে বুঝলাম, দরজা অটোমেটিক্যালি লক হয়ে গেছে। কোনোভাবেই খুলছে না। এদিকে আমি ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি গোসলে ঢোকার সময় শামসু চাচা রুমের বাইরে গেলেন ঘোরাঘুরি করতে। এদিকে আমি বন্দি কারাগারে, মানে বাথ রুমে। কোনোভাবেই দরজা খুলতে না পেরে জোরে জোরে শব্দ করতে শুরু করলাম। চাচাকে ডাকতে লাগলাম উচ্চস্বরে। ইতোমধ্যে শামসু চাচা রুমে ফিরে এসেছেন। তাকে জানালাম, আমি এখন বন্দি। তিনি নিজে বাইরে থেকে দরজা খোলার বৃথা চেষ্টা করে নিচে হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছে গেলেন।

আমি ভেতরে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছি আর আল্লাহকে ডাকছি উদ্ধার পেতে। কিছু সময় পর হোটেলের একটা টিম এলো যন্ত্রপাতি নিয়ে। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে তারা ফিরে গেল ব্যর্থ হয়ে। এবার মনের মধ্যে আতঙ্ক ভর করল। সেদিন আমার গায়ে সামান্য জ্বর ছিল। যে কারণে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে থাকায় কাঁপুনি বাড়ল, সাথে আতঙ্ক। তখন একমাত্র সৃষ্টিকর্তাকে ডাকা ছাড়া আমার সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই। ইতোমধ্যে আধা ঘণ্টার বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। বিদেশ বিভূঁইয়ে এভাবে বাথরুমে আটকে থাকা কতটা দুর্বিষহ, তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। জোরে জোরে আবার শামসু চাচাকে বললাম আমাকে উদ্ধারে ব্যবস্থা নিতে। তিনিও চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন।

পৌনে এক ঘণ্টা পর আবার হোটেলের একটা দল এসে দরজার লক ভেঙে আমাকে বিধ্বস্ত অবস্থায় উদ্ধার করল। আমি বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মহান আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনকে কৃতজ্ঞতা জানালাম। পরে ভাবছিলাম, অন্য দুই রুমমেটের মতো শামসু চাচাও যদি সেদিন বাইরে যেতেন, তাহলে কী উপায় হতো? বিদেশ-বিভূঁইয়ে হারিয়ে গেলে কেমন হয়? একমাত্র ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না এর সঙ্কট। কিছু চেনা নেই; ভাষা বুঝি না; যাবার জায়গা চিনতে পারছি না, তখন মনের কী অবস্থা! ঘটনা ২০২৩ সালের ১০ জিলহজ; সৌদি আরবে ঈদুল আজহার দিন। দিনটার শুরু ছিল মুজদালিফার ময়দান থেকে। আগের দিন হজ শেষ হয়েছে আরাফার ময়দানে। সেখান থেকে সন্ধ্যায় বাসযোগে মুজদালিফার ময়দানের উদ্দেশে রওনা হয়ে পৌঁছাতে ভোর ৪টা।

আধা ঘণ্টা ঘুমের কোশেশ করতেই আবার উঠে ফজর নামাজ আদায় করে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার হেঁটে শয়তানকে কঙ্কর মারার জন্য জামারা অভিমুখে যাত্রা। প্রথমেই সৌদি পুলিশের গোঁয়ার্তুমির কারণে অহেতুক কিলো দেড়েক অতিরিক্ত হাঁটা দিয়ে যাত্রা শুরু। আমার অভিজ্ঞতায় বলে, পবিত্র হজ পালনের জন্য সবচেয়ে কষ্টকর অধ্যায় হলো মুজদালিফার ময়দান থেকে জামারা পর্যন্ত যাওয়া। যাই হোক, আমি ও আমার মোয়াল্লিম এক সাথে জামারায় পৌঁছে যথারীতি শয়তানকে কঙ্কর মারার কাজ শেষ করলাম। এর পর তিনি যাবেন কোরবানির পশু জবাই করতে, আর আমি ফিরে যাব আজিজিয়া শেফালিয়ায়

আমাদের হজ-পূর্ববর্তী ডেরায়। যাবার পথ চেনা নেই। তিনি আমাকে কিছুটা বুঝিয়ে দিয়ে নিজের গন্তব্যে গেলেন। আমি দেখানো পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম।

প্রচণ্ড ক্লান্তিতে পথ চলা কষ্টসাধ্য, কিন্তু উপায় নেই গোলাম হোসেন। এ তো আর বাংলাদেশ নয় যে, দু'পা যেতেই রিকশা মিলবে। তীব্র তাপদাহ। এর মধ্যে এক জায়গায় পৌঁছালাম, কিন্তু আমার পথের কোনো দিশা নেই। অগতির গতি কোনো দেশি ভায়ের দেখাও পেলাম না। কতজনের কাছে আকার-ইঙ্গিতে সহায়তা চাইলাম, কিন্তু লাভ হলো না। তা ছাড়া আজিজিয়াতে আমাদের ডেরা ছিল একটা আবাসিক ভবন; হোটেল নয়। ফলে সেটাকে পরিচয় করানোও একটু কঠিন ছিল। বিধ্বস্ত অবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে হিলটন হোটেলের সামনে পৌঁছে দেখি বাইরে সিঁড়িতে বহু মানুষ বসে আছে, যার মধ্যে বাংলাদেশের মানুষই বেশি। আমিও বসে পড়লাম। গরম বাতাস বইছে; মুখ শুকিয়ে আসছে। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যে জিনিস, সেই পানিই নেই। কোথাও দোকানের সন্ধান পেলাম না। কতজনের কাছ থেকে পানি চেয়ে নিলাম। কারো কাছ এক ঢোক, কারো কাছ থেকে কয়েক ফোঁটা। এর মধ্যে কড়কড়ে রোদ্দুর ধেয়ে আসছে। সরে বসার জায়গা কমে আসছে। এক সময় দেখি কিছুটা সামনে একটা করে ট্যাক্সি থামছে; লোকজন হুড়মুড় করে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। একে তো আরবি ভাষায় কথা বলতে পারি না, তার ওপর শক্তিতেও কুলায় না। ফলে সেখানে ট্যাক্সির চেষ্টা না করে একটু পিছিয়ে গেলাম। সেখানে অবশ্য গাছের ছায়া মিলল। সেই সাথে পেলাম পানির উৎস, যদিও তা গরম। তারপরও পানি তো পানিই। সেটাই তখন অমৃত।

বসে বসে চিন্তা করছি, করণীয় কী? এর মধ্যে খবর পেলাম, দলের একাধিক সদস্য হারিয়ে গেছে। তারা কেউ কেউ আমার সাহায্য চাইছে। তাদের বললাম, আমি নিজেই হারিয়ে গেছি। দলের লোকদের জানালাম আমার অবস্থা। সেখান থেকে সাহায্যের কোনো আশ্বাস মিলল না। এর মধ্যে এক পাকিস্তানি হাজির সাথে কথা হলো, যিনি আমার মতো আজিজিয়া শেফালিয়ায় যাবেন। এখানেও ভাষা সমস্যা। তারপরও তাকে বোঝালাম, যাবার কোনো ব্যবস্থা হলে আমি তার সাথে আছি।

বসে বসে গরম পানি পান করছি আর চিন্তা করছি। এক সময় ভাবলাম, জোহর নামাজের জন্য কোনো মসজিদে ঢুকতে পারলে পানি সমস্যার সমাধান হবে। মোবাইল ফোনে চার্জ দেওয়া যাবে; গরম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, তারপর একটা চিন্তাভাবনা করা যাবে। কিন্তু দরকারমতো মসজিদের খোঁজ পেলাম না। সৌদি পুলিশের গাড়ি দেখে তাদের সাহায্য চাইলাম, কিন্তু মিলল না। তাদের কাছে পানি চেয়েও পেলাম না। হতাশা বেড়েই চলল। মনে মনে কিছুটা ভয় পেয়ে গেলাম। হঠাৎ একটা ট্যাক্সির ডাক শুনতে পেলাম– আজিজিয়া শেফালিয়া 'ছে' রিয়াল। শব্দটা শুনে ভালো লাগল। কিন্তু মেলাতে পারলাম না। আগেই শুনেছিলাম, এখান থেকে সাধারণ সময়ে আজিজিয়ার ট্যাক্সি ভাড়া ১০ রিয়াল। সেখানে হজের সময় 'ছে' রিয়াল; আমি ধরে নিলাম ৬ রিয়াল। সেটা বুঝতে পারলাম যখন 'ছে' মানে ১০০ রিয়াল, ততক্ষণে সেটা যাত্রী নিয়ে পগার পার। একদম হতাশ হয়ে বিধ্বস্ত অবস্থায় বসে আছি আর রাস্তার দিকে তাকিয়ে ট্যাক্সি খুঁজছি।

ইতোমধ্যে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে। এক সময় সব ছেড়ে একদম আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। অবিরাম আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামিনের কাছে উদ্ধার পাবার জন্য প্রার্থনা করতে থাকলাম। কিছু সময় পর হঠাৎ একটা কালো মাইক্রোবাস এসে সামনে দাঁড়িয়ে আজিজিয়া শেফালিয়া বলতেই কোনো প্রশ্ন না করে উঠে পড়লাম। দেখি চালক বাংলায় কথা বলছে। ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। শুনলাম, ভাড়া সেই 'ছে' রিয়াল। অর্থাৎ ১০০ রিয়াল, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১০ গুণ। এর মধ্যে দেখি পাকিস্তানি হাজি চাপাচাপি করে মাইক্রোতে সওয়ার হলেন। চালকের বাড়ি চট্টগ্রাম। অনেক সময় পর বাংলাতে কথা বলতে পেরে কী যে শান্তি! গাড়িতে বসে ভেবেছিলাম, দেশি ভাই ভাড়ার ব্যাপারে কোনো ছাড় দিতে পারে। কিন্তু না। তিনি 'ছে' রিয়ালই নিলেন। পাঠক এ পর্যন্ত পড়ে ভাবছেন, ভোগান্তি বোধহয় শেষ। জি না। খাটার মজা তলে। চালক নির্দিষ্ট এলাকার উল্টোদিকে নামিয়ে দিয়ে গেলেন। এবার আমার আবার পথ খোঁজা শুরু।

আমি একদম নির্জীব। চলৎশক্তি প্রায় রহিত। প্রচণ্ড তাপদাহের মধ্যে বহু কষ্টে খোঁজাখুঁজি করছি, লাভ হচ্ছে না। এর মধ্যে কতিপয় আফ্রিকান রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং আমাকে ইশারায় ডাকছে। আফ্রিকানদের সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে দ্রুত পা চালিয়ে প্রথমে একটা দোকান থেকে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস কিনে তেষ্টা নিবারণ করে মসজিদ খুঁজতে থাকি। ধারণা ছিল, মসজিদের সন্ধান পেলেই আমাদের আবাসস্থল খুঁজে পাব। অবশেষে মসজিদ পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলা গেল। অজু করে মসজিদে প্রবেশ করে জোহরের নামাজ আদায় শেষে বসতেই একজন এগিয়ে এসে বুঝিয়ে দিলেন, আমি নামাজ আদায় করেছি কিবলার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে। যাই হোক, আবার নামাজ আদায় করে মসজিদে গড়াগড়ি। মসজিদে প্রচুর পানি। এসি মিলে যাওয়ায় একটু স্বস্তি। কিন্তু আবাসস্থল খুঁজে না পাওয়ার অস্বস্তি থেকেই গেল। হঠাৎ নজরে পড়ল উল্টো দিকে। তাকিয়ে দেখি, আমাদের পরিচিত এলাকা। আমরা মসজিদের ঐ গেট দিয়েই ঢুকতাম। সে জন্য এই পাশটা আমাদের চেনা। আজকে আমি মসজিদে ঢুকেছি বিপরীত দিকের গেট দিয়ে। যে কারণে কিছু চিনতে পারিনি। পরিচিত দরজা দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠল। মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আবাসস্থলের দিকে যাত্রা শুরু করি, যার দূরত্ব ৫/৬ মিনিট।

সম্পূর্ণ শক্তিহীন অবস্থায় শুধু মনের জোরে এক সময় আবাসস্থলে পৌঁছালাম। কিন্তু তখনো কপালে ভোগান্তি ছিল। সাড়ে ৪০০ হাজির জন্য নির্ধারিত ভবনে সেদিন সব মিলিয়ে ছিলেন ১০/১২ জন। আমরা দোতলায় থাকতাম। এ জন্য কখনো ভবনের লিফটে উঠার দরকার পড়েনি। আমাকে বিধ্বস্ত অবস্থায় আবাসে ঢুকতে দেখে কাউন্টারের ছেলেটি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে লিফটে তুলে দিয়ে যায়। লিফটা সম্ভবত বাবা আদম (আ.)-এর আমলের। এ ধরনের লিফটে উঠার অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। লিফট যথারীতি দোতলায় পৌঁছাল; আমি অপেক্ষা করছি কোন সময় উনার দরজা খুলবে আর আমি বেরুবো। এদিকে উনি ভাবছেন, আমি কখন ঠেলে উনার দরজা খুলব। লিফটের দরজা খুলছে না, আমিও বেরুতে পারছি না। এদিকে মোবাইল ফোনের চার্জ শেষের দিকে। লিফটের মধ্যে নেটওয়ার্ক নেই। আমারো শরীরে কোনো শক্তি আর অবশিষ্ট নেই। ভাবছি, আল্লাহ পাক

কি শেষ পর্যন্ত বাইরে নিজের আবাসস্থলে পৌঁছে মারার আয়োজন করে রেখেছেন? যদি তা-ই করে থাকেন, তাহলে আমার কিছু করার নেই।

যেহেতু সেদিন ভবনে লোকসংখ্যা খুবই কম, সে জন্য কেউ আসছে না লিফট ব্যবহার করতে। এদিকে আমি অসহায় হয়ে আটকে আছি লিফটের দরজা খোলার অপেক্ষায়। কিছু সময় পর হতাশ হয়ে শেষ চেষ্টা হিসেবে লিফটে আঘাত করা শুরু করলাম। কিন্তু লোক নেই; শুনবে কে? এবার আমি সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে আবার আল্লাহকে ডাকতে শুরু করলাম। উদ্ধার পাবার সে কী আকুতি! বেশ কিছুক্ষণ পর পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। কী যে মধুর সে পদধ্বনি! অবশেষে একজন এসে সামনে থেকে হাতল ধরে টান দিতেই লিফটের দরজা খুলে গেল। আমার সামনে এক সৌন্দর্যময় পৃথিবীর আলোর উদ্ভাস। আবার মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। পরে দেখলাম, ঐ লিফট সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকলে দরজা ঠেললেই তা খুলে যেত। কিন্তু আমি বাঙালি, মাথায়ই আসেনি সৌদি আরবের মতো একটা ধনী দেশের বহুতল ভবনে মান্ধাতার আমলের লিফট থাকতে পারে, যাকে টেনে খুলতে হয়। ইতোমধ্যে ঘণ্টা খানেক অতিবাহিত।

আমরা নিশ্চিন্তে শুয়ে-বসে ফ্লাইটের অপেক্ষা করছি, হঠাৎ দেখি ডিসপ্লে বোর্ড থেকে আমাদের ফ্লাইটের তথ্য গায়েব। কোনো কারণ জানা নেই। অভিজ্ঞরা জানেন, এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ কখনো একবারে ডিলের পুরো টাইম জানায় না। অনিবার্য কারণে কিছু সময় পরপর সময় বাড়াতে থাকে। তবে আমরা বুঝতে পারলাম, কপালে খারাবি আছে। কিছু সময় পর নাশতার প্যাকেট নেওয়ার জন্য বোর্ডিং পাস হাতে লাইনে দাঁড়ানোর ঘোষণা এলো। আমি এদিন লাইনে দাঁড়াব না– এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সে জন্য অন্য একজনের হাতে বোর্ডিং পাস দিয়ে নাশতা সংগ্রহ করলাম। সময় যেতে চায় না। কয়েক ঘণ্টা ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত। অবশেষে ঘোষণা এলো বিমানে উঠার জন্য আবার লাইনে দাঁড়ানোর। বিশাল দীর্ঘ লাইন। আমি আগের বুঝমতো দূরে বসে লাইনের লোকদের দেখতে থাকলাম। সে লাইন ক্রমশ ছোট হতে থাকল। ওয়াশরুমের কাজটা সেরে নিতে চাইলাম; সেখানেও বিশাল ভিড়। লাউঞ্জ থেকে আমাদের বেশির ভাগ সহযাত্রী বিমানে উঠার ফলে লাউঞ্জ একটু খালি হতেই হুড়মুড় করে ঘানার এক দল হজযাত্রী ঢুকে গেল; শুরু হলো কিচিরমিচির শব্দ।

এক সময় ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে দেখি, লাইন একদম নেই, কিন্তু কাউন্টারে বেশ ভিড়। হাতব্যাগ নিয়ে সেখানে পৌঁছাতে শুনি এক যাত্রী বলছেন, সৌদি এয়ারলাইন্স আমাদের আগের চেয়ে ছোট এয়ারক্রাফট দেবার কারণে জনা ত্রিশেক যাত্রীকে অফলোড করা হবে। তারা পরে অন্য বিমানে যাবে। বিষয়টি আমার কাছে এতই অবিশ্বাস্য লাগল, আমি রীতিমতো তাকে ভর্ৎসনা করে বললাম, না জেনেশুনে এ ধরনের অবান্তর কথা বলেন কেন? পরে দেখি তার কথাই ঠিক। আমার ধারণা ছিল, সৌদিয়া এয়ারলাইন্সের এত বড় বিমান সংস্থার কি বিমানের অভাব পড়ছে যে, তারা দরকারের চেয়ে ছোট এয়ারক্রাফট দিয়ে যাত্রীদের অসুবিধায় ফেলবে? শেষাবধি তা-ই হলো।

আমার আত্মীয়স্বজন, মোয়াল্লিম, সহযাত্রী সবাই ইতোমধ্যে বিমানে আরোহণ করেছে। দলের মধ্যে আমি একা পড়ে গেছি। এবার মাথায় চিন্তা ঢুকে গেল, তাহলে কী হবে? পরদিন সকালে আমার যশোরের বিমান টিকেট করা রয়েছে। সেটা বাতিল হয়ে যাবে আগের বারের মতো। বড় কথা, দলবল ছেড়ে আমি একা কী করব, কোথায় যাব? এদের আরবি ভাষা তো কিছুই বুঝি না। আমার ভাঙাচোরা ইংরেজিও ওরা বোঝে না। চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আল্লাহকে ডাকছি উদ্ধার পাবার জন্য। দেখি সৌদি এয়ারলাইন্সের কিছু লোক তালিকা ধরে ধরে যাত্রীদের ডেকে বিমানে উঠতে বলছে। তারা তেমন ইংরেজি জানে না। আরবি স্টাইলে উদ্ভট উচ্চারণে বাঙালিদের নাম ডাকছে। আমি অনেকটা হতাশ। ভাবছি, কী হবে? আমার মোবাইল ফোন কাজ না করায় কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারছি না। অগত্যা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একেকজনের বিমানে উঠা দেখছি আর আমার নাম শোনার অপেক্ষা করছি।

ধৈর্য আর মানে না। এত সময় অপেক্ষার পর শরীরের শক্তিও আগের মতো নেই। নাম না ডাকলে কী হবে– চিন্তায় যখন মুহ্যমান তখন হঠাৎ শুনি উদ্ভট উচ্চারণে 'ফকির আকতারুল আলম'। যতই উদ্ভট হোক, এই শব্দটা কী যে আনন্দের তা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বিমানে আরোহণ করে সাথীদের দেখতে পাওয়ার অপার আনন্দ সত্যিই অপূর্ব। ফিসফিস করে বলে রাখি, এদিনের চার ঘণ্টা ফ্লাইট ডিলে কিন্তু আখেরে আমার জন্য লাভই হয়েছিল। পরদিন সকালে ঢাকা থেকে যশোরের ফ্লাইট ধরার জন্য চার ঘণ্টা ঢাকা বিমানবন্দরে বিরক্তিকর অপেক্ষা করা লাগেনি। কারণ সময়টা জেদ্দা বিমানবন্দরেই শেষ করে এসেছিলাম। ভাবছেন, এর পর ভোগান্তি শেষ? শুধু আরাম আর আরাম? অত সোজা নয়। কপালে আরো ভোগান্তি লেখা ছিল।

যথাসময়ে যশোরগামী ইউএস-বাংলার ফ্লাইটের জন্য লাইনে দাঁড়ালাম। হজযাত্রী হিসেবে স্বভাবতই লাগেজের সংখ্যা বেশি। সে জন্য এয়ারলাইন্স অতিরিক্ত ভাড়ার আয়োজন করতেই পিছনে তাকিয়ে দেখি এক সহকর্মী খালি হাতে দাঁড়িয়ে, বোর্ডিং পাসের জন্য। তাকে পাওয়ায় দু'জনে মিলে লাগেজের সুরাহা হয়ে গেল। আমার হাতে একটা ছোট ব্যাগে পাসপোর্টসহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ছিল, যেটা বিমানের লাগেজের সাথে নেবার কথা, কিন্তু তারা ভুল করে সেটা না নেওয়ায় সেখানে পড়ে থাকল, যা আমি জানতেও পারিনি। যথারীতি বিমানে উঠার পর এক ভদ্রলোকের সামনে ব্যাগটা পড়লে তিনি খুলে পাসপোর্টসহ গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র দেখতে পেয়ে আমার মোবাইল ফোনে কল করে সঙ্গত কারণেই না পেয়ে আমার বিকল্প জরুরি নাম্বারে বিষয়টি জানিয়ে দেন। আমি যশোর বিমানবন্দরে নামার সাথে সাথে বিষয়টি জানতে পারি। এর পর ইউএস-বাংলার যশোর কাউন্টারে কর্মরত আমার এক আত্মীয়ার সহযোগিতায় পরবর্তী ফিরতি ফ্লাইটে আমার পাসপোর্টসহ অন্যান্য কাগজপত্রের ব্যাগ হাতে পাই। এর পর ব্যাগেজসহ দীর্ঘ দেড় মাস পর বাড়ি ফিরে সব ভোগান্তির অম্ল-মধুর সমাপ্তি।

মোদের গরব মোদের আশা

কাজল চক্রবর্তী

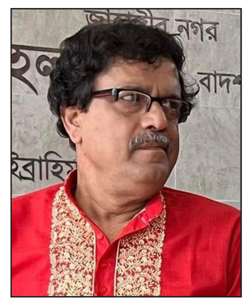

কথা হচ্ছিল পিটসবার্গ থেকে ফিলাডেলফিয়া এবং ওয়াশিংটন ডিসি কীভাবে যাওয়া যায়! কেননা, সঙ্গে রয়েছে বড় বড় দুটো ট্রলি ব্যাগ। একটায় জামা-কাপড়, অন্যটায় বই। ডান দিকে হাঁস অর্থাৎ বাগ্‌দেবীকে নিলে বাঁদিকে ঠাঁই হবে পেঁচার। অর্থাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুনের। তারপর! অজুহাত ছাড়া হাতে কিছুই থাকে না আর!

আমেরিকা ধনীদের দেশ। সকলেই অভ্যস্ত 'ব্যবহার আর বাতিল' নিয়মে। আমরা গরিব দেশের মানুষ সহজে কিছু ফেলে দিতে পারি না। দাঁত মাজার পেস্টের টিউব থেকে শেষ বিন্দু বের না হওয়া অব্দি শান্তি নেই আমাদের। দাঁত মাজার ব্রাশ ব্যবহারের মেয়াদ শেষ হলে তাকে দিয়ে আমরা বহু রকম কাজ করাই। এই কাজের বিবরণ কম-বেশি সকলেই জানি। অনেকেই খেয়াল করেননি, যারা জুতো রঙ করে, সেই পালিশওয়ালারা প্রথমে জুতো হালকা ব্রাশে ঘষে ধুলো

পরিষ্কার করে সোলে কালো রঙ লাগাতে ব্যবহার করে দাঁতের ব্রাশ। আমি নিশ্চিত, তারা নতুন ব্রাশ কিনে ব্যবহার করে না। আমাদের ফেলে দেয়া ব্রাশ অথবা তাদের ব্যবহৃত ব্রাশই জুতোর কাজে ব্যবহার করে।

একবার ঢাকা থেকে কলকাতায় ফেরার সময় ডিউটি ফ্রি শপে সেল চলছিল। সম্ভবত ১৯৯৩ সাল। দু'ডলারে আটখানা বিয়ারের ক্যান মহা আনন্দে কিনে ফেলি। ঝামেলায় পড়ি কলকাতা নেতাজী সুভাষ বসু আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে। কাস্টমস কিছুতেই দুটোর বেশি ক্যান নিতে দেবে না। আমিও নাছোড়বান্দা- সবই বাড়িতে নিয়ে যাব। একজন বলেই ফেললেন, আপনি কেন; অনেকেই এসব ডিউটি ফ্রি জিনিস নিউমার্কেটে বিক্রি করে যাতায়াত খরচ কিছুটা উসুল করে থাকে। তার ধারণা কতটা ভ্রান্ত– প্রমাণ করতে ক্যান খুলে ঢক ঢক বিয়ার গিলে এক ক্যান ফাঁকা করি। তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন– আমি খাওয়ার জন্যই নিচ্ছি; বিক্রির জন্য নয়। আমাকে সব বিয়ার নিয়ে বেরুবার অনুমতি দেন। মহা আনন্দে ফিরি এবং ধীরে ধীরে একাই ক্যানগুলো সাবাড় করি।

এবার আসল কথায় আসা যাক। বিয়ার খাওয়ার পর ফাইলে ঘষে ঘষে উপরের পাতলা ঢাকনা বের করেছিলাম। শেষে বহুদিন ওগুলো পেন, পেন্সিলসহ আরও কিছু জিনিস রাখবার কাজে ব্যবহার করেছিলাম। আর আমেরিকায় দেখুন, সবাই গিলছে আর ফাঁকা ক্যান অনায়াসে ফেলে দিচ্ছে ডাস্টবিনে। আমরা কিছু খাওয়ার পরে পকেটের রুমাল ব্যবহার করি। আর ওরা টিস্যু পেপার। টিস্যুর ব্যবহার সর্বত্র। অথচ দেখুন, সামান্য একটা রুমালের ব্যবহার রপ্ত করলে কত গাছ বাঁচে। এসব ভাবনা আমেরিকানদের নেই। তারা সামান্য কিছু নিয়ে ভ্রমণ করে। দাড়ি প্রায় সকলেই কাটে না। প্রয়োজনে সব কেনে, আর ব্যবহারের পর ফেলে দেয়। আমরা পারি না। সবকিছু সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণ করি। আমাদের লাগেজ বড় হয়। কেবিন লাগেজের ভাড়া গুনে আমেরিকার ডোমেস্টিক ফ্লাইটে চড়তে হয়। বেশি চড়া হয় বাস অথবা ট্রেনে। ওদের অ্যামট্রেক ট্রেনের ব্যবস্থা ভালো। কোনো পান্ট্রি কার নেই; আমাদের অসুবিধে হয় লম্বা ভ্রমণে চা-কফি না পেলে। ওদের হয় বলে জানি না।

অবশেষে প্ল্যান বদলে ঠিক হলো গাড়িতে প্রথমে ডিসি, পরে ফিলাডেলফিয়া, সব শেষে নিউজার্সি হয়ে পিটসবার্গ ফিরব। ঘটনাময় আমেরিকা ভ্রমণ নিয়ে গদ্য লেখা মুশকিল। আমি সব স্মৃতিতে ধরে রাখি। ঢাকার কবি কামরুল হাসানের মতো সব সময় নোট করবার অভ্যেস নেই। তার অভ্যেসটা ভালো, সব ঠিকঠাক তথ্য টুকে রাখে।

ওয়াশিংটন ডিসিতে জীবনে প্রথম গিয়েছিলাম বাবুল আদনানের সঙ্গে নিউইয়র্ক থেকে, বেশ রাতে। এবার গেলাম দিনের আলোয়। সঙ্গে অঞ্জনা, মোহনা, অর্কপল ও দেবলীন। বাইরে চকচকে নীল আকাশ। গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা হেটে পৌঁছুলাম ওয়াশিংটন মনুমেন্টের কাছে। অপূর্ব সুন্দর বাঁধানো জলাশয়ের মাঝ বরাবর আকাশের নীল রঙ নিয়ে জলের বুকে জেগে আছে ওয়াশিংটন মনুমেন্টের ছায়া।

পেছনে ওয়াশিংটন মনুমেন্ট

লোভ সামলাতে পারলাম না ছবি তোলার; দেবলীন তুলে দিল। ছবিটা আমার পছন্দ হলো। খানিক দূরে গেলাম লিঙ্কন মেমোরিয়ালে। বিশালকায় মন্দির। আব্রাহাম লিঙ্কনের কাজ ও জীবনকথা ধারিত হয়ে আছে তিন দিকের দেয়ালে। একদিকে প্রবেশপথ, থাক থাক সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে হয় এই বিশালকায় স্মৃতিমন্দিরে। এই দিকের দেয়ালে কিছু লেখার অবকাশ নেই কিংবা লেখা থাকলেও আমি হয়তো দেখিনি তখন। দেখি রাজকীয় ভঙ্গীমায় বসে থাকা পাথুরে আব্রাহাম লিঙ্কনকে। কী সুন্দর ও নিখুঁত কাজ ভাস্কর্যশিল্পীর! দেহ ও পোশাকের সব ক'টি ভাঁজ এমনকি কপালের বলিরেখা, চোয়ালের খোঁড়ল সব নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন পাথরের বুকে। সাদা পাথরের ওপর এ রকম নিখুঁত ভাস্কর্য আমি খুব কম দেখেছি। আমাদের এখানে মূর্তি বানাতে খুব বেশি সাদা পাথর ব্যবহার করা না হলেও বিদেশে তা করা হয় এন্তার। আর যেটা তাৎপর্যপূর্ণ, তা হলো মূর্তিগুলো পাখির বর্জ্য আর ধুলো ছাড়াই বেশি চেকনাই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, যা আমাদের এ অঞ্চলে সব সম্ভব নয়।

দেখলাম, লোকজন লাইন করে লিঙ্কনের ছবির কাছে দাঁড়িয়ে সেলফিসহ ছবি তুলে নিচ্ছে। ভেতরে ভেতরে লিঙ্কনের প্রতি ভক্তির উদয় হলো আমার। পাথরের ভাস্কর্যকে প্রণাম করলাম মনে মনে। বুঝলাম, 'লিঙ্কন টেম্পল' শব্দ ব্যবহার করার হিম্মৎ মার্কিনিদের আছে। সবাই একে লিঙ্কন মেমোরিয়াল বলে জানলেও ছবির উপরে লেখা আছে লিঙ্কন টেম্বল। লিঙ্কনের নিখুঁত ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে পর্যটকদের মতো আমিই তুলে নিলাম। আস্তে আস্তে নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে। এই সিঁড়ি থেকে ওয়াশিংটন মনুমেন্ট হয়ে মার্কিন সংসদ ক্যাপিটল হিল পর্যন্ত এক নজরে দেখে নেয়া যায়। অপূর্ব সেই দৃশ্য। চর্মচক্ষে না দেখলে বলে বোঝানো যাবে না।

দূর থেকে দেখলাম, তাজমহল বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মতো সাদা ধবধবে গম্বুজওলা প্রাসাদ। জানা গেল, আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের উদ্যোগে তাঁর সময়ে নির্মিত হয়েছিল জেফারসন মেমোরিয়াল। এদের অতীত ও ইতিহাস-চেতনা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। মনে পড়ে, ২০০৬ সালে প্রথম আমেরিকা

লিংকন মেমোরিয়ালের অভ্যন্তরে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাস্কর্য

ভ্রমণের সময় সম্ভবত আদনান ঐ প্রাসাদ দেখিয়ে বলেছিল, কাজলদা, ঐ যে হোয়াইট হাউস। আমি অপদার্থের মতো আমার রচনা সমগ্রের প্রথম খণ্ডে ঐ ছবিটা ছেপে দিই হোয়াইট হাউস ক্যাপশন লিখে! তবে সেই অজ্ঞতারও একটি শক্তি আছে। অভিবাসী পরিবার থেকে আসা হার্ভার্ডের এক শিক্ষার্থী 'পাওয়ার অব নোট নোইং' ধারণায় একটি বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে।

গাড়িতে উঠে কিছু দূর গিয়ে হাজির হলাম হোয়াইট হাউসের সামনে। বেশি নিকটে যাওয়ার উপায় নেই। লোহার জাল দিয়ে আটকানো। সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। স্থাপত্য দূর থেকে দেখাই ভালো। অভিন্ন জাতিগত অতীতের জন্যই হয়তো আমেরিকার প্রায় সব স্থাপত্যই ইউরোপিয়ান আদলে তৈরি। আমেরিকার আদি ও নিজস্ব কিছু এখন জাদুঘর আর ইতিহাসের পাতায় উঠেছে। সামনের সবকিছু দূরদেশ থেকে আমদানি।

এখন যে দুটি কাহিনীর উল্লেখ করে এই লেখার ইতি টানব, তা আমার জীবনের বেশ স্মরণীয় ঘটনা। প্রথমটা ঘটেছিল ইলিনয় রাজ্যের শিকাগোতে। ইচ্ছে ছিল, অনেক ঘোরাঘুরির ভেতরে শিকাগোতে গিয়ে উঠতে পারলে ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ব-মহাসভায় ভাষণ দেয়ার সেই জায়গাটা দেখে আসব। কেননা, সেখানে মঞ্চে উঠে বিবেকানন্দ প্রথমেই সম্বোধন করেছিলেন– আমার আমেরিকান ভাই ও বোনেরা। জায়গাটা সম্পর্কে আমার সম্যক ধারণা ছিল না। মেয়ে মোহনাকে নিয়ে গেলাম শিকাগো। সেখানে ওর স্কুলের এক সহপাঠী থাকে। এয়ারপোর্ট থেকে পামেলারা নিয়ে গেল ওদের নতুন বাড়িতে। অপূর্ব সুন্দর বাড়ি। তবে শিকাগো থেকে বেশে দূরে। ঢাকা থেকে গাজীপুরের দূরত্বের মতো হবে। না হলে ধরে নিতে পারি কলকাতা থেকে বর্ধমান। পরদিন ওদের বাড়ি থেকে ট্রেনে চেপে এলাম শিকাগো। হিসেব করে দেখা গেল, ওখানে যেতে হলে দু'বার বাস পাল্টাতে হবে। সেখানে যদি উবার নেয়া যায়, ডলার ও সময় দুই-ই বাঁচবে। উবার ডাকা হলো। ওটার ড্রাইভার এখানকার মতো নয়। ওখানে উবার যাত্রীর লোকেশনে পৌঁছে গাড়ির গেট খুলে অথবা কাচ নামিয়ে 'হ্যালো' বলে।

উবার এসে 'হাই' বলার পর উত্তরে পামেলা হ্যালো বলল। সাদা বর্ণের সেই উবার চালক সামান্য পথ এগিয়েই প্রশ্ন করল, তোমরা কি ভারতীয়? আমি ভাবলাম, হয়তো আমাদের বাংলায় কথাবার্তা শুনে ওর এই প্রশ্ন। কিন্তু না, ভারতীয় শুনেই জানতে চাইল তোমরা কি কলকাতার! উত্তরে আবার হ্যাঁ বললাম। লোকটা হুররে, ইয়াহু বলে চালকের আসনেই একটা লাফ দিয়ে উঠল। আমরা ভাবলাম, এটা আবার কী হলো! প্রশ্নের উত্তরে ড্রাইভাল জানাল, আজ নাকি তার একটা স্বপ্ন পূরণ হলো। বিষয়টা খুলে বলি। এই ভদ্রলোক প্রায় ২২ বছর ধরে ক্যাব চালায় শিকাগো ডাউন টাউন ও সাবার্বে। ট্যাক্সি ছেড়ে হালে উবার চালায়। তার স্বপ্ন ছিল, সে কলকাতার কোনো মানুষকে বিবেকানন্দ ভাষণস্থলখ্যাত আর্ট ইনস্টিটিউটে পৌঁছে দেবে। আজ সেটা পূরণ হতে চলেছে। মনে পড়ল, আমাকে এক রাজমিস্ত্রি

বলেছিল, বাবু, আমাদের রাজমিস্ত্রির জীবন তখনই সার্থক, যখন আমরা একটা পুকুরের ঘাটলা, একটা মন্দির আর একটা মসজিদে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে পারি।

আমি ড্রাইভারের নাম জানতে চাইলাম। সে জানাল, তার নাম জন, জন্ম গ্রিসে। তখন আমার বুকের ভেতরে কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছে। এ কী স্বপ্নের কথা জনলাম! মনে মনে বলছি, হায়! ভারতবর্ষ। কিছুদিন আগে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালনের হিড়িক পড়েছিল। বলাই বাহুল্য, পথের ধারে বড় বড় নেতা-মন্ত্রীর ছবি শোভা পেয়েছে ব্যানারজুড়ে, আর তাদের পায়ের দিকে এক কোণায় স্বামীজির ছবি। এ চর্চা প্রতি বছর জন্মদিনে দেখা যায়। এমনকি পশ্চিমবঙ্গে ভোটের সময় বিভিন্ন মনীষীর মূর্তিতে দলের পতাকা গুঁজে দেওয়া কোনো কোনো দলের কাছে ডালভাত।

বিষয়টা উবার ড্রাইভার জন-এর স্বপ্ন ঘিরেই শেষ হয় না। এখনো রয়েছে বাকি। শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটে পৌঁছে টিকেট কেটে ভেতরে গিয়ে দেখি, শুধু মিউজিয়াম, মূর্তি আর মূর্তি। সেই সভাগৃহ, যা দেখতে আমার এতদূর আসা, তা কোথায়? তবে কি আমরা ভুল জায়গায় এলাম! আমাদের ভাবনার হদিস জেনে নিতে হেল্প ডেস্কে জানতে চাইলাম, স্বামী বিবেকানন্দ এখানে ভাষণ দিয়েছিলেন; সেই জায়গাটা কোথায়? ডেস্কের কর্মী আমাদের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ১৮৯৩ সালে। বললাম, হ্যাঁ, সেটা ঠিক। কিন্তু আমরা ওই সভাগৃহ তো খুঁজে পাচ্ছি না! ওটা কি আর নেই? উনি বললেন, কে বলল নেই! ওটা এই ফ্লোরেই আছে; ঐ দিকে। ধন্যবাদ বলে নির্দেশিত পথে এগোতেই শুনলাম, ওটা সপ্তাহে একদিন খোলা হয়। আজ খোলার দিন নয়। ঘুরে দাঁড়ালাম। তার মানে, এতদূর এসে স্মৃতিময় জায়গাটা দেখা হবে না!

মেয়েকে বললাম, তুই ওদের মতো ইংরেজি বলিস। কথা বল, যদি কিছু হয়। মোহনা সেই মেয়েকে সহজভাবে বোঝাল, আমার বাবা ভারতের কলকাতা থেকে এসেছেন। আজ ওটা তোমরা না দেখতে দিলে আফসোস নিয়ে দেশে ফিরে যাবেন। বাবার জীবনে এখানে আর আসবে কিনা, আমরা জানি না। তুমি যদি সাহায্য করো, বাবার স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। কলকাতা শুনেই শ্বেতাঙ্গিনী আমার কাছে এগিয়ে এস বলল, তুমি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মভূমি থেকে এসেছ? ভালো, তোমাকে দেখানোর ব্যবস্থা করছি। মিনিটে পাঁচেক সময় দাও।

আমার প্রাণে খুশির তুফান বয়ে যাচ্ছে। দেখলাম, অসম্ভব তৎপরতার সঙ্গে মেয়েটা একের পর এক ফোন করে উপরের কারো অনুমোদন নিচ্ছে। এক বাংলা ভাষার সন্তানকে আরেক বাংলা ভাষার সন্তানের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানাতে সেই সভাগৃহের দরজা খুলে গেল। বাতি জ্বালিয়ে ভেতরে যেতে বলা হলো আমাদের। দেখলাম, সম্পূর্ণ কাঠের মেঝে চকচক করছে পালিশে। রেশমের পর্দা দেখে মনে হলো, ওগুলো অত পুরোনো আমলের নয়। তার মানে, এটার সংস্কার হয়েছে। আমার

পেছনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউস

প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি জানাল, হ্যাঁ, সভাগৃহের ভেতওে একটু বেশি সংস্কার করা হয়েছে। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে, চোখে আনন্দেও অশ্রুধারা।

পরের ঘটনা হোয়াইট হাউসের সামনের। ভেতরে অথবা খুব কাছে যাওয়া যাবে না। জালের খুব কাছে গিয়ে মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি যে বছর আগে দেখার সঙ্গে মিল বা অমিল আছে কিনা! একদম নিজের ভেতরে ডুবে ছিলাম। আমার এই পর্যবেক্ষণের মুহূর্তটি চুরমার হয়ে গেল মাইকে ঘোষিত এক আহ্বানে। ঘাড় ঘুরিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, কোন দিক থেকে আসছে এই আহ্বান। হোয়াইট হাউস দেখতে আসা দর্শকদের কাছে বিক্রির জন্য পসরা সাজানো। এটা সেটা, কেউবা বসে নিজের পোর্ট্রেট আঁকাচ্ছেন। পৃথিবীর প্রায় সব ট্যুরিস্ট স্পটের চিত্র একই রকম। কিন্তু এখানে কাঁচা-পাকা চুলের এক কালো লোক হেঁড়ে গলায় কোন ইংরেজি গান গাইছিলেন? তার দিকে চোখ যেতেই হাত তুলে আহ্বান জানালেন-

“হেই টলম্যান, বেঙলাদেশি, প্লিজ কাম অ্যান্ড সিং ‘আমার সোনার বেঙলা আমি তুমায় বালোবাসি’।”

আমি অবাক। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। যারা ট্যুরিস্ট স্পটে থাকে তাদের ভাষাজ্ঞান দারুণ। কাজ চালাবার মতো বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারে। এরা চেষ্টা করে অন্য ভাষাকে ব্যবহার করে কিছু কামিয়ে নেয়ার। আমাদের বাংলায় ভোট চাইতে এসে ভিন্নভাষীরা যেমনটা করে থাকে। তাদের মুখে নিজের ভাষা শুনে গলে যাই আমরা। যা হোক, সেই ভদ্রলোকের আহ্বানে সাড়া দিতে হাত তুলে ইঙ্গিত করলাম, আমি আসছি।

ভদ্রলোকের কাছে যেতেই দেখলাম তার অপরিচ্ছন্ন দাঁতের নির্মল হাসি। হাতের মাইক্রোফোনটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, নাও, তুমার বেঙলা গান গাও। আপোশের মানুষের নজর ততক্ষণে আমার ওপর। অনুমান করলাম, চারপাশে বেশ কয়েকজন ভারতীয়ও আছে, তবে তাদের বাঙালি বলে মনে হলো না। আমি ইংরেজিতে ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, “আমি ভারতবর্ষের কলকাতা থেকে এসেছি। ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ গানটি যিনি লিখেছেন, তিনি এশিয়া উপমহাদেশের প্রথম নোবেলজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আপনারা শুনে আশ্চর্য হবেন, তিনি একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর লেখা তিনটি গান তিনটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত। ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত; ‘জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা’ ভারতের জাতীয় সঙ্গীত; ‘শ্রীলঙ্কা মাতা, অপ শ্রীলঙ্কা, নম নম নম মাতা’ শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীত।” শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতটি রবীন্দ্রনাথের লেখা, নাকি তাঁর ছাত্র আনন্দ সামারাকুনের, সেই বিতর্ক আর এখানে উল্লেখ করলাম না।

চারপাশ হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠল। দূর থেকে একটি ছেলে বলে ওঠে, ‘ভালো বলছেন দাদা। এত কাহিনী তো জানতাম না।’ হেসে জানতে চাইলাম, বাংলাদেশের কই থাকেন?

–চাঁদপুর।

–ওহ্! ইলিশের জায়গায়?

–জি।

–সব ইলিশ না ধইরা কিছু আমাগো দিকেও পাঠান।

–(হেসে) জানেনই তো, আমরা অতিথিপরায়ণ!

আমি আনন্দে চোখ বুজে ফেলি। শুনতে পেলাম কেউ গাইছে, ‘মোদের গরব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা’। চোখ খুলে দেখি সেই কালো লোকটির হাতে দেবলীন একটা ১০ ডলারের নোট তুলে দিচ্ছে।

ওন্টারিও লেক ॥ বেঁচে ফেরার বোটিং

কাজী এনায়েত উল্লাহ

মামাতো বোন গুলশান দীর্ঘদিন ধরে কানাডার টরোন্টোতে সপরিবারে বসবাস করে আসছে। আমাদের কারোরই আটলান্টিক মহাসাগরের ওপারে যাওয়া হয়ে উঠছিলো না। প্রিয় বোনটার বড় আক্ষেপ, ইউরোপ থেকে শুধু আটলান্টিক পাড়ি দিলেই কানাডায় আসা যায়, তবু বছরের পর বছর ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। টেলিফোনে আলাপ হলেই বোন, ভগ্নিপতি ও ভাগ্নীদ্বয়ের কণ্ঠ কান্নায় আড়ষ্ট হতো। এরপরও আমরা যেন সময় করতে পারি না।

শেষ অবধি সিদ্ধান্ত নিলাম শুধু তাকে দেখতে হলেও কানাডায় যাবো। আর সুযোগ মতো ভ্রমণ করে আসবো নায়েগ্রা জলপ্রপাতসহ দর্শনীয় সব স্থান। এতে ‘রথ দেখা কলা বেচা’ দুইই হবে। বোনও সন্তুষ্ট হলো, আমাদেরও বেড়ানো হলো।

গুলশান, তার স্বামী ও দুই কন্যা আমাদের যাওয়ার খবরে উচ্ছ্বসিত। তারা তাদের অন্য সব পরিকল্পনা

বাতিল করে আমাদের সঙ্গে সময় কাটানোর প্রস্তুতি নিলো। আমাদের জন্য নানারকম ভ্রমণ পরিকল্পনা সাজিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুণতে লাগলো। এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে দূরালাপনীতে প্যারিস-টরেন্টোর মধ্যে প্রতিদিনই আলাপ চলতে লাগলো।

আমার স্ত্রী, তিন পুত্র রায়হান, রিমান ও রোমানসহ আমরা সপরিবারে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছি। পরিবারের সকলের স্বস্তির কথা বিবেচনা করে প্যারিস টরেন্টো আট ঘন্টার সরাসরি ফ্লাইট বুকিং করে ফেলেছি। লন্ডন-আমেরিকাসহ অন্যান্য রুটে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইলাম না। প্যারিস টু টরেন্টো সরাসরি ফ্লাইটের টিকেট আমাদের পরিবারের সবার পছন্দ হলো। শেষাবধি একদিন প্যারিসের শার্লে দ্য গল বিমানবন্দর থেকে উড়াল দিলাম কানাডার পথে। যথারীতি টরেন্টো পৌঁছে গেলাম।

কানাডাপ্রান্তে ভগ্নিপতি জিয়া দশ আসনের বিলাসবহুল গাড়ি ভাড়া করে রেখেছিল। পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, আমরা বিমান বন্দর থেকে মধ্যাহ্নর সারার জন্য শুধু তাদের বাসায় যাবো, লাঞ্চ সেরে ভাড়া গাড়িতেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বো। প্রথমদিনই চলে যাবো নায়েগ্রা জল প্রপাত দেখতে। টরেন্টো ভ্রমণের প্রথম দর্শনই যাতে বিশ্বখ্যাত জলপ্রপাত দিয়ে হয়, এরকম ব্যবস্থা ও পরিকল্পনা করে রেখেছিল তারা। বাসায় পৌঁছে দেখি আমাদের সকলের প্রিয় বিরয়ানীসহ নানা খাবারের বিপুল আয়োজন। বোন খুব যত্ন করে আমাদের খাওয়ালো। দূরের ভ্রমণে বের হচ্ছে বলে ছেলে মেয়েদের জন্য কিছু খাবার সঙ্গে করেও নিয়ে নিলো। আটঘন্টার বেশি ভ্রমণে আমরা ক্ষুধার্ত, বিপরীতে চিকেন বিরিয়ানী খুব সুস্বাদু। তাই সবাই মজা করে উদরপূর্তি করে নিলাম আরেকটা লম্বা ভ্রমণ শুরুর আগে।

বিমানবন্দর থেকে বাসা আর বাসা থেকে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের কানাডাপ্রান্ত পর্যন্ত ভগ্নিপতি জিয়া একাই ড্রাইভ করলো। আমি কিছু সময় চালানোর প্রস্তাব করায় বললো যে ড্রাইভ করতে তার খুব ভালো লাগে, সহজে তার ক্লান্তি আসে না। তাছাড়া হাজার হাজার কিলোমিটার রাস্তা গাড়ি চালিয়ে সে কানাডা আর যুক্তরাষ্ট্র চষে বেড়িয়েছে। এরকম ড্রাইভে তার আনন্দই হয় বেশি। আমি ক্লান্ত থাকায় তাকে আর পীড়াপীড়ি না করে ঘন্টা দুয়েক গাড়ি চলার গতির দোলায় ঝিমিয়ে নিলাম।

নায়েগ্রা জল প্রপাত কানাডার দিক থেকে দেখতেই বেশি মনোরম। এপার থেকে ওপারে আমেরিকার বাফেলো প্রান্তের জলপ্রপাতও নজরে আসে। এতো জলরাশি কোত্থেকে আসে ? কোথায় যায় ? এ প্রশ্ন অনেকেরই। জলপ্রপাতের ইতিহাস উইকিতে বিস্তারিতভাবে আছে, তাই আর চর্বিতচর্বন করছি না। যাহোক, সন্ধ্যায় পানির সঙ্গে আলোর রঙ্গিন খেলা-লাইট এ্যান্ড সাউন্ড শো দেখে মুগ্ধ হয়ে আমরা নৈশাহারে গেলাম। তারপর হোটেলে ফিরে দ্রুত ঘুমাতে গেলাম।

পরদিন সকাল বেলা ভরপেট নাস্তা করে রওয়ানা হলাম চারশ' কিলোমিটার দূরের ওন্টারিও লেকের পাশে টবারমৌরিতে। এখানে দেখলাম ফ্লাওয়ার পট। হোটেলসহ পুরো টুর প্লান সব আগে থেকেই তৈরি ছিল। সময় মতো গন্তব্যে পৌঁছেও গেলাম।

দেখি, ওন্টারিও লেক- লেক তো নয় যেন বিশাল সমুদ্র। এপার থেকে ওপার কিছুই দেখা যায়না। গেলাম ফ্লাওয়ার পট দেখতে। লেকের বরফশীতল পানির হাজার বছরের

রেস্তোরাঁয় আমরা দুজন

ঢেউ পাশে দাঁড়ানো পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ পর্যন্ত ফুল রাখার পটে রূপ নিয়েছে। দূর দূরান্ত থেকে হাজার দর্শনার্থী তা দেখতে ছুটে আসছে প্রতিদিন ।

মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপভোগের জন্য লেকের পারে মাঝে মাঝে শত বছরের পুরনো কাঠের বেঞ্চ বসানো। বহু ব্যক্তি এগুলো দান করেছেন। যারা দান করেছেন কাঠ খোদাই করে তাদের নাম লেখা আছে। ক্লান্ত ভ্রামণিকদের ক্ষণিক তিষ্ঠানোর জন্য এগুলো বসানো। লেকের পাশে এক জায়গায় নৌকা ভ্রমণ এবং দর্শনার্থীদের জন্য খাবারের দোকান সহ কিছু স্যুভেনির শপ আছে। আমরা সবকিছু উপভোগ করতে করতে এটা ওটা কিনলাম।

ওন্টারিও লেক বলি আর পৃথিবীর অন্য কোন পর্যটন স্পট বলি, ভ্রমণে গিয়ে আপনি যদি সেখানকার দর্শনীয় স্থান দর্শনের পাশাপাশি এ্যাক্টিভিটি করেন, বা সশরীরে অংশ নেন তাহলে ভ্রমণানন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়। ওন্টারিও লেক ভ্রমণে আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিই, সবাই মিলে লেকে রাবার বোটিং করবো। তিন সন্তানসহ আমরা চার আর বোনের দুই কন্যাসহ চারজন, মোট আট সদস্যের বৃহৎ পরিবারের সবাই বোটিংয়ে আগ্রহী। আমার ছেলেদের মা সাঁতার না জানার জন্য নৌকা চালানোয় আগ্রহী হলো না।

লেকে চলছে লাল রঙের বোট। একেক বোটে দুজন করে বসা যায়। বুক পর্যন্ত ভিতরে গলিয়ে দিয়ে দুজনই দু হাতে দুটো বৈঠা দিয়ে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং চালাতে হয়। বড় ছেল রায়হান গেলো রিমানকে নিয়ে আর আমি চড়লাম ছোট ছেলে রোমানকে নিয়ে অন্য নৌকায়। বোন তার স্বামী এবং দুই মেয়ে আরও দুটো নৌকায় উঠল।

রেস্তোরায় তিনপুত্র

লেকের নীল স্বচ্ছ পানি আর সূর্যের প্রখর উত্তাপ সব মিলে আমাদের নৌযাত্রা ছিল খুব আনন্দের। সাগরসম লেকের এপার থেকে ওপার খালি চোখে নজরে আসেনা। তাই আমরা রওয়ানা দিলাম দিগন্তের ওপারে যাওয়ার। চার নৌকার প্রতিযোগিতায় রায়হান আর রিমান ছিলো অগ্রগামী, আমদের বাকী তিন নৌকার গতি ছিলো কম এবং পানি ছোড়াছুড়ি খেলার সঙ্গে তাল মেলানো।

একসময় লক্ষ্য করলাম, রায়হান আর রিমানের নৌকা আর নজরে পড়ছেনা। একটু আতঙ্কিত স্বরেই তাদের নাম ধরে ডাকলাম, কোন সাড়াশব্দ নই। জোরে মিনিট দশেক নৌকা চালানোর পর নজরে আসলো দূরে কিছু একটা চিৎ হয়ে পানিতে ভাসছে। আকস্মিক ভয়, আতঙ্ক মনটাকে গ্রাস করে ফেললো। বোন গুলশান তো ডুকরে কেঁদে উঠলো আর নানা বিলাপ আরম্ভ করলো। ওর মেয়েদেরও একই অবস্থা। জিয়াকে বললাম যে এ অবস্থায় সে যেন তার সহধর্মিনী আর দুই মেয়েকে নিয়ে ঠান্ডা মাথায় তীরে, বা যেখান থেকে এসছিলাম সেখানে ফিরে যায়। আর এখনই ভাবীকে খবর না দেয় সে ব্যাপারে সাবধান করে দিলাম।

আমি রোমানকে নিয়ে যথাসম্ভব স্থিরভাবে সমস্ত শক্তি দিয়ে বৈঠা বাইতে লাগলাম। তখনও বোন গুলশানের প্রলাপ দুর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম। সে বলছে কেন আমি আমার ভাই ভাবী বাচ্চাদের এখানে নিয়ে আসলাম? ওদের যদি কিছু হয় তাহলে আমি ভাবীকে কি জবাব দেবো, নিজেকে কীভাবে ক্ষমা করবো !

লেকের সামান্য ঢেউয়ের বিপরীতে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে বৈঠা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখতে পেলাম ডুবো নৌকার প্রতিচ্ছবি আর দুটো মাথা নৌকা ধরে ভাসছে। মনের ভয় কিছুটা কেটে গেল। সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে ডাকলাম রায়হান, রিমান, তেমন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। দশ মিনিট পর নৌকার কাছে এসে যা দেখলাম তাতে হৃদয় জুড়িয়ে গেল। রায়হান রিমানকে খুব কাছ থেকে এক হাতে ধরে রেখেছে আর অন্য হাত ডুবো নৌকার ওপরটা শক্তভাবে ধরা।

রিমান আমাকে দেখে একটাই শব্দ করলো 'বাবা'। মহান আল্লাহর কাছে ঐ মুহূর্তে আমার কৃতজ্ঞতার কোন ভাষা রইলো না। বললাম রায়হান, রিমান কোন ভয় নাই, আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন। তোমরা এক হাতে তোমাদের নৌকা আর অন্য হাতে আমাদের নৌকা ধরে ভেসে থাকো। আমি বৈঠা চালিয়ে তীরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবো। আমি আর ছোট ছেলে রোমান গায়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে নৌকা চালাতে লাগলাম। মিনিট চল্লিশেক চলার পর একটা টিলার মতো জায়গা নজরে পড়লো। ক্লান্তি নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাথরের সমষ্টিতে পানিতে জেগে উঠা টিলাটিতে পৌঁছতে সক্ষম হলাম। সবাই পাথরের ওপর দাড়ানো পর মনে হচ্ছিলো যে কতো বছর মাটিতে পা রাখিনি। সমস্ত শরীর তখনও কাঁপছে।

চারজন মিলে দুটো নৌকাকেই সম্পুর্ণ পানিমুক্ত করে সবাই ধাতস্থ হলাম। আবার চড়ে বসলাম নৌকায়। তিন সন্তানকেই বললাম আর ভয় নেই, আমরা আল্লাহর রহমতে বেঁচে গেছি, আস্তে আস্তে পানি অতিক্রম করে তীরে পৌছাবো ইনশাল্লাহ।

ঘন্টা খানেক পর যখন আমরা লেকের ঘাটে পৌছলাম, তখন সূর্য পশ্চিম দিকে লাল আভা ছড়িয়ে ডুবন্তপ্রায়। দূর থেকে দেখলাম গুলশান সহ উদ্বিগ্ন সবাই ঘাটে দাঁড়িয়ে, আমাদের দেখে চিৎকার করছে আর সবাই ঠিক আছি কী না জানতে চাচ্ছে। আমরা কেউই তখন আর উত্তর দেয়ার মতো অবস্থায় নেই।

তীরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমার তিন সন্তান রায়হান, রিমান ও রোমানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই আবেগ- অনুভূতি অনির্বচণীয়।ভাষার কী সাধ্য যে স্বজনের সেই আবেগকে শব্দে ধারণ করে? তা স্বর্গীয়, অকল্পনীয়। আমি প্রথমেই ওদের জিজ্ঞেস করলাম যে ছেলেদের মা ব্যাপারটা জানতে পেরেছে কি না? ওরা সমস্বরে জবাব দিলো- না, উনি কিছুই জানেন না। বললাম, তাহলে তাকে কিছুই বলার দরকার নেই।

গুলশান আমাকে একটা অনুরোধ করলো এবং বললো- 'ভাই, বাংলাদেশে বড় ভাইকে বলে দেন যে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনটি ছাগল কিনে দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসতে। এটা আমার প্রতিজ্ঞা, যা আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে ইতিমধ্যে করেছি। আমি তখনই বাংলাদেশে ফোন করে ব্যাপারটা বড় ভাইকে বললাম।

তিন সন্তানকেই নিষেধ করেছিলাম যেন তারা তাদের মা কে কোনদিনই ব্যাপারটা না বলে। মজার ব্যপার হলো আজ অবধি তারা তাদের কথা রেখেছে।

এই ঘটনা ২০১২ সালের ২২ আগস্টের। দীর্ঘদিন পর যখনই পুরো ব্যাপারটা মনে পড়ে, তখন হৃদয় শিহরিত হয়। মনে হয়, এ জীবনে মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা কোনদিন শেষ হবেনা।

ডুয়ার্স জঙ্গলে, সাহিত্য উৎসবে

কামরুল হাসান

আমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের কবি সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য। রাইটার্স ওয়ার্ল্ড আন্তর্জাতিক সাহিত্য উৎসব বসবে ডুয়ার্সের জঙ্গলে, যে ডুয়ার্স মূর্ত হয়ে আছে বাংলা সাহিত্যের অজস্র পৃষ্ঠায়। বিশেষ করে বুদ্ধদেব গুহ, সমরেশ মজুমদার ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায়।

মাহমুদ হাফিজ বললেন, কামরুল ভাই, আরো অনেক সাহিত্য উৎসবের আমন্ত্রণ পাবেন, কিন্তু ডুয়ার্স পাবেন না। চলুন যাই। নানান সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজি হলাম। মন বলল, ডুয়ার্স যাব, ডুয়ার্স যাব। উৎসবের দুটো দিন ১২ ও ১৩ এপ্রিল এমন এক সময়, যখন ঈদ ও বাংলা নববর্ষ পিঠে পিঠ লাগিয়ে বসে আছে। পরিবারের সাথে ঈদ আর সকলের সাথে নববর্ষ উদযাপন বাতিল করে ডুয়ার্সের জঙ্গলে হাতির পিঠে চড়ার শখ কবিদেরই হয়। আমারও হলো।

যাব তো ঠিক আছে, কিন্তু যে স্থলবন্দর দিয়ে যাব সেই চ্যাংড়াবান্ধা বন্দর দিয়ে ভারতে প্রবেশের অনুমতি নেই। দুটো অতিরিক্ত স্থলবন্দর সংযুক্ত করার জন্য ভারতীয় ভিসা কেন্দ্রে দরখাস্ত করলাম ১৮ মার্চ। সাধারণত এক সপ্তাহে পোর্ট এন্ট্রি পাওয়া যায়। কিন্ত এ হলো ঈদ মৌসুম। শুনলাম, ভিসারই দরখাস্ত পড়েছে ৩ লক্ষ। আমার পাসপোর্ট ফেরত পাবার তারিখ ১০ এপ্রিল। মার্চ গড়িয়ে এপ্রিল এলো, টেনশনের পারদ চড়তে লাগল। আমাকে যিনি গত বছর এমনি সঙ্কটে উদ্ধার করেছিলেন, ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তা শিলাদিত্য হালদার দিল্লিতে বদলি হয়ে গেছেন ২৬ মার্চ। অকূল পাথারে উদ্ধার পাবার কেউ নেই। সকল টেনশন কাটিয়ে ৫ তারিখে পোর্ট এন্ট্রির অনুমতি পেলাম। পাসপোর্ট সংগ্রহ করলাম ৭ই এপ্রিল।

একে একে জানতে পারলাম, বাংলাদেশ থেকে কাকে কাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আয়োজকরা। আমন্ত্রণ পেয়েও এলেন না ফারহানা রহমান, সেঁজুতি বড়ুয়া, লোপা মমতাজ ও তাহমিনা শিল্পী। তাদের কারো ভারতীয় ভিসা নেই, কারো পোর্ট এন্ট্রি নেই। আর ভিসার জন্য আসতে পারলেন না আবদুর রব। রেজাউদ্দিন স্টালিন ও কাজী মাজেদ নওয়াজ যাবেন কলকাতা হয়ে শিলিগুড়ি। মাহমুদ হাফিজের নেতৃত্বে আমরা চারজন- মাহমুদ হাফিজ, জুলেখা ফেরদৌসী, নাহিদ সুলতানা ও আমি যাব চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্ত দিয়ে সড়কপথে। তবে পুরোটাই সড়কে যাব না; ঢাকা থেকে সৈয়দপুর। বেশির ভাগ পথ যাব বিমানে উড়ে।

ঈদের সময় কোনো টিকেটই পাওয়া যায় না অনুমান করে মাহমুদ হাফিজ আগেভাগেই বিমানের টিকেট কেটে রেখেছিলেন। যে কোনো উৎসব বা ভ্রমণে যা হয়, পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জারে গ্রুপ খোলা হয়। সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য খুললেন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। এর নাম ডুয়ার্স ফেস্ট বাংলাদেশ। এ গ্রুপটি শুধু বাংলাদেশ থেকে আমন্ত্রিত কবি-লেখকদের জন্য। ভিসা ও পোর্ট এন্ট্রির বিভিন্ন ঝামেলা সংগঠক সুরঙ্গমা ভট্টাচার্যকে উদ্বিগ্ন রাখে। এপাশ থেকে তাকে ভরসা যুগিয়ে চলেন মাহমুদ হাফিজ।

ডুয়ার্সের জঙ্গলে সাহিত্য উৎসব

ঈদের দিন সকালে নামাজ পড়তে ছোটে সবাই, এমনকি গাড়ির চালকরা। ফলে না পাওয়া যায় উবার, না পাওয়া যায় সিএনজি। মাহমুদ হাফিজ তাই অনুরোধ করেছিলেন তাকে ও জুলেখা ভাবিকে তুলে নিতে। আমি অনুরোধ করি আমার ছেলে শান্তকে। কারণ গাড়ি চালিয়ে এয়ারপোর্ট গেলাম ঠিকই, কিন্তু সে গাড়ি ফিরিয়ে আনবে কে? শান্ত রাজি হলে আমরা নিশ্চিন্ত হই। গুলশানে তাদের বাড়িতে গিয়ে লাভ হলো ঈদের প্রথম সেমাই খাওয়া। শান্ত বড় হলে কী হবে, সন্তান তো; হাফিজ চাচার কাছ থেকে ঈদ-সেলামিও পেল।

বনানী প্রান্ত থেকে এয়ারপোর্টের দিকে যেতে শান্ত নিতে চাইল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। মাহমুদ হাফিজ বললেন, আজ উপরে ও নিচে- দু'জায়গাতেই

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে। সত্যি তাই। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। আমরা অভ্যন্তরীণ টার্মিনালে পৌঁছে গেলাম ৮টার আগেই। গাড়ি থেকে নামতেই দেখা হলো চলচ্চিত্র পরিচালক মাসুম রেজার সাথে। তিনি যাচ্ছেন যশোহর। শহরের পথঘাট ফাঁকা হলে কী হবে, বিমানবন্দর কিন্তু জমজমাট। সকালেই উড়ে যাবে একগাদা প্লেন। আমরা অবশ্য দ্রুতই লাগেজগুলো এয়ারলাইন্সের লোকদের জিম্মায় তুলে দিয়ে বোর্ডিং পাস নিয়ে দ্রুতই রওয়ানা হই সিকিউরিটি চেকের দিকে। সেখানে অবশ্য শ্লথ হতে হলো নিরাপত্তার বাড়াবাড়িতে। খুলতে হলো এমনকি জুতো। কী জানি, হয়তো কোনো রেড অ্যালার্ট আছে; আমরা কিন্তু বিরক্ত। আরে বাবা, চেহারা দেখেও তো বোঝা যায় আমরা মাসুদ রানা বা আইএস জঙ্গি নই যে জুতোর ভেতর চাকু লুকিয়ে রাখব।

ডিপারচার লাউঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তের কোণায় এক লিফট রয়েছে। তাতে চড়ে আমরা উঠে আসি দোতলায়, যেখানে দুটো ব্যাংকের দুটো লাউঞ্জ রয়েছে। মাহমুদ হাফিজ ও জুলেখা ভাবি চলে যান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংকের লাউঞ্জে, আমি প্রবেশ করি ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের লাউঞ্জে। ক্রেডিট কার্ডধারীদের জন্য এই খাতিরপিতির। সারা বছর আপনি যে ঋণের বোঝা মুখ বুজে বইছেন, তার জন্য সান্ত্বনা পুরস্কার। ইউসিবি লাউঞ্জের অভ্যন্তরভাগ বেশ সৌখিন, সুসজ্জিত। তাদের নৈমিত্তিক খাবার দাবার তো ছিলই; ঈদের দিন বলে স্পেশাল ডিশ ছিল জর্দা। চিকেন কর্ন স্যুপ, মিনি বার্গার, মিনি সাসলিক, মিনি চিকেন উইং ইত্যাদি খাওয়া শেষে জর্দা খাই, যা সুস্বাদু লাগে! এর পরে চা।

ইতোমধ্যে এসে পড়েছেন আমাদের টিমের চতুর্থ সদস্য নাহিদ সুলতানা। তাকে আমার অতিথি বানাই আর বলি, এই খাদ্য ও পানীয় সম্ভার থেকে আপনার পছন্দের খাবার নির্বাচন করুন। তিনি জানালেন, তার জীবনে তিনটি জিনিস নেই, একেবারেই নেই। এক, ক্রেডিট কার্ড; দুই, বিকাশ একাউন্ট; তিন স্ক্রিনশট। নেই মানে কিন্তু এমন নয় যে, ছিল না। স্মার্ট জীবনের অনুষঙ্গ ঐ তিন ফ্যাসিলিটি তাকে পর্যাপ্ত ভোগান্তি দেবার পর তিনটি জিনিসই তিনি বর্জন করেছেন। ক্রেডিট কার্ড চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের হিসাব করেছে, আর বিকাশ করেছে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। স্ক্রিনশট সম্পর্কে তার ধারণা হলো, মানুষ এটি ব্যবহার করে নেতিবাচক কর্মকাণ্ডে। আমি বুঝলাম, ইনি আদর্শবাদী; জীবনটাকে সহজ রাখতে চান। পুরুষদের মতো ছাঁটা তার চুলগুলো পুরোপুরি সাদা। আমার মতো তিনি কলপ লাগাননি। সাদা চুলগুলো ঢেকে রেখেছেন গামছা দিয়ে তৈরি এক ক্যাপে। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, গামছা পেঁচিয়ে রেখেছেন মাথায়। বয়সে আমার চেয়ে ছোটই হবেন, কিন্তু জানি না সাদা চুল দেখেই কিনা, আমি তাকে আপা বলে ডাকি। আমরা যে কর্নারে বসেছি এখানে তাকভরা অনেক বই; বেশির ভাগ বাংলা সাহিত্যের রথী-মহারথীদের রচনা সমগ্র। আমি বঙ্কিম রচনাবলীর প্রথম খণ্ডটি তুলে নিয়ে যে উপন্যাসটির আংশিক পড়েছিলাম তার নাম 'কপালকুণ্ডলা'। জানি না, আমার কপালে আজ কী দুর্ভাগ্য কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে!

আমরা গিয়ে চড়ি এক লম্বা বাসে, যার সিট হলো বেঞ্চের মতো টানা। লাল রেক্সিনে মোড়া চারদিকে পাতা সিটের মধ্যভাগটা ফাঁকা। বাস আমাদের নিয়ে যায় ইউএস-বাংলা বিমানটির কাছে। বিমানে চড়ে দেখি, আমার সিটে একজন বসে আছেন। হাফিজ ভাই, জুলি ভাবির সিটেও ভিন্ন দু'জন। বুঝলাম, কোথাও ভজঘট বেধেছে। পরে জানলাম. ভজঘট বাধিয়েছে এয়ারলাইন্সের কম্পিউটার সিস্টেম। পরে অবস্থা দাঁড়াল এমন, যে যেখানে সিট পাবেন বসে পড়ুন। আমি অবশ্য আমার নিজের সিটেই বসি, পছন্দের জানালাপাশের সিট; তাকালেই ইঞ্জিনের প্রপেলারগুলো চোখে পড়ছে।

এ বিমানের দু'জন কেবিন ক্রুর একজন খ্রিস্টান, অন্যজন আদিবাসী। কেয়া ক্রুজ নামের মেয়েটিকে যখন বলি, আপনার নামটি আনকমন, সে বলে, আমি ক্রিশ্চিয়ান। ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক থেকে বিবিএ করা কেয়া ক্রুজ দেখতে বেশ আকর্ষণীয়া। বিমানবালার পোশাকটিও সুন্দর। কোনো এককালে আমি ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকে এমবিএ ক্লাসে পড়াতাম– শোনার পর থেকে আমাকে 'স্যার' বলে সম্বোধন করে বিনয়ী মেয়েটি। অন্য কেবিন ক্রু মানি চাকমার সাথে আমার দেখা হয় দু'বার– প্লেনে উঠবার সময় আর প্লেন থেকে নামবার মুহূর্তে।

বিমানটি যাত্রা করল ঠিক ঠিক সময়ে। পাইলট প্রসন্ন ট্যাক্সিওয়ের উপর দিয়ে এতটা জোরে বিমানটি চালিয়ে নিয়ে গেলেন, মনে হলো হাইওয়েতে স্পোর্টস কার চলছে। রানওয়ের উপরে এসে বিমানগুলো সাধারণত এক মুহূর্ত হলেও থামে। প্রসন্ন কিন্তু বিমানটিকে থামালেন না। ঐ গতির উপরেই টার্ন নিয়ে টেকঅফ রান নিতে শুরু করলেন আর বিমানকে নিয়ে এলেন ঢাকার মাথার উপর। ভাবলাম, একে আনাড়ি চালক বলব নাকি অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। তবে এর যে তাড়া লেগেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২

ঘড়ির কাঁটা নিখুঁত অনুসরণ করে পাইলট প্রসন্ন ইউএস-বাংলার টার্বোপ্রপ এয়ারক্রাফট সৈয়দপুর বিমানবন্দরে অবতরণ করালেন ঠিক ১০: ৫৫ মিনিটে। 'অবতরণ' সুন্দর শব্দ, পাইলট প্রসন্নর ল্যান্ডিংকে বলা যায় 'আছড়ে পড়া'। সামনের দিককার সিটের একটি ছোট্ট মেয়ে, বয়স আড়াই কি তিন হবে, মাঝে মাঝে কাঁদছিল। নামার সময় শান্ত হয়ে সে বাবার কোলে চড়ল। বাবা ওকে যা জিজ্ঞেস করে, ও সেটা রিপিট করে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি বেশি কান্নাকাটি করো? সে বলে, আমি বেশি কান্নাকাটি করি। ইউসিবি লাউঞ্জেও দেখেছি পাখির মতো কথা বলা একটি শিশু। বয়স ৩/৪ হবে। ওর মাকে বলছিল, এসব স্যুপ কারা বানায়? আমি শুধিয়েছিলাম, তুমি কি জানো, এসব স্যুপ কারা বানায়? 'আমি বানাই না'– শিশুটির ঝটপট উত্তর আমাকে মোহিত করেছিল। ঐ ইউসিবি লাউঞ্জেই দেখেছি ঈদের দিন বলে ফরমাল পোশাক সরিয়ে রেখে কর্মীরা

পরিধান করেছে ঈদের পাজামা-পাঞ্জাবি। সৈয়দপুর এয়ারপোর্টে বিমানের সিঁড়ি থেকে তাকিয়ে দেখলাম, গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের লোকেরাও ঈদের পোশাকে প্রীতিময়, হাসিখুশি। তারা ঈদ ভোলেনি, কাজও ভোলেনি।

সৈয়দপুর এয়ারপোর্টে এ নিয়ে দ্বিতীয়বার এলাম। প্রথমবার এখান থেকে উড়ে গিয়েছিলাম ঢাকা। এবার ঢাকা থেকে উড়ে এলাম। দুটোই ওয়ানওয়ে টিকেট। সেবার রাতের অন্ধকারে এয়ারপোর্টটি ভালো করে দেখা হয়নি। এবার চোখ মেলে তাকালাম। দেখি, এয়ারপোর্টও আমার দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রয়েছে আর মৃদু হাসছে। মাহমুদ হাফিজ জানালেন, সম্ভবত এই এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ভবনটির ডিজাইন করেছেন স্থপতি শাকুর মজিদ। যিনিই করে থাকুন, বিমানবন্দরটির স্থাপত্য সৌন্দর্য চমৎকার। শাকুর মজিদ হলে তো কথাই নেই; একটা আত্মীয়তার বোধ এসে যায়। কেননা, তিনি আমাদের বন্ধু।

লাগেজ নিয়ে বেরুতেই আমরা দেখা পাই রাজু নামক লোকটির। সৈয়দপুর থেকে চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্ত পর্যন্ত যেতে আমাদের যে গাড়ি লাগবে সেই গাড়ি নিয়ে এসেছে সে। তবে গাড়ি চালাবে তার বড় ভাই মোহাম্মদ শাহজাদা। গ্যাস সিলিন্ডার না থাকায় গাড়ির বনেটে জায়গা প্রচুর। ফলে আমাদের সব লাগেজই ঢুকে গেল বনেটে। রাজু বা শাহজাদা যে বিহারি– তা তাদের চেহারা বা ভাষা শুনে বোঝা যায় না। বোঝা যায় যখন তারা নিজেদের মধ্যে বা মোবাইল ফোনে কথা বলে। সেই ভাষাটা উর্দু। ৪৭-এর দেশভাগের পর বিহার থেকে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান চলে এসেছিল পূর্ববঙ্গে। ট্রেন ভরে আসা এসব লোক নেমে গিয়েছিল সান্তাহার, পোড়াদহ, ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর, পার্বতীপুর, নীলফামারীসহ বিভিন্ন সীমান্তবর্তী রেলস্টেশনে। তাদের অনেকেই চাকরি নিয়েছিল রেলে। আজও সৈয়দপুরে প্রচুর সংখ্যক বিহারির বসবাস।

কত হবে– মাহমুদ হাফিজের প্রশ্নে মোহাম্মদ শাহজাদা জানাল, সৈয়দপুরে ৯০ শতাংশই বিহারি।

এত! আমাদের যুগপৎ বিস্ময়! যাদের পূর্বপুরুষ বিহার থেকে এসেছিল তাদের পরের প্রজন্মের বেশির ভাগের জন্ম বাংলাদেশে। এখন তো তৃতীয় প্রজন্ম জন্ম নিয়েছে। সুতরাং ঘরে উর্দু আর বাইরে বাংলা, দুটো ভাষাতেই তারা স্বচ্ছন্দ। তাদের গায়ের রং, অবয়ব বাঙালির মতোই। এই উদ্বাস্তু জনগণ বাংলাদেশে আত্তীকৃত!

সৈয়দপুর বিমানবন্দরের যে আলাদা কৌলীন্য থাকে, তা নেই। সাধারণত বিমানবন্দরগুলো থাকে শহর থেকে দূরে। সেখানে যেতে পেরুতে হয় একটি দীর্ঘ পথ। সাধারণত বৃক্ষশোভিত, যাকে বলা হয় এয়ারপোর্ট রোড, এমন কিছু নেই। এখানে শহর এসে বিমানবন্দরের গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এয়ারপোর্টকে বানিয়েছে বাস টার্মিনাল। সেই বিশাল কারখানাটি দেখি, প্লেন ল্যান্ডিংয়ের সময় যেটি চোখে পড়েছিল। শাহজাদার কাছ থেকে জানলাম, ওটি একটি হার্ডবোর্ডের কারখানা, তবে কোন কোম্পানির তা বলতে পারল না।

বুড়িমারী বর্ডারে সস্ত্রীক মাহমুদ হাফিজ

সমগ্র উত্তরাঞ্চলের জন্য দুটি বিমানবন্দর– সৈয়দপুর ও রাজশাহী। বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের জন্য শুধু সৈয়দপুর। সড়কের মাইলফলকগুলো আগে থাকত সড়কের পাশে, এখন মাথার উপরে। আগে ছিল সিমেন্টের তৈরি অনুচ্চ খুঁটি। এখন সড়কের মাথার উপর ধাতব গেট; আগে পড়া যেত না, এখন পড়া যায়। উন্নতি যে হচ্ছে, তা এসব দেখে বুঝি। মাইলফলক দেখাল– রংপুর ৪০, নীলসাগর ৩৬, ঠাকুরগাঁও ৭৩, বাংলাবান্ধা ১৩৯ কিলোমিটার দূরে। নীলসাগর হলো নীল জলের এক দীঘি। এতটাই বড় যে তাকে সাগর বলা হয়। ওয়াপদা মোড়ের মাইলফলক দেখাল, নীলফামারী ১৬ আর চিলাহাটী ৬৯ কিলোমিটার দূরে।

নাহিদ সুলতানা বসেছেন ড্রাইভারের পাশের সিটে। মাহমুদ হাফিজ, জুলেখা ভাবি ও আমি পেছনের সিটে। এই এলাকার এমপি কে, কোন দলের, সে কত ভোটে জিতল, ভোট স্বচ্ছভাবে হয়েছে কিনা– ইত্যাকার প্রশ্ন করতে লাগলেন চালককে। এসব প্রশ্নের উত্তর তো আমরা জানি। দল তো একটাই। স্বতন্ত্র প্রার্থীও আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত ছদ্মবেশী আওয়ামী লীগ। এ অঞ্চলে অবশ্য জাতীয় পার্টির কিছু জনসমর্থন আছে। মোহাম্মদ শাহজাদা আওয়ামী লীগের সমর্থক; ভোট দিয়েছে নৌকায়, শেখ হাসিনার ভক্ত ইত্যাদি শুনে নাহিদ সুলতানা বললেন, আমরা তো একই পার্টি। আপনার উচিত ভাড়া ৫০০ টাকা কম নেওয়া। শুনে সে বলে, আমি তো ভেবেছিলাম আপনারা আমাকে ৫০০ টাকা বখশিশ দেবেন। রাজনীতি নিয়ে আলাপ, বিশেষ করে নির্বাচনের মতো নাজুক বিষয়ে কথা বলা মাহমুদ হাফিজের পছন্দ হচ্ছিল না। তিনি বললেন, রাজনৈতিক আলাপ বাদ দেন। নাহিদ সুলতানা

বললেন, রাজনীতির বাইরে কিছু আছে নাকি? বুঝলাম, ইনি হলেন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট।

এই যে গাড়িতে যাচ্ছি, এটা মাহমুদ হাফিজ বুক করে রেখেছিলেন ঢাকা থেকে। ঈদের দিন সকালে যদি গাড়ি পাওয়া না যায়, সে জন্য অ্যাডভান্স বুকিং। বিমানবন্দরে নেমে আমরা কিন্তু ২০/২২টি গাড়ি দেখেছি। এ হলো ঈদের দিনের সকাল। নরমাল দিনে ৩০/৪০টি গাড়ি পাওয়া যায়। 'আগে বুক না করলে বোধ হয় এখানে এসে দরদাম করে ভাড়া কমানো যায়'– মাহমুদ হাফিজের এমন জিজ্ঞাসায় মোহাম্মদ শাহজাদার শার্প উত্তর, সে ক্ষেত্রে ভাড়া বেশি পড়বে। ভাড়া বেশি হওয়ার একটি কারণ, গাড়িগুলো প্রায়শ সীমান্ত থেকে খালি আসে। অন্য কারণ, এগুলো পেট্রোলে চলে। পেট্রোলে চলে বলেই তো বনেটে গ্যাস সিলিন্ডার নেই। আর নেই বলেই আমাদের চারজনের আট লাগেজ এঁটে গেল স্বচ্ছন্দে। বুক করা গাড়িটি আমাদের পছন্দ হয়।

আমরা শুনে আশ্চর্য হলাম, মোহাম্মদ শাহজাদার নানা-নানি ও দাদি এখনো বেঁচে আছেন। নানা-নানির বয়স ৯০-এর কোঠায়, আর দাদি সেঞ্চুরি করে ফেলেছেন। দেশভাগের কথা নাকি এখনো তিনি স্মরণ করতে পারেন। দাদা-দাদির বাড়ি বিহারে, নানা-নানির বাড়ি গাইবান্ধা জেলায়। আমরা এত যে প্রশ্ন করে উৎপাত করছি, তার একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে মাহমুদ হাফিজ সাফাই দেন, আমরা লেখক। শুনে নাহিদ সুলতানা বলেন, 'পেছনেরগুলো লেখক, আমি নই।' নাহিদ সুলতানার আগ্রহ জনজীবন নিয়ে; মাহমুদ হাফিজ গুগলে দেখতে থাকেন লোকালয়ের নাম, নদীর নাম, গাড়ির অবস্থান ইত্যাদি। জুলেখা ভাবি চুপচাপ, আর আমি দেখতে থাকি প্রকৃতির সৌন্দর্য ও ভূগোলের রূপ!

৩

দু'পাশে ভুট্টাক্ষেত, কোথাও পতাকার সবুজ রঙের মতো ধানের প্রান্তর। আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলেছে সীমান্তের দিকে। পথের মাইলপোস্ট দেখালো– ডিমলা ৫০ কিলোমিটার, জলঢাকা ২৪ কিলোমিটার দূরে। আরো পরে একটি রাস্তা চলে গেল ডোমারের দিকে। মাহমুদ হাফিজ বললেন, ডোমারে কবি সালেম সুলেরীর বাড়ি। কাছেই নীলফামারী শহর। আমরা শহরে ঢুকিনি, বাইপাস দিয়ে গেলাম। একটি নদীর নাম দেখলাম 'যমুনেশ্বরী'। নাম মনোহর হলে কী হবে, যমুনেশ্বরী খালের চেয়েও সংকীর্ণ। জল নেই প্রায়। চিন্তা উপচে পড়লে যেমন বাক্য হয়, তেমনি বর্ষায় এ সকল নদীতে পানি উপচে পড়লে বন্যা হয়। তিস্তা ও তার শাখা নদীগুলোর এই দুর্দশা। যখন পানি থাকা দরকার তখন নদীগুলো পানিশূন্য। আর যখন দরকার নেই, তখন অপরিমেয় পানি এসে তলিয়ে দেয় জনপদ।

মাহমুদ হাফিজ বললেন, এই এলাকা হলো ফ্ল্যাশ ফ্লাড ল্যান্ড। মানুষের জীবন ও জীবিকা নিয়ে অস্বাভাবিক আগ্রহ নাহিদ সুলতানার। তিনি নিরন্তর কথা বলে চলেছেন গাড়ির চালক মোহাম্মদ শাহজাদার সাথে। শাহজাদা কবে বিয়ে করেছে,

বউ কেমন, বউ কেন কাজ করে না, খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে চলেছেন। অপরদিকে জুলেখা ভাবি একদম চুপচাপ। বহুক্ষণ একটি শব্দও শুনিনি তার মুখে। আমি ভূগোল দেখি জানালার বাইরে কৌতূহলী বালকের মতো, নোটবুকে টুকে নিই। অপর দিকে মাহমুদ হাফিজ ভূগোল দেখেন স্মার্টফোনের গুগল ম্যাপে একজন ট্যুর গাইডের মতো। তিনি বললেন, কামরুল ভায়ের ভ্রমণ কাহিনী শুরু হয় যাত্রারম্ভ, অর্থাৎ বাড়ি থেকে। আর আমার ভ্রমণ কাহিনী শুরু হয় অকুস্থল থেকে। এখানে 'অকুস্থল' হলো ডুয়ার্সের জঙ্গল, যেখানে সাহিত্য উৎসব হবে। মাহমুদ হাফিজ ভ্রমণ কাহিনীতে নাটকীয় শুরুর পক্ষে। তিনি ভ্রমণ কাহিনীকে ফিকশন করে তুলতে চান। এ ক্ষেত্রে তিনি মঈনুস সুলতানের অনুসারী। বিপরীতে নন-ফিকশন অর্থাৎ বাস্তব সত্যকে কতটা সাহিত্য করে তোলা যায়, সেটাই আমার প্রচেষ্টা।

আমার নোটবুকে জড়ো হয় দিনাজপুর সেচ খাল, চাঁদেরহাট বাজার, বুড়িখোঁড়া নদী। এই এলাকায় বেশির ভাগ বাড়িঘর টিনের তৈরি। বাতাসের নির্মলতা দেখে নাহিদ সুলতানার মন্তব্য, ঢাকার বাতাস বিষাক্ত। এখানে বাতাস অক্সিজেনভরা। একটি বাজারের নাম কচুকাটা। জানি না, এখানে কচুগাছ, নাকি মানুষ কচুকাটা হয়েছিল। তবে আজ ঈদের দিনে এখানে ঈদের মেলা বসেছে। এর পরের নদীটির নাম চাড়ালকাটা নদী। কেন স্থানের নাম কচুকাটা, আর কেনই বা নদীর নাম চাড়ালকাটা তার ইতিহাস নিশ্চয় চমকপ্রদ কিছু হবে। একেকটি মানুষের জীবন যদি একেকটি উপন্যাস হয় তবে একেকটি জনপদের ইতিহাস মহাউপন্যাস হবে। কেবল শক্তিমান লেখকরাই পারেন তা সাহিত্যে ধারণ করতে।

এখানে সড়ক সংকীর্ণ আর সড়কের উপরেই চেপে বসেছে বাজার। বৈশাখ দূরে নয়; বসেছে বৈশাখী মেলা। কচুরিপানার মতো লোকজন আর যানবাহন সরিয়ে এগোতে হয় গাড়িকে। এ রকম দশটি বাজার পড়লেই আমাদের দেরি হবে– মাহমুদ হাফিজের উদ্বেগের পারদ চড়ল। কেননা, বুড়িমারী তখনো ৬৭ কিলোমিটার দূরে। রাজারহাট বাজারেও মেলা বসেছে। রঙিন বেলুন, রঙিন পোশাক পরা মানুষের সমাবেশে বাজারগুলো রঙিন হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। সেখানে লেখা– মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে মহাসড়কের দশ মিটারের মধ্যে কোনো বাজার বা স্থাপনা তৈরি নিষিদ্ধ। বুঝলাম, এ সড়ক মহাসড়ক হবে। সড়কের উপর উপচে পড়া দোকানপাট, অবৈধ স্থাপনা, ঘরবাড়ি উচ্ছেদ করার এ হলো আগাম নোটিশ বা সতর্কতা।

সড়কের নির্দেশনা দেখাল ডানদিকে রংপুর, সোজা ডালিয়া। ডিমলা, ডোমার, ডালিয়া– 'ড' দিয়ে শুরু নামগুলো চমৎকার। ডালিয়া নাম দেখে অনিবার্যভাবেই মনে পড়ল লুবনার বান্ধবী ডালিয়ার কথা, যে দার্জিলিংয়ে ট্যুরিস্ট নিয়ে যায় তার ট্যুর কোম্পানি 'Holidą'র ব্যানারে। ডালিয়ার পরিকল্পনা ছিল ব্রেকফাস্ট আড্ডার ভ্রামণিকদের একবার দার্জিলিং নিয়ে যাওয়ার। আমি ও মাহমুদ হাফিজ সেদিকেই যাচ্ছি, কিন্তু ডালিয়ার প্যাকেজের বাইরে ভেবে একটু খারাপই লাগল। এ অঞ্চলে

বিমান আমাদের পেটে পুরে নিচ্ছে

যেমন কচুকাটা ও চাড়ালকাটার মতো অপ্রীতিকর নাম রয়েছে, তেমনি রয়েছে মন্থরডাঙ্গা, চৌপাখি, জলঢাকা, ডোমার, ডিমলা, ডালিয়ার মতো নাম।

গাড়ি উঠে এসেছে দুই লেনের পিচঢালা পথে। পথের দু'ধারে ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। এই জলশূন্য প্রায়-মরুঅঞ্চলে কেন বিপুল জল শোষণকারী বিদেশি গাছ ইউক্যালিপটাস লাগানো হলো, তা আমাদের বোধের অগম্য। বাংলার হিজল-তমাল-বট, আম-জাম-কাঁঠাল, তাল-নারিকেল, দেবদারু, বাদাম কি পর্যাপ্ত উপযোগী নয়?

আমাদের গাড়ির ড্রাইভার মোহাম্মদ শাহজাদা একজন বিহারি; আগেই বলেছি। প্রসঙ্গত উঠে এলো ঢাকার মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে বসবাসরত বিহারিদের কথা, যারা পাকিস্তানে যাবার পণ করেছিল। পাকিস্তান তাদের গ্রহণ করেনি বলে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশেই বসবাস করছে। নাহিদ সুলতানা একজন আইনজীবী; মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করেন; সংগ্রামী মানুষদের প্রতি সমব্যথী; বাম চেতনার মানুষ। তিনি বললেন, জেনেভা ক্যাম্প একটা নেক্সাস। এ নিয়ে রাজনীতি হয়, ব্যবসা হয়; সেমিনার-সিম্পোজিয়াম হয়। চলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক নাটক। 'বুড়িতিস্তা নদীতে পানি নেই কেন'– মোহাম্মদ শাহজাদাকে তিনি এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন, মনে হলো উকিলি জেরা। ড্রাইভার ভয়ে ভয়ে উত্তর দিল, 'আমি ঠিক জানি না।' উত্তর তো আমরা জানি। উজানে পানিপ্রবাহ ঠেকিয়ে দিলে ভাটির নদী তো জলশূন্য হবেই।

দূরে লাল টিনের ছাদের এক সারি বাড়ি চোখে পড়ে। শাহজাদা জানাল, ওটা সরকারি আশ্রয়কেন্দ্র; জানি না জেনারেল এরশাদের আশ্রয়ণ প্রকল্প 'গুচ্ছগ্রাম' কিনা। এ ধরনের প্রকল্প বর্তমান সরকারের হাতেও রয়েছে। বুড়িমারী স্থলবন্দর তখনো ৪৮ কিলোমিটার দূরে। একটি ছোট বাজার পড়ল, যার নাম চা-পানি। বাজারটির নামকরণের সার্থকতা প্রমাণ করতে আমরা সেখানে চা-পানি খেতে চাইলাম। আমাদের দলনেতা মাহমুদ হাফিজ রাজি হলেন না। তার লক্ষ যত দ্রুত সম্ভব সীমান্ত চেকপোস্টে গিয়ে পৌঁছানো।

ডালিয়া বাজার পেরুলে নদীর মতো প্রশস্ত সেচ খাল দেখলাম। এর আগে তিস্তার একটি খালকে ভেবেছিলাম নদী। সেখানে একটি জলাশয় ঘিরে বৃক্ষসারি আর বৃক্ষের ঝরাপাতায় প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দু'পাশে ভুট্টাক্ষেত, ঘন হয়ে দাঁড়ানো ইউক্যালিপটাস গাছের সারি দেখতে দেখতে আমরা এসে পড়ি তিস্তা ব্যারাজে।

৪

তিস্তা ব্যারাজে এসে দেখি মানুষের ঢল। চারদিকে উৎসবের আমেজ। ইউক্যালিপটাসের বনে বনে কপোত-কপোতী; তিস্তার পাড়ে বৈশাখী মেলার চেহারায় ঈদমেলা প্রস্ফুট। এখানে পথে ইজিবাইকের প্রচুর চলাচল। ঈদের আনন্দ কাটাতে আসা আশপাশের মানুষ ইজিবাইক, খোলা ভ্যানে চড়ে, কেউ এসেছে মোটরবাইক চালিয়ে। এখানে আসার পথে দেখেছি একটি ভ্যানগাড়িতে ১০ যুবকের গায়ে একই রং ও ডিজাইনের পাঞ্জাবি। যুবকদের প্রিয় রং হলো কালো। মেয়েদের পরিধানে প্রধানত লাল, হলুদ রঙের শাড়ি, খোঁপায় গোঁজা ফুল। চকিতে মনে পড়ল কবি শামসুর রাহমানের সেই অনবদ্য পঙ্‌ক্তি– 'যুবকেরা আড্ডাবাজ, যুবতীরা মক্ষীরাণী'।

এই শুকনো মৌসুমে, যদিও তাতে এন্তার চর জেগে আছে, এখানে তিস্তা নদী প্রশস্ত, কয়েকটি ক্ষীণধারায় বিভক্ত হয়ে তবু বইছে। নীল-সাদা রঙে অঙ্কিত ব্যারাজটি দূর থেকেই চোখে পড়ে। কেননা, এখানে সড়ক ৯০ ডিগ্রি বাঁক নিয়ে বাঁধের উপর ১৮০ ডিগ্রি হয়েছে। একে তো দ্রষ্টব্যস্থান, উপরন্তু উৎসবমুখর এমন জায়গায় না নেমে পারা যায়? আমরা নামলাম। তিস্তা ব্যারাজকে প্রেক্ষাপটে রেখে ছবি তুললাম। এক ধরনের পাপড় ভাজা, রং বাঙ্গির মতো হলুদাভ আর আকার বাটির মতো, কিনে খেলাম। জুলেখা ভাবির কাছ থেকে জানলাম, এর নাম দিলখোশ। দাম মাত্র ৫ টাকা। ৫ টাকায় দিলখোশ! নাহিদ সুলতানা বললেন, ৫ টাকায় লাঞ্চ হয়ে গেল।

ব্যারাজ পেরিয়ে ডালিয়া-বড়খাতা সড়ক ধরে প্রথমে পূর্ব দিকে অতঃপর লালমনিরহাট-পাটগ্রাম মহাসড়ক ধরে উত্তর দিকে এগোতে লাগল আমাদের গাড়ি। এখানে বাংলাদেশের মানচিত্রটি মুরগির গলা বা chicken neck-এর মতো সরু। পাটগ্রামের দিকটায় সড়ক গেছে একেবারে সীমান্ত ঘেঁষে। গাড়ি থেকেই জলপাইগুড়ির চা-বাগান দেখা যাচ্ছিল। দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে বিদেশ দেখার

একটা সূক্ষ্ম উত্তেজনা রয়েছে। বিশেষ করে সেখানে চা-বাগান একটি ভিন্ন ভূপ্রকৃতি তৈরি করেছে। আছে কাঁটাতার। নাহিদ সুলতানা বললেন, আমি একে বিদেশ বলি না। এ তো আমারই দেশ। আজ থেকে ৭৫ বছর আগে ভারত ভাগ হয়েছিল। বাংলাকে দুটি খণ্ডে ভাগ করেছিল ঔপনিবেশিক শক্তি, দ্বি-জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী নেতাদের পরামর্শে। নইলে এই নীলফামারী আর ঐ জলপাইগুড়ি; এই রংপুর আর ঐ কোচবিহার তো একই বাংলার অন্তর্গত ছিল।

দেশভাগ ছিল ঐতিহাসিক ভুল– আমি বলি। আমাকে অবাক করে দিয়ে নাহিদ সুলতানা বললেন, আমি কিন্তু পার্টিশনকে সমর্থন করি। তিস্তা ব্যারাজ দেখেও আমার মনে পড়েনি, কাছেই তিন বিঘা করিডোর। আঙ্গরপোতা-দহগ্রাম শুনে চট করে মনে পড়ল, এই যে একটু আগে মাহমুদ হাফিজকে বলেছি, এ পথে, এ অঞ্চলে প্রথম এলাম; তা সত্য নয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক সহপাঠীদের সাথে এখানে এসেছিলাম প্রায় ১০ বছর আগে। কী করে ভুলে গেলাম সবকিছু! পিছনে ফেলে আসা নীলসাগরেও আমরা গিয়েছিলাম। তখনো ছিটমহলগুলো বিনিময় হয়নি। তিন বিঘা করিডোর পেরিয়ে আমরা গিয়েছিলাম দহগ্রাম।

পথে জটলা দেখে অনুমান করলাম, সড়ক দুর্ঘটনা। অনুমান সত্য। অটোর সাথে মোটরবাইকের সংঘর্ষে মোটরবাইক আরোহী গুরুতররূপে আহত। তাকে হাসপাতালে নিতে এসেছে অ্যাম্বুলেন্স। কোনো পুলিশের গাড়ি দেখলাম না। উৎসাহী দর্শকরা তাদের মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় ধারণ করছিল ঘটনাক্রম। 'এদের অনেকেই ইউটিউবার', বললেন মাহমুদ হাফিজ। সাংবাদিকরা পৌঁছার আগেই এরা পৌঁছে যায়, যে কোনো মিডিয়ায় খবর দেয়ার আগেই। ইউটিউবে আপলোড হয় ছবি। বদলে যাওয়া এক দুনিয়ার বাসিন্দা আমরা সবাই। আমাদের চোখের সম্মুখে বিদ্যুৎ গতিতে পাল্টাচ্ছে সব। এখন ঘটনা ধারণ করতে টিভি ক্যামেরা লাগে না। লাগে না পেশাদার সাংবাদিক। রাম-শ্যাম-যদু-মধু সকলেই রিপোর্টার। সকলের হাতেই ডিজিটাল ক্যামেরা।

আমার ক্রমাগত নোট করা দেখে মাহমুদ হাফিজের মন্তব্য, 'এই বেল্টের উপরে কামরুল ভাইয়ের একটা বই লেখা হয়ে যাবে।' তার সম্পূরক মন্তব্য, 'আপনি যে এত প্রচুর লেখেন, লিখতে পারেন- এ নিয়ে একদিন রীতিমতো গবেষণা হবে।' আমি আর কী বলি! অনুপ্রাণিত হই আরো লিখতে। গাড়ির চালক মোহাম্মদ শাহজাদাকে নিরন্তর খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে চলা নাহিদ সুলতানাকে আমি শুধাই, 'আপনি কি কোনো নৃতাত্ত্বিক গবেষণা করছেন?' 'কেন?' তার তরিৎ প্রতিক্রিয়া। যেভাবে হাঁড়ির খবর বের করে আনছেন তাতে তা-ই মনে হলো। আমি বলি।

সড়ক চলে গেছে সোজা পাটগ্রামের দিকে। এ সীমান্তে এটিই সর্বশেষ উপজেলা। বুড়িমারী স্থলবন্দরের দিকে সড়কের ৯০ ডিগ্রি টার্ন। সড়কের পাশ দিয়ে গেছে বুড়িমারী বন্দর অভিমুখী রেললাইন। সরকারি অর্থায়নে নির্মিত ৫০০ মসজিদ কমপ্লেক্সের একটিকে দেখা গেল সীমান্তে। এখানে সড়ক নির্মিত হচ্ছে। ঘণ্টি বাজারে সড়কের দু'পাশে অনেক পাথর ভাঙা মেশিন দেখলাম, যেমনটা দেখেছিলাম সিলেটে রাতারগুল যাওয়ার পথে। উত্তরের নদীগুলো পাথর বয়ে নিয়ে আসে। ফলে সীমান্তবর্তী কোনো কোনো এলাকায় এ রকম পাথর ভাঙা মেশিন দেখা যায়। পাথরের টুকরো বা বোল্ডার ব্যবহৃত হয় সড়ক নির্মাণে। রেললাইন যেখানে শেষ, আমরা এসে পড়ি সেই বুড়িমারী রেল স্টেশন বাজারে। এই তবে চ্যাংড়াবান্ধা বর্ডার! এপারে বুড়িমারী, ওপারে চ্যাংড়াবান্ধা।

৫

ঈদের দিন মধ্যদুপুরে বুড়িমারী বন্দর চিলমারী বন্দরের মতোই খাঁ খাঁ। যেন শেষ ব্যক্তিটিও সীমান্তের ওপারে চলে গেছে। ইমিগ্রেশন ও কাস্টমসের লোকেরা বসে বসে মাছি মারছে। লোক নেই তো কাজ কী তাদের! চারটি ধবল রুই মাছ (কালো কাতলাও এখন ধবল রুই) পেয়ে তারা ডগোমগো হয়ে বড়শি পেতে বসে রইল। স্বচ্ছন্দেই পার হতে পারতাম, কিন্তু মাহমুদ হাফিজ চান আরো স্বচ্ছন্দ পারাপার। তিনি যে ভিভিআইপি– তা যেন সীমান্তের এপার-ওপার টের পায়। দৈনিক জনকণ্ঠের সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে তার নেটওয়ার্ক সারা দেশেই বিস্তৃত।

জুনিয়ররা সিনিয়রদের সেবা দিতে পেরে তৃপ্ত। এমনি এক লোকাল সাংবাদিক, নেতা গোছের, তার ভাইকে পাঠালেন ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস যেন আমাদেরকে ভিআইপি সেবা দেয়। লোকটির জনসংযোগ দেখে বোঝা গেল সে এসব অঞ্চলেই কাজ করে, যাকে আমরা স্থানীয় ভাষায় বলি দালাল।

ঢাকা বিমানবন্দরে ব্যাংকের লাউঞ্জে এবং সৈয়দপুর বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ের লোকদের যেমন দেখেছিলাম, বুড়িমারী স্থলবন্দরে বাংলাদেশ ইমিগ্রেশনে তেমনি ইমিগ্রেশন পুলিশকে দেখলাম ঈদের পোশাক পরিহিত। এখানে আহসান নামে এক ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা আমাদের পরিচয় পেয়ে চা খাওয়াতে চাইলেন। আমরা সবিনয়ে এড়িয়ে গিয়ে কাস্টমসের খপ্পরে পড়ি।

ইমিগ্রেশন অধিদপ্তরের তবুও একটু দালান আছে, কাস্টমসের তাও নেই। ছোট টিনের ঘরের ভেতর দুই নারী; একজন সিঁদুর পরা আর এক পুরুষ বসে আছেন। আমরা যেহেতু ভিআইপি বাক্সপেটরা কিছুই তারা দেখলেন না। কিন্তু গোল বাধলো ট্রাভেল ট্যাক্স নিয়ে। আমাদের দলনেতা মাহমুদ হাফিজ মাথাপিছু এক হাজার টাকা ট্রাভেল ট্যাক্স দিয়ে এসেছেন অনলাইনে সোনালী ব্যাংকে। কাস্টমস কর্মীরা বলল, বুড়িমারী বন্দরে অনলাইন সিস্টেম বসেনি, তাই তারা আমাদেও কাগজ গ্রহণে অক্ষম। পড়েছি মোগলের হাতে! আমাদের ক্যাশ টাকা দিয়ে ছাড়পত্র পেতে হলো। ব্যাংক যেহেতু বন্ধ, টাকাটা তারাই রেখে দিলেন। ব্যাংক খুললে জমা দেবেন আমাদের নামে। নাকি দেবেন না?

স্থানীয় সাংবাদিক নেতার ছোট ভাই, যাকে বলা যায় স্পিডআপ এজেন্ট, আমাদের যে বাড়তি সুবিধা এনে দিলো তা হলো মোহাম্মদ শাহজাদার গাড়িতে করে লাগেজ

সমেত আমাদেরকে নো ম্যান্স ল্যান্ড পার করে দেওয়া। বিনিময়ে আমরা তাকে বখশিশ দিই। সীমান্তে তিন প্রকার বাধা ডিঙাতে হয়। ইমিগ্রেশন, কাস্টমস তো রয়েছেই, উপরন্তু সীমান্ত রক্ষীদল। এপারে বিজিবি ওপারে বিএসএফ। পাসপোর্ট-ভিসা ইত্যাদি পরীক্ষা করে ইমিগ্রেশন। দ্বিতীয় দফা তারাও চেক করে আপনিই আপনি কিনা, নাকি অন্য কেউ; সিল-ছাপ্পড় আছে কিনা ইত্যাদি। একে বলা যায় ডাবল চেক সিস্টেম।

ভূগোলে কোনো পরিবর্তন নেই। এপারে যে মাঠ, ওপারেও সেই মাঠের বিস্তৃতি। এপারে যে গাছপালা, ওপারেও সে রকম গাছপালা। কেবল এই কাঁটাতার, এই সামরিক পোশাক পরা লোকজন, তাদের কাঁধে ঝোলানো রাইফেল বলে দেয় আমরা দুই দেশ, আমরা দুই প্রকার। তাই তো এপারে তিন আর ওপারে তিন, ছয়টি বাধার প্রাচীর ডিঙিয়ে সীমান্ত পেরুতে হয়। চ্যাংড়াবান্ধা গিয়ে বলতে হয়, এই 'চ্যাংড়া' আর 'বান্ধা' নয়। সে এখন ছুটতে পারে ভারতের যে কোনো দিকে। বিএসএফের নজর এড়িয়ে চড়তে পারে পর্বতে কিংবা হারিয়ে যেতে পারে ডুয়ার্সের জঙ্গলে (যদিও তা হবে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত)।

সীমান্তরক্ষীদের ঘরখানি যেন এক ক্ষুদ্র কুটির। সেখানে দুই জোয়ানের সাথে, উচ্চতা দেখেই বোঝা যায় এরা উত্তরপ্রদেশের কিংবা আরও উত্তরের কোনো প্রদেশের, সাথে খোশগল্পে মেতে আছে এক যুবতী, সেও কিন্তু সীমান্তরক্ষী। কিছুকাল আগেও সীমান্ত রক্ষায় নারীদের দেখা যেত না। জেন্ডার ব্যালান্স হয়তো হয়নি, শুধু জেন্ডার ইনক্লুশন হয়েছে। এটা আশার কথা। ভারতীয় কাস্টমসের ঘরখানিও কেমন অস্থায়ী ধরনের। সেখানে কেন জানি আমার লাল স্যুটকেসটি পছন্দ হলো না কাস্টমস পুলিশের। বুকের কাছে যে ব্যাজ তাতে বুঝতে পারি সে বাঙালি; খুলতে বলল। আর খুলেই দেখল কাপড়চোপড়ের উপর দু'খানি 'ঘুমাতে যাবার আগের কবিতা' কাব্যগ্রন্থ। তড়িঘড়ি বন্ধ করতে বলল স্যুটকেস; ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাকে আবার কবিতা পড়তে না হয়।

চ্যাংড়াবান্ধা বাজার অনেকটা শরণার্থী শিবিরের মতো। এখানে যা কিছু গড়ে উঠেছে সবই সীমান্ত পারাপারকারী পর্যটক ঘিরে। তাই মানিচেঞ্জার ও বাস কোম্পানির ঘর আছে বেশ কয়েকটি। ওপারে যে এজেন্ট, এপারে তার মামাতো ভাই হলো মমতা এজেন্সি। আমরা এখানে টাকা ভাঙিয়ে নিলাম। বাংলাদেশি ১০০ টাকার বিনিময়ে পেলাম ভারতীয় ৭১ রুপি। ডলারকে এড়িয়ে দু'দেশের এই মুদ্রা বিনিময়টি বরং ভালো। চ্যাংড়াবান্ধায় দোকানপাটের অবস্থান অনেকটা এলোমেলো। এটি যে ভারতের একটি বাজার, তা বোঝা যায় দোকানপাটের ভেতর একটি ছোট মন্দির দেখে। মন্দিরের রূপও অস্থায়ী।

ওপারে যেমন এপারেও ইমিগ্রেশন দপ্তরটি একটু ভদ্রস্থ, একটি বড় টিনশেডের নিচে ছয়টি কাউন্টারে কম্পিউটার, স্ক্যানার মেশিন ও ছবি তোলার ডিজিটাল ক্যামেরা নিয়ে ছয়জন পুলিশ বসে, যদিও তখন সাকল্যে ৬ জন পর্যটকও নেই।

এখানেও দালাল ঘুরছে। আমরা তাদের মাছির মতো সরিয়ে রাখি। এক ইমিগ্রেশন পুলিশ পাসপোর্ট-ভিসা দেখে ইমিগ্রেশন ফর্ম ধরিয়ে দিলে পূরণ করতে লেগে যাই। ওপাশে 'ডিপারচার' আর এপাশে 'অ্যারাইভাল' সিল লেগে যায় সশব্দে। সিলের ধাক্কায় পাসপোর্টের পাতা কেঁপে ওঠে। অ্যারাইভাল সিল দেখে আমার মনে পড়ল ইউএস-বাংলার বিমানটির পাইলট প্রসন্ন ল্যান্ডিংয়ের আগে মাইকে কেবিন ক্রুদের নির্দেশ দিচ্ছিল– 'Cabin crews be seat for arrival'. একে তো ভুল ইংরেজি, উপরন্তু ল্যান্ডিংয়ের পরিবর্তে অ্যারাইভাল বলায় মাহমুদ হাফিজ ও আমি বিরস বদনে প্রসন্নর সমালোচনা করছিলাম। তার তাড়াহুড়ো করে বিমান চালনা আমাদের পছন্দ হয়নি। ক্ষেপে গিয়ে আমরা তাকে 'পাইলট' না বলে 'ড্রাইভার' বলছিলাম। এতে ক্ষেপে গেলেন নাহিদ সুলতানা। আমরা একজন পাইলটকে কেন তার যোগ্য মর্যাদা দিচ্ছি না, তা নিয়ে ক্ষোভ তার।

ভারতীয় ইমিগ্রেশন অফিসের বারান্দায় এই গরমে আমি কেন কোট পরে আছি; আমার গরম লাগছে কিনা; এটা কি স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে পরেছি– ইত্যাকার ১০টি প্রশ্ন করার পর তার উপর্যুপরি জেরায় আমি রীতিমতো বিরক্ত। আমাদের নিয়ে যাবার জন্য ডুয়ার্সের জঙ্গল থেকে গাড়ি পাঠিয়েছেন সাহিত্য উৎসবের অন্যতম সংগঠক সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য। ড্রাইভারের নাম রাজ। আমরা বললাম, বাহ্ বেশ তো! ওপাওে রাজু, এপারে রাজ। চার যাত্রী নিয়ে চ্যাংড়াবান্ধা থেকে গাড়ি রওনা হলো সোয়া ৩টায়।

সীমান্তের এপারে সড়কটি মসৃণ ও প্রশস্ত; মধ্যিখানে আইল্যান্ড। চৌরঙ্গী থেকে কোচবিহারের পথ গেছে। ডানে সোজা গেলে মেখলিগঞ্জ। পথের পাশে চা-বাগান দেখা দিল ফের। রাজ বলল, ওগুলো প্রাইভেট চা-বাগান। সমতলের চা-বাগানে লাভ বেশি, রাজের সম্পূরক মন্তব্য। পথের ডানে উঁচু রেলপথ। রেল ব্রিজ দেখে আমি জিজ্ঞাসু হলে রাজ বলল, রেললাইন গেছে ধুপগুড়ি।

সুতুঙ্গা সেতুর নিচে শাখা নদীটি শুকনো। মহাসড়কে ছাগল ঘুরে বেড়াচ্ছিল অভয়ারণ্যেও হরিণের মতো। এখানে গরু হলো দেবতার মতো পূজনীয়, তাই গরুকে ঘাটায় না কেউ। মহাসড়কে গরু ঘুরে বেড়ায় মহারাজার আবেশে।

রাজ ওরাও উপজাতির সদস্য। আদিবাসী এ জনগোষ্ঠীর কোনো ঠাকুর বা দেবতা নেই। তারা উনুন পূজা করে। কেন? কারণ উনুন খাদ্য প্রস্তুত করে। রাণীরহাট মোড়ে মহাসড়কে উঠল গাড়ি। ইউ টার্ন নিতে শিলিগুড়ির দিকে কিছুটা গেল। অতঃপর ফিরে এলো টোল প্লাজার দিকে। এই মহাসড়ক আসাম হয়ে চলে গেছে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত অঙ্গরাজ্যের (সেভেন সিস্টার্স) দিকে।

স্ট্র্যাটেজিক্যালি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই ৩১ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে। মাইলপোস্ট দেখাল, আসামের রাজধানী গোয়াহাটি ৩৮৯ কিলোমিটার দূরে। নাহিদ সুলতানা ফের ড্রাইভার রাজের সাথে খুচরো আলাপে মগ্ন হলো- বউ কী করে, বউ কেন

(বাইরে) কাজ করে না ইত্যাদি। নাহিদ সুলতানা প্রবলভাবে নারীবাদী। সে আসলে বুঝতে চায়, ভারতে নারীর কতখানি ক্ষমতায়ন হয়েছে।

পথে জলঢাকা নদী পড়ল। তাকে পেরিয়ে যাওয়া সেতুটি বেশ বড়। একটি জায়গায় ভারতের অনেক তেরঙা পতাকা দেখলাম, তবে আকারে ছোট ও বর্গাকৃতির। কোনো ভিভিআইপির আগমনের জন্য জায়গাটি প্রস্তুত বলে মনে হলো। রাজ জানাল, মমতা ব্যানার্জি আসবেন। আর কিছুদিন পরই যে ভারতের লোকসভা নির্বাচন, আমাদের মনে ছিল না। পশ্চিমবঙ্গেও যে তিনটি জেলা নিয়ে উত্তরবঙ্গ– শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার মমতা ব্যানার্জিও স্ট্রংহোল্ড, যদিও গত লোকসভা নির্বাচনে তিনটি আসনই পেয়েছিল বিজেপি। এবার আসন তিনটি পেতে তৃণমূল কংগ্রেস মরিয়া। ঐ স্থান থেকে আলিপুরদুয়ার ৭৭ কিলোমিটার দূরে! দুয়ার থেকেই ডুয়ার্স!

৬

ন্যাশনাল হাইওয়ে ৩১ দিয়ে ভারী ভারী ট্রাক যাচ্ছে। মহাসড়কের মাইলফলক দেখাল– হাসিমারা ৫১ কিলোমিটার দূরে। কেবল হাসিমারা নয়, এ অঞ্চলে রয়েছে গরুমারা ও ব্যাঙডাকির মতো অদ্ভুত সব নামের এলাকা। মাইলফলক দেখাল– সোজা গেলে বীরপাড়া আর বামে গেলে ডুরামারি ও ঠাকুরপাঠ। মহাসড়কের দু'পাশে চা-বাগান তাদের মসৃণ সবুজ পিঠ নিয়ে মায়াময় ছায়া বিস্তার করল। চা গাছগুলো সূর্যের খরতাপে যেন পুড়ে না যায় সে জন্য রয়েছে উঁচু গাছের ছায়া। গয়েরকাটা নামক স্থান থেকে সড়ক ঘুরে গেল বামদিকে। দেখলাম দু'পাশের বাজার, বাড়িঘর, স্থাপনা সবই সাদামাটা ও দরিদ্র চেহারার। বাংলাদেশ থেকে আলাদা কিছু নয়।

নাহিদ সুলতানা গান ধরলেন– 'সবে যখন আকাশটাতে রঙ লেগেছে'। ডুয়ার্স সাহিত্য উৎসবের কর্মসূচিতে তার নাম দেখেছিলাম 'গায়ক' (ভয়ে 'গায়িকা' লিখলাম না, নাহিদ নারীবাদী) হিসেবে। তখন অবাক হলেও বুঝলাম, সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য জেনে-বুঝে, গান শুনে মুগ্ধ হয়েই নাহিদ সুলতানার নাম তালিকায় রেখেছেন। আমাদের উৎসাহ পেয়ে ক্লাসিক্যাল বাংলা গান থেকে সে চলে এলো সাম্প্রতিক জনপ্রিয় গানে 'সাদা সাদা কালা কালা' এবং 'দেখা না দিলে বন্ধু কথা কইও না'! আমরা তার গানের প্রশংসা করলে নাহিদ সুলতানা বললেন, 'আমি তো গান শিখিনি'। অনেকের প্রকৃতি প্রদত্ত প্রতিভা থাকে গানে। যেমন খায়রুল আলম সবুজ কোথাও গান শেখেননি, কিন্তু কী অপূর্ব গায়কী তার!

সাইনবোর্ডে তেলিপাড়া মোড় দেখে সবাইকে বলি, আমাদের গ্রামাঞ্চলে তেলিপাড়া বলে একটি জায়গা রয়েছে। বীরপাড়ায় পুলিশ গাড়ি চেক করল। স্যুটকেসগুলো বাদ দিয়ে মাহমুদ হাফিজের ব্যাকপ্যাক দেখে সন্দেহ করল। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কোনটি খুলব?' তিনি বললেন, 'এই কালো ব্যাগটি খুলুন।' আমরা

তিস্তাব্যারেজের সামনে থেকে তেলে ভাজা পাপড় হাতে হাজির ভ্রমণগদ্য সম্পাদক

বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে অফিসার একগাল হেসে বললেন, 'আমি ঢাকার ছেলে।'

বীরপাড়া চৌরাস্তা থেকে চারদিকে পথ গেছে। এই সড়কের সোজা পূর্বে আসাম ৩০০ কিলোমিটার দূরত্বে, ডানে গুমটো ভুটান ২০ কিলোমিটার আর বামে কোচবিহার রয়েছে ৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে। ভুটানে প্রবেশের পথটি এই জলপাইগুড়ি জেলাতেই। রাজ যে গাড়িটি চালাচ্ছে সেটি মাদারীহাটের। মাদারীহাট তখনো ১২ কিলোমিটার দূরে।

কেবল ভাটিতেই নদী জলশূন্য নয়; উজানেও নদী জলশূন্য। ডিমডিমা নদী জলশূন্য। এর পর আরেকটি জলশূন্য নদী দেখলাম, নাম রাঙালিবাজনা। আমরা পড়েছিলাম বাঙালিবাজনা। তেমন হলে মন্দ হতো না। এখানে টোল প্লাজায় টোল দিতে হলো। কাছেই কামাক্ষ্যা এক্সপ্রেস ট্রেনটি যাচ্ছিল আসামের দিকে।

আমাদের মাঝে বিভিন্ন আলাপ চলছিল। নাহিদ সুলতানা বললেন, তিনি জীবনে একটিই কবিতা লিখেছেন, তাও দু'লাইনের। এর পর আর লেখেননি। কী সেই কবিতা– আমরা ব্যগ্র হলাম শুনতে। কবিতা শুনে তো স্তম্ভিত! কেননা, জাতীয় কবিতা পরিষদের শুরুর দিকটায় এ দুটি লাইন 'আমি লিখলাম সম্ভাবনা/ তুমি পড়লে সম্ভব না' খুব বিখ্যাত হয়েছিল। কবির নামটিও জানি– ইস্তেকবাল হোসেন। তবে কি ইস্তেকবাল হোসেন নাহিদ সুলতানার কবিতা নিজের নামে চালিয়ে দিয়েছিল? 'শুধু সে নয়, আরো অনেকেই চালিয়েছিল', নাহিদ সুলতানার খেদোক্তি। প্রথম কবিতার

ঐ পরিণতি দেখে হতাশ হয়ে নাহিদ সুলতানা আর কোনো কবিতা লেখেননি। ১৯৯০ সাল থেকে তসলিমা নাসরিনের সঙ্গে নাহিদের বন্ধুত্ব, তসলিমার কবিতার ভক্ত। এর কারণ নাহিদ নারীবাদী। তার মতে, পুরুষের কবিতা anti women। পুরুষরা তাদের কবিতায় নারীর শরীরের বাঁক, নারী শরীরের ছাপ, নারীর শরীরের সৌন্দর্য ইত্যাদি লেখে।

গাড়ি এসে পড়ে মাদারীহাট। এর পরে ফালাকাটার দিকে যে পথ গেছে সে পথ ধরে যখন এগোচ্ছিল, সুরঙ্গমা ভট্টাচার্যের ফোন আসে। তিনি আমাদের যেতে বললেন দেবরাণীর পথে। রাজ বলল, ওইদিকে একটি রিসোর্ট রয়েছে। তবে কি আমরা থাকব দেবরাণী রিসোর্টে? তা নয়। গাড়ি ঘুরিয়ে ফের প্রধান সড়কে এসে আরেকটি গাড়িতে সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য, রেজাউদ্দিন স্টালিন ও কাজী মাজেদ নওয়াজকে পাই। শেষোক্ত দু'জন বাংলাদেশের কবি হলং এসে পৌঁছেছেন গতকাল রাতে। তারা কলকাতা থেকে বিমানে চড়ে বাগডোগরা নেমেছেন, সেখান থেকে গাড়িতে হলং। তারা বেরিয়েছেন কয়েকটি স্পট দেখবেন বলে। সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য চাইলেন, আমরা তাদের সাথী হই। চমৎকার আইডিয়া, তবে তারা হলেন তাজা শরীরের, আমরা ক্লান্ত। তারা দুপুরে আহার করেছেন, আমরা ক্ষুধার্ত। ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত শরীর নিয়েই আমরা তাদের অনুসারী হই। কারণ জঙ্গল দেখার সুযোগ বারংবার আসে না।

৭

ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩১ ধরে আমরা চললাম চিলাপাতা ফরেস্টের দিকে। জলদাপাড়া রিজার্ভ ফরেস্টের পাশে আরো দুটি রিজার্ভ ফরেস্ট রয়েছে। সুরঙ্গমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দুটি গাড়িতে চড়ে আমরা যাচ্ছি সেগুলো দেখতে। যাচ্ছি শিলিগুড়ি থেকে আসামমুখী ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩১ ধরে। পিছনের গাড়িটি হঠাৎ থেমে গেলে আমাদের ড্রাইভারও ব্রেক কষে। দেখি তিন কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন, সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য ও কাজী মাজেদ নওয়াজ গাড়ি থেকে নেমে হাইওয়ের পাশে নিচু জমিতে কী যেন খুঁজছেন। ঘাস ও গুল্মে ছাওয়া সেই নিচু জমির অদূরে অভয়ারণ্যের একহারা কাণ্ডের উঁচুমাথা বৃক্ষসারি। গাড়ি থামিয়ে তিন কবির নেমে পড়ার কারণ, তারা একটি মৃত গাছের গুঁড়ির শুকনো ডালে একটি ময়ূর দেখতে পেয়েছেন। আমরা এগোতে এগোতে সে ময়ূর উড়ে গেছে দূরে। পাখি জগতের এক অপূর্ব সুন্দর প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা হলো না মুহূর্তের ব্যবধানে। সেখানে বন বিভাগের নারী প্রহরীর দেখা মিলল। তার কাছ থেকে জানলাম, গতকালই এখানে এক দল বাইসন এসেছিল। অরণ্যে গিয়ে আপনি পশু-পাখির দেখা পাবেন কিনা, তা নির্ভর করে ভাগ্যের উপর।

এরা যখন ময়ূর নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত, আমি তখন সমুখপানে এগিয়ে যাই। কেননা, সমুখেই দেখা যাচ্ছে একটি নদী ও নদীর উপর লম্বা ব্রিজ। ভেবেছিলাম, তিস্তা নদী। পরে জানলাম ওটা তোরসা। বেশ চওড়া নদীটি, সেতুটিও দীর্ঘ। নদীর বেশির ভাগই চর পড়ে শুকনো। জল বইছে কয়েকটি ধারায়। আমি যে প্রান্ত থেকে হাঁটতে শুরু করেছি তার বিপরীত প্রান্তের কাছাকাছি প্রধান ধারা। চর দেখতে দেখতে স্রোতধারা দেখার অভিপ্রায়ে আমি এগিয়ে যাই। সড়ক সেতুটির উত্তরে একটি রেল ব্রিজ গেছে। ভারী ভারী লরির ভারে সড়ক সেতুটি মৃদু কাঁপছে। আমি সাবধানে পার হয়ে অন্যপাশে যাই। দেখি, নদীর কিনারে এক দল নারী। মনে হয়, কোনো একটি ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করছে। চরের উপর খেলা করছে এক দল বালক-বালিকা। আরো দূরে নদীর কিনারে কিছু নারী বসে আছে। সেতুর অপর প্রান্তে একটি মন্দির, বেশ রঙিন। পূজারী না হলেও যা প্রবেশের আমন্ত্রণ জানায়।

তোরসা দেখে মনটা নস্টালজিক হয়ে ওঠে। এ নদীর সাথে আমার পরিচয় ৪০ বছর আগে, যখন আমি কোচবিহার শহরে প্রথম গিয়েছিলাম মঞ্জি আপার সাথে দেখা করতে। দক্ষিণে তাকাই আর দেখি, তোরসা চলেছে কোচবিহার অভিমুখে। বর্ষায়, যখন পাহাড় থেকে নেমে আসবে ঢল, তখন এ নদীর রূপ যে দারুণ বদলে যাবে, তা অনুমান করতে পারি কেবল। আমার গাড়ির সাথীরা দেখল, আমি তোরসা নদী পার হতে হতে দূরের একটি বিন্দু হয়ে গেছি। তারা এগিয়ে এসে আমাকে মন্দিরের সম্মুখ থেকে তুলে নেয়। গাড়ি এসে পড়ে হাসিমারা। এখানে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একটি ঘাঁটি রয়েছে। Hasimara- ছবি তোলার জায়গাটিও দেখলাম। এখন বিভিন্ন জায়গায়, বিশেষ করে পর্যটন কেন্দ্রে এমন একটি সাইনপোস্ট দেখা যায়। রাজ জানাল, ক্যান্টনমেন্ট রয়েছে ভিন্নগুড়িতে। থাকাটা বিচিত্র নয়। কারণ ভারতের তিন প্রতিবেশী বাংলাদেশ, চীন ও ভুটান হাসিমারার কাছাকাছি। মারামারি শুরু হলে অবশ্য হাসি থাকবে না কারো মুখেই।

কিছুটা সম্মুখে মহাসড়ক আর আসামে যাবার হাতছানি ছেড়ে আমাদের গাড়ি প্রবেশ কওে বনভূমির ভেতর। দিনের আলো কমে এলে বনভূমে সন্ধ্যা নামে। কান্ডসারির গা থেকে আলো ঝরে গিয়ে আঁধার জমতে থাকে। আমার শুধু বৃক্ষদের নাম জানতে ইচ্ছে করে। সাথীরাও গাছের নাম তেমন জানে না। তাদের একমাত্র অজুহাত, তারা বোটানি পড়েনি। আমি ভাবি, আমরা কবি ফুল-পাখি-বৃক্ষের নাম না জেনেই তাদের নিয়ে কত কবিতা লিখে চলেছি!

জলদাপাড়া অভয়ারণ্যের পাশেই কোদালবস্তি রিজার্ভ ফরেস্ট। গাড়ি থামল বন বিভাগের অনুমতি নেবার জন্য। বনের মধ্য দিয়ে পথ গেছে। মিইয়ে আসা আলোর ভেতর আমাদের চোখ বন্যপ্রাণী খুঁজে চলে। গাড়ির শব্দ আর আলোর কারণে বন্যপ্রাণীরা চলে গেছে বনের গভীর অন্দরে। মাহমুদ হাফিজ বললেন, নিউইয়র্ক থেকে আটলান্টা যাবার পথে বন পড়েছিল নিউ জার্সিতে। সেখানে হরিণের পাল এসে সড়কের উপর দাঁড়িয়ে থাকে। জঙ্গল দেখে আমার মনে দু'একটি কবিতার পঙ্‌ক্তির উদয় হয়। এ রকম দুটি লাইন হলো, 'বনে এসে মনে পড়ে তোমাদের কথা'/ আমরা জঙ্গলের বহু দৃশ্য ঘরে টাঙ্গিয়েছি'। কোদালবস্তি বনভূমির পথে বন্যপ্রাণীর দেখা না মিললেও গৃহপালিত গরুর দেখা মিলল। এক দল গরুকে

খোঁয়াড়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কয়েক রাখাল। তারা কেউ বালক বা কিশোর নয়, মধ্যবয়সী।

কোদালবস্তি ছাড়িয়ে আমরা চলে আসি চিলাপাতা রিজার্ভ ফরেস্টে। আমাদের দলনেতা সুরঙ্গমা ভট্টাচার্যের গাড়ি ভর সন্ধ্যায় যেখানে থামল তা পথিপার্শ্বের রেস্তোরাঁ। দোতলায় থাকার ব্যবস্থাও আছে। অর্থাৎ এটি একটি হোটেল, তবে তাকে সরাইখানা বলা যায়। নাম এস অধিকারী। এখানে ওয়াইফাই পাওয়া গেল। ওয়াইফাই-এর পাসওয়ার্ড মালিক স্বপ্না অধিকারীর নামে– swapna&&& । কেউ যদি ওখানে যান, তবে পাসওয়ার্ড এখনই জেনে গেলেন। কম ভাড়ায় জঙ্গলের ভেতর থাকতেও পারবেন। সারাদিন খাইনি। রেস্তোরাঁয় এসে আমাদের প্রাণ জুড়াল। গরম গরম আলু-পরোটা ও চানার ডাল অপূর্ব লাগল। তবে চায়ের অঞ্চলে এসে চা ভালো লাগল না। চা পাতার কেমন একটা গন্ধ ছড়িয়ে ছিল চায়ে। এরা এখানে এক প্রকার কাগজের কাপ আবিষ্কার করেছে। তাকে বলা যায় এক পেগ হুইস্কি ধারণে সক্ষম। ওইটুকু চা খেয়ে প্রাণ ভরে? দাম কিন্তু ১০ রুপি। ভারতে খাবার-দাবার সস্তা– এই মিথ বুঝি উধাও হতে চলেছে।

৮.

ভরসন্ধ্যায় পাতাঝরা বনের মধ্য দিয়ে যাওয়া সড়কের পাশের এক সরাইখানায় বসে আমরা নয়জন কবি উপজাতি নারীদের কাজ শেষে দল বেঁধে বাড়ি ফেরা দেখি। বনভূমির একহারা কাণ্ডের বৃক্ষদের মতো তাদের সুঠাম কাঠামোজুড়ে দিবসের অন্তরাগ যামিনী রায়ের চিত্রের আভাস জাগায়। আমরা কবি; বাস্তব পৃথিবীর অপূর্ব সব ছবি শব্দের নিহিত ব্যঞ্জনায় কল্পনার সাথে মিশিয়ে কবিতায় তুলে ধরি। প্রকৃতি বা ঈশ্বরের সৃষ্টিকে আমাদের মতো এত সূক্ষ্ম সংবেদনে, এত নিবিড় পর্যবেক্ষণে, এতখানি প্রশংসায় ধারণ করেছে কে! হয়তো চিত্রশিল্পীরা। তাদের হাতে রং-তুলি; আমাদের হাতে শব্দ ও কলম। আর আমরা জানি শব্দই ব্রহ্ম। ঈশ্বর আদিতে শব্দ ছিলেন। কবিরা হলেন শব্দের জাদুকর! ছন্দেরও।

সন্ধ্যা রাত্রিতে উত্তীর্ণ হলে আমরা গাত্রোত্থান করি। অন্ধকার পরিপূর্ণ চাদরে ঢেকে দিয়েছে চিলাপাতা বনভূমিকে। বনের মধ্য দিয়ে যাওয়া পিচঢালা পথখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার দু'পাশে গেঁথে রাখা ফ্লোরোসেন্টের উপর গাড়ির হেডলাইটের আলোর প্রতিফলনে। নিকষ কালো অন্ধকার গহ্বরের ভেতর সড়কখানি যেন এক আলোর তরবারি। এর মাঝে সম্মুখে একটা হইচই পড়ে গেল। কী ব্যাপার? এক সাম্বার হরিণ এসে দাঁড়িয়ে ছিল সড়কের উপর। হেডলাইটের আলোয় তাকে এক ঝলক দেখা গিয়েছিল। সৌভাগ্যবানরা দেখেওছিল। দুর্ভাগারা খুঁজে পেতে পেতে আঁধারের মশারির নিচে হরিণ তার দেহ লুকিয়ে ফেলেছে। এর আগে সৌভাগ্যবানরা বানর দেখেছিল।

কোদালবস্তি রিজার্ভ ফরেস্টের চেকপোস্টে গাড়িকে ফের থামতে হলো কাগজ নেবার জন্য। কাগজ আর কিছু নয়, সময় সংকেত। সে কাগজ জমা দিতে হয় ফরেস্টের সীমানা পার হবার মুখটায়। প্রহরীরা পরীক্ষা করে, বনভূমি পার হতে একটি গাড়ির যতটুকু সময় লাগার কথা তার চেয়ে অতিরিক্ত সময় লেগেছে কিনা। অতিরিক্ত বেশি সময় লাগা মানেই গাড়ি বনভূমির কোথাও থেমেছিল। এখানে থামার কোনো অনুমতি নেই। গাড়ি এসে পড়ে মাদারীহাটে, সেই পথে; যে পথ ধরে আমরা আজ বিকেলে হলং ইকো রিসোর্টের দিকে যাচ্ছিলাম।

আমাদের গাড়ির চালক রাজ ওরাও উপজাতির সদস্য, আগেই বলেছি। এই এলাকার অন্য উপজাতি হলো রাবাব। চিলাপাতার পথে যেতে যেতে রাবাব নারীদের সৌন্দর্য কবিদের মুগ্ধ করেছিল। গাড়ি যেখানে মূল সড়ক থেকে হলং ভিলেজ ইকো রিসোর্টের দিকে গেছে তার নাম ৯ মাইল। রাজ বলল, এর পরে ১২ মাইল, তার পরে ৮ মাইল, ৬ মাইল ইত্যাদি রয়েছে। ৬ মাইল পেরিয়ে ফালাকাটা; কোচবিহার যাওয়ার সড়ক। জায়গাগুলোর নাম মাইলপোস্টের মতো হওয়ায় অবাক হলাম। এই যে ৬ মাইল/৮ মাইল গণনা করা হচ্ছে; নিশ্চয়ই একটি আরম্ভ বিন্দু আছে। হঠাৎ শূন্য মাইল আছে। ৯-এর পরে ১২ ঠিক আছে। কিন্তু ১২-এর পরে ৮ গোল বাধিয়ে দেয়।

একটি নালার পাশ দিয়ে কিছুটা ভাঙাচুরা রাস্তায় আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলে। নালার বিপরীত পাশে আদিবাসীদের গ্রাম, হালকা গাছপালা চোখে পড়ে। এর পরই একটি আলোকোজ্জ্বল রিসোর্ট দেখে ওটাকেই আমাদের গন্তব্য ভাবি। হলং ভিলেজ ইকো রিসোর্ট এর পরেই। একটি আলো-আঁধারি প্রাঙ্গণে আমাদের দুটি গাড়ি প্রবেশ করে। পরিপূর্ণভাবে দেখতে না পারলেও এটা যে একটি রিসোর্ট, বুঝতে পারি ঘরগুলোর রং ও আকার দেখে। সব ঘরই মাটি থেকে কয়েক হাত উপরে অবস্থিত, আর সেটাই স্বাভাবিক। কেননা, সংলগ্ন জঙ্গলে অনেক প্রকার সাপ রয়েছে; কয়েক প্রজাতি তো বিষধর। কাঠের তৈরি ঘরগুলোতে ওঠার সিঁড়ি রয়েছে কাঠের। খুব বড় নয় ঘরগুলো। তাদের ঢেকে রাখা টিনের চাল ও দেয়াল যে বিভিন্ন রঙে রাঙানো, তা ওই আবছা অন্ধকারেও বুঝতে পারি। ভালো লাগে মাঝের প্রাঙ্গণখানি। কেননা, তাতে ফুলগাছ ও গুল্মের সমাবেশ।

আমাদের ৪ জনের জন্য বরাদ্দ হয় দুটি রুম। নাহিদ সুলতানা ও জুলেখা ফেরদৌসী এক কক্ষে; মাহমুদ হাফিজ ও আমি এক কক্ষে। সমস্যা হলো মাহমুদ হাফিজ ও জুলেখা ফেরদৌসী স্বামী-স্ত্রী। তারা এক রাত্রির বিচ্ছেদও সইবেন না। ওদিকে নাহিদ সুলতানা ও আমি আলাদা মানুষ। একই সিঁড়ি দিয়ে ওঠা যায় এমন দুটি পাশাপাশি রুমের প্রথমটির দখল নিলেন নাহিদ সুলতানা; দ্বিতীয়টির দখল হাফিজ-জুলি দম্পতির। আমি তখন গৃহহীন সন্ন্যাসীর মতো পথে পথে ঘুরি। তখন দয়াপরবশ হয়ে গৃহবণ্টন অধিদপ্তরের পরিচালক সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য আমাকে একটি একক ঘর বরাদ্দ দেন। আমি তো মহাখুশি। সবুরে যে মেওয়া ফলে তা উপলব্ধি

প্রপেলারের নিচে প্রিয় স্বদেশ

করি। আমার ঘরটি ছোটো, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সংযুক্ত স্নানঘরও চমৎকার। আমি লাগেজ রেখে হাতমুখ ধুয়ে চলে আসি হলং ইকো রিসোর্টের ডাইনিং হলে পাকুরা ও চা খেতে।

প্রবেশপথের ডানে প্রথম ঘরটিই ডাইনিং-যুক্ত রান্নাঘর। সেখানে পরিচয় হলো কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায় ও রিতা মিত্রের সাথে। তারা দু'জনেই কলকাতা থেকে এসেছেন। পরিচয় হলো এই রিসোর্টের যিনি মালিক বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য ও তার স্ত্রী স্বপ্না ভট্টাচার্যের সাথে। এখানে দেখছি ভট্টাচার্য-বামুনের ছড়াছড়ি। কাল আসবেন আরও তিন ভট্টাচার্য- রাইটার্স ওয়ার্ল্ডের সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য, মালবিকা ভট্টাচার্য ও গৌতম ভট্টাচার্য।

স্বপ্না ভট্টাচার্যের বাবার বাড়ি বিক্রমপুর, মায়ের বাড়ি ফরিদপুর। আমার মোবাইল ফোনে ভারতীয় সিম নেই, মোবাইল ডাটা নেই। একজন উপজাতি যুবক ওয়াইফাই কানেক্ট করে দিল। মাহমুদ হাফিজ ও আমি যাই রেজাউদ্দিন স্টালিন ও কাজী মাজেদ নওয়াজের সাথে আড্ডা দিতে। তাদের কক্ষটির ছাদ অতীব চমৎকার, নৌকার খোলের মতো। তবে এ খোল আকাশের দিকে পিঠ দিয়ে মাটির দিকে উপুড় হয়েছে। দেয়ালগুলোও কম চমৎকার নয়। কেননা, সেসব মুড়ে দেওয়া হয়েছে বাঁশের ফ্রেমে শীতলপাটির মতো বোনা বেতের শিল্পে।

বিভিন্ন বিষয়ে কথা উঠল। তার ভেতর পাওলো কোহেলোর ট্রান্সসাইবেরিয়ান রেলওয়ে নিয়ে লেখা Train উপন্যাস; ওরহান পামুকের উপন্যাসে বিধৃত আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীর উপর তুর্কি জনগোষ্ঠীর অত্যাচার; বুকার পুরস্কারপ্রাপ্ত একটি বইয়ের illustration করে বগুড়ার একটি মেয়ের বুকার প্রাপ্তি ইত্যাদি ছিল। বিশ্বসাহিত্যের উপর রেজাউদ্দিন স্টালিনের আগ্রহ ও জানাশোনা আমাকে মুগ্ধ করল। রাতের আহার খেতে আমরা ফের জড়ো হলাম ডাইনিং হলে। পরিচিত হলাম কবি ইলোরা বিশ্বাসের সাথে। একে একে যোগ দিলেন আমাদের অন্যান্য যাত্রাসঙ্গী। এ উৎসবে ৭১ জন যোগ দেবেন শুনে ভীষণ হতবাক নাহিদ সুলতানা। ৭১! সংখ্যাটি পুনর্বার উচ্চারণ করে তিনি আশ্বস্ত হতে চান। একবার কী কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'এটা তো আমার দেশ'। শুনে ইলোরা বিশ্বাস বললেন, এপাশে পশ্চিমবঙ্গ, ওপাশে পূর্ববঙ্গ আর হবে না। এপাশে ভারত, ওপাশে বাংলাদেশ– এটাই বাস্তবতা। পূর্বপুরুষরা যে আদিপাপ করে গেছে, তার দায় আমাদের বহন করে চলতে হবে।

পশ্চিমবাংলার কবি-লেখক যাদের সাথে মিশেছি, দেখেছি তাদের বেশির ভাগের মাঝে কয়েকটি বিষয়ে মিল রয়েছে। এক, তাদের অনেকেরই পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা ছিলেন। তাদের মাঝে একটা নস্টালজিয়া কাজ করে। দুই, তারা দেশ বিভাগকে ঐতিহাসিক ভুল বলে মনে করেন। তিন, তারা অখণ্ড বাংলার পক্ষে। চার, তারা ২১শে ফেব্রুয়ারি, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের প্রতি অনুরক্ত!

৯

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য তার তরুণ বয়সে বামপন্থী বিপ্লবী ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সিস্ট) বা সিপিএম-এর সক্রিয় কর্মী। বোধ করি উত্তরবঙ্গে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের কর্মী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল সিপিএমের শাসন ছিল। সম্ভবত একটানা দীর্ঘ শাসনের একটি বিশ্ব রেকর্ডই তারা গড়েছিলেন। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকলে যা হয়। শৈথিল্য জমতে থাকে আর সুবিধাবাদীরা এসে জড়ো হয় ক্ষমতার ছাতার তলে। জনগণ থেকে সরে যাওয়া আর ভুলভ্রান্তি সিপিএমের ভরাডুবি ঘটিয়ে উত্থান ঘটিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জায়গায় এসেছেন মমতা ব্যানার্জি। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য তার দুই কমরেডসহ মতাদর্শগত বিরোধের কারণে সিপিএম থেকে বেরিয়ে আসেন। শুরু করেন ব্যবসা। জলদাপাড়া রিজার্ভ ফরেস্টের পাশে ক্ষুদ্র আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর গ্রাম। হলং এমনই একটি গ্রাম।

২০০৪ সালে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য হলং গ্রামে দুই বিঘা জমি কিনেন। সরাসরি কিনতে পারেননি। একজন উপজাতীয় সদস্যের নামে কিনতে হয়েছে; পরে হাত বদল করে তিনি মালিক। জলদাপাড়া জঙ্গলের গাছপালা আর অভয়ারণ্যের পশুপাখি দেখতে সেই কবে থেকে ট্যুরিস্টরা এই এলাকায় আসছেন। দিন যত গড়াচ্ছে লোকের হাতে টাকা-পয়সা বাড়ছে। বাড়ছে তাদের ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা। রাস্তাঘাটেরও যথেষ্ট উন্নতি। সুতরাং জলদাপাড়া ঘিরে ট্যুরিস্ট লজ গড়ে উঠবে, এটাই স্বাভাবিক। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য গড়ে তুললেন হলং ভিলেজ ইকো ট্যুরিস্ট লজ।

আমি যখন গৃহহীন অর্থাৎ দোলাচলে; কোন ঘরে হবে ঠাঁই, তখন ঘুরে ঘুরে হলং ভিলেজ ইকো রিসোর্টের ঘরগুলো দেখি। একটি সারিতে অনেকটি ঘর। বিচ্ছিন্ন

ঘর রয়েছে তিনটি। সব মিলিয়ে বারোটি ঘর, যার একটি হলো ডাইনিং হল-যুক্ত রান্নাঘর। পাশেই জঙ্গল। সুতরাং এখানে কাঠের অভাব নেই। ঘরগুলো কাঠেরই তৈরি, কেবল ছাদ টিনের। লাল, সবুজ, নীল প্রধান তিনটি রং; সঙ্গে হলুদও রয়েছে। বাড়িগুলোর টিনের চাল ও দেয়ালে রঙিন সৌন্দর্য টাঙিয়েছে; দিয়েছে ট্যুরিস্ট লজের আদল। বিভিন্ন পাখির নামে কক্ষগুলোর নাম। যেমন ময়ূর, মাছরাঙ্গা, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি। একটি রিসোর্টে যেমন থাকে, দোল খাবার দোলনা, বসবার ছাউনি-ঢাকা চত্বও ইত্যাদি। মাঝের চত্বরজুড়ে আছে গাছপালা, লতাগুল্ম।

রাতের খাবার খেতে এসে আরো কয়েকটি নতুন মুখের সাথে পরিচিত হলাম। এদের মাঝে কবি খগেশ্বর দাস সহজেই শনাক্ত হলেন তার লম্বা জুম লেন্স লাগানো ডিএসএলআর ক্যামেরার জন্য। তিনি আসামের কাজিরাঙ্গা ফরেস্টে গিয়েছিলেন পাখির ছবি তুলতে। জলদাপাড়া রিজার্ভ ফরেস্টে তার একই মিশন। সোনায় সোহাগা যে, কবিতা উৎসব এখানেই হচ্ছে। আসামের শিলচর থেকে এসেছেন মা মিতা দাস পুরকায়স্থ ও মেয়ে বিশ্বরূপা পুরকায়স্থ। পুরকায়স্থ উপাধি শুনে আমার মনে পড়ল ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই গল্পটি। যেখানে বাড়িতে চুরি হওয়ায় থানায় মামলা করতে এসেছেন পদ্মলোচন পুরকায়স্থ, অর্থাৎ ভানু। বিশ্বরূপার রূপশ্রী দেখে আমি বলি, বিশ্বের রূপ যে অবয়বে এসে স্থিত। এ কথা শুনে ভারি স্নিগ্ধ ও মিষ্টি করে হাসে শিলচরের বাঙালি মেয়েটি। মায়ের প্রভাবে সে-ও কবিতা লেখে, আবৃত্তি করে। রাতের আহার হলো দুর্দান্ত- ভাত, আলু ভাজি, সবজি, মুগ ডাল ও মাটন। চমৎকার রান্না। বিশেষ করে মাটন ভারি উপাদেয় ছিল। স্বপ্না ভট্টাচার্য দাঁড়িয়ে থেকে খাবার পরিবেশনে তদারকি করলেন।

কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন ইতিহাসবিদ। তার পিএইচডি থিসিস ভারতবর্ষের গত শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে। কলকাতার অদূরে একটি কলেজে তিনি অধ্যাপনা করেন। সুদর্শন মানুষটির ছবি তোলার খুব শখ। খাবার পরিবেশনের আগে আমি সবার ছবি তুলছিলাম। টেবিলে পাতা ছিল শূন্য প্লেটগুলো। নাহিদ সুলতানা একটি শূন্য থালা এমনভাবে মুখের সম্মুখে ধরলেন যে তার মুখ ঢেকে গেল। এ রকম আচরণের কারণ কী? নাহিদ বললেন, আমি সিংহ রাশির জাতিকা। আমি বললাম, তাহলে কারও রাশি বৃশ্চিক হলে সে কি বৃশ্চিকের মতো আচরণ করবে? আমি আর অনমনীয় সিংহীর ছবি তুলি না। আমাকে গোপনে বাহবা দেন কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই ঠিক হয়ে ছিল, আমরা আগামীকাল সকালে সাফারিতে যাব। খুব ভোরে যেতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু সকাল সাড়ে ৭টার আগে টিকেট পাওয়া যায়নি। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে টিকেট বুক করেছিলেন কাজী মাজেদ নওয়াজ। প্রতি টিকেটের মূল্য ৯৪০ রুপি। আমরা মাজেদ নওয়াজকে যার যার টিকেটের মূল্য পরিশোধ করি আর মনে মনে প্রস্তুত হই সাফারিতে যাওয়ার। অর্থাৎ হাতী ও গণ্ডারের মুখোমুখি হওয়ার। বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য গান ধরলেন দরাজ গলায়– 'পদ্মার ঢেউ রে, মোর শূন্য হৃদয়পদ্ম নিয়ে যা, যারে...।' পদ্মাপাড়ের কিছু

মানুষ এবং পদ্মার স্মৃতি বুকে নিয়ে বাঁচা আরও কিছু মানুষ তাদের কল্পনাতে একটি উথালপাথাল নদীর নিরন্তর বয়ে চলা দেখলেন সে গানের ঐন্দ্রজালিক সুরে।

১০

রাতের আহার শেষে বিশ্বনাথদা আমাদের নিয়ে গেলেন ইকো রিসোর্টের পিছন দিকটায়, যেখানে একটি ত্রিতল দালান রয়েছে। তিনি ও স্বপ্না বৌদি এ দালানেই থাকেন। আমরা সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে যাই, যা অনেকটা ওয়াচ টাওয়ারের মতো। এখান থেকে জলদাপাড়া জঙ্গল পরিপূর্ণরূপে দেখা যায়। আমি বুঝতে পারি, জঙ্গল থেকে এখানেই হাতি এসেছিল। সাহিত্য উৎসবে যোগদানকারীদের মাঝে আন্তঃসংযোগের উদ্দেশ্যে যে whatsapp গ্রুপ খোলা হয়েছিল, সেই গ্রুপ মেইলে হাতি তাড়ানোর ছবি দেখে আমরা মনে মনে উত্তেজিত ছিলাম, হাতি আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়, না আমরা হাতি তাড়াই, সে দৃশ্য দর্শনেচ্ছায়।

এই দালান আর কাঁটাতারে ঘেরা জঙ্গলের মাঝের জায়গাটা ঘাসে ছাওয়া মাঠের মতো ও বৃক্ষহীন। বিশ্বনাথদা ও তার ব্যবসায়িক পার্টনার মিলে এখানে ১০ বিঘা জমি কিনে রেখেছেন। 'সংরক্ষিত বনভূমির জায়গা কি কেনা যায়?' এর উত্তর, 'অবশ্যই না। জঙ্গল-সংলগ্ন হলেও এ জমিটি স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর। তাদের কাছ থেকেই কেনা, বিঘাপ্রতি ১৫/২০ লক্ষ টাকা দরে।' ওখানে একটি পুকুর হবে– তেতলার বারান্দা থেকে বিশ্বনাথদা একটি জায়গা দেখিয়ে বললেন। খুব ভোরে ওখানে হরিণ আসে আর চমৎকার দেখা যায় সূর্যোদয়।

বৃক্ষ-ছাওয়া একটি সরু পথ গেছে ইকো রিসোর্টের মূল প্রাঙ্গণ থেকে তেতলার ওই দালান, তার সংলগ্ন খোলা জায়গা, দু'একটি বিচ্ছিন্ন গাছ ও বিপুল গাছের সমাবেশ জলদাপাড়া জঙ্গলের দিকে। আমার জন্য নির্ধারিত ঘরটি ওই সরু পথের প্রারম্ভে। পাশে একটি বড় ঘর; তার গায়ে লাগানো এই স্বতন্ত্র ঘরটি। গভীর জঙ্গলের পাশে কুটিরে রাত কাটানো আর নগরীর একটি হোটেল কক্ষে রাত কাটানো এক কথা নয়। যদিও এ কুটির সুরক্ষিত, তবু অদূরে যে বিপুল দেহ আর লম্বা শুঁড় নিয়ে হাতির সারি রয়েছে; রয়েছে ক্ষিপ্র বাঘ ও গোঁয়ার গণ্ডার; শুকনো পাতার ভেতর চলাচল করছে সাপ– এ কথা তো মিথ্যে নয়। বাস্তবে না হলেও কল্পনার ভেতর তারা ধরা পড়ে ঠিকই। এক আধিভৌতিক ছায়া নিয়ে তারা দাঁড়ায় জঙ্গলের ভৌগোলিক সন্নিহিতির অনিবার্য প্রভাবে।

তবু এ ঘরটিতে এসে আমি খুশি। আমি এখানে একাকী ও স্বাধীন। মনে মনে সুরঙ্গমা ভট্টাচার্যকে ধন্যবাদ জানাই আমার জন্য এককভাবে ঘরটি বরাদ্দ করার জন্য। খুব ভোরে জেগে উঠে প্রস্তুত হই। একটি মাহিন্দ্রা বলেরো এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে। আমরা আটজন। ড্রাইভার রবির পাশে রেজাউদ্দিন স্টালিন; মাঝের সিটে নাহিদ সুলতানা, জুলি ভাবি ও আমি- আমরা তিনজন আর পিছনে দুই সিটে মুখোমুখি হয়ে বসলেন মাহমুদ হাফিজ, কাজী মাজেদ নওয়াজ, খগেশ্বর চন্দ্র দাস ও কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়। আদিবাসী গ্রামগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে

আমরা গল্প জুড়ি। এ বনে বাঘ আছে শুনে আমার মনে পড়ল তিন বাঘ শিকারির গল্পের কথা। কে কত বড় শিকারি, এটা প্রমাণের গল্প। সবাই খুব মজা পেলো গল্পটায়। আমরা অবশ্য বাঘ শিকার করতে যাচ্ছি না; উল্টো মওকা পেলে বাঘই আমাদের শিকার করতে পারে। তবে আমরা হলাম সবচেয়ে বড়ো বাঘ শিকারি। কারণ আমাদের হাতে বন্দুক নেই, গুলিও নেই, এমনকি নেই বন্দুকের লাইসেন্স। চারদিকে কাচঢাকা বলেরো দেখে ভেতরে সেঁধিয়েছি আর ভেবেছি, বাঘ থেকে নিরাপদ। এ গাড়িতে চড়ে যে সাফারিতে যাওয়া হবে না; যেতে হবে খোলা জিপে তখন কে জানত!

মাদারীহাটেই, ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩১ এর পাশে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে প্রবেশের পথ। জলদাপাড়া অরণ্যে যে সকল প্রাণী নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের কিছু ভাস্কর্য রয়েছে প্রবেশপথের দেয়ালে। উঁচু কাণ্ডের বৃক্ষসারি আর ঝরাপাতায় ছাওয়া বনপ্রাঙ্গণের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে সরু পথ। এই বনের মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে হলং নদী; কোথাও জলহীন, কোথাও ক্ষীণধারায়। হলং নদীর একটি জলহীন অংশকে বনের মধ্যেই মানায়। এমন একটি সেতু দিয়ে পার হবার পর যেখানে এসে পৌঁছাই, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন অধিদপ্তরের একটি ঘাঁটি। ঘাঁটি বললাম কারণ এখানে শুধু যে কিছু সরকারি অফিস আর সরকারি গাড়িঘোড়া রয়েছে, তা নয়। রয়েছে দর্শনার্থীদেও থাকার জন্য হোটেলসদৃশ চারতলা দালান; দু'পাশে বারান্দাসমেত বাংলো ও সিমেন্টের তৈরি ১০টি একক কুটির।

হলুদ দালানগুলো সবুজ টিনের চালে ঢাকা হলেও পর্যটন হোটেলটি সাদা রঙের, যার কার্নিশ গোলাপি। বাংলোটি রয়েছে আমাদের গাড়ি যেখানে থেমেছে তার কাছাকাছি। এর সম্মুখে একটি একশিঙ্গা গণ্ডারের সুস্থ-সবল ভাস্কর্য রয়েছে। আর বিবিধ ফুলের নামে নামাঙ্কিত খয়েরি বা অফহোয়াইট দেয়াল; সবুজ ছাদের কুটিরগুলো রয়েছে প্রধান কমপ্লেক্সের বাম পাশে একটি সবুজ মাঠের চারপাশে। আমি সেখানে একটি বড় ছাতা ছাউনির নিচে কয়েক পর্যটককে দেখতে পাই আলাপরত। গাড়ি থেকে নেমেই যা দেখেছি তা হলো ওই একশিঙ্গা গণ্ডারের নিথর মূর্তি; মূল কমপ্লেক্সের সম্মুখের প্রাঙ্গণে একটি নিঃসঙ্গ হাতি আর এক জোড়া বাইসনের ভাস্কর্য। বড় বলেই হয়তো তারা প্রথমে চোখে ধরা পড়েছে। পওে সেখানে হাঁটতে গিয়ে দেখি, প্রাঙ্গণটি ভরে আছে বিভিন্ন প্রকার জন্তুর প্রাণহীন স্বরূপে। বুঝি, এ সকল জন্তু এই জাতীয় উদ্যানে আজও টিকে আছে।

মাহমুদ হাফিজ আমাকে ডাকলেন একটি বড় বোর্ডের দিকে, যেখানে এই জাতীয় উদ্যান সম্পর্কে বিস্তর তথ্য দেওয়া। নোট নিতে দেরি হবে বিধায় আমি তথ্যগুলো ছবিতে তুলে রাখি। বোর্ডের এক পাশে পাখি, প্রজাপতি ও পতঙ্গের ছবি; বেশিরভাগ ছবিই পাখির। অন্যপাশে দুষ্প্রাপ্য বিভিন্ন জীবজন্তুর ছবি। মাঝের জায়গাটিতে রয়েছে পর্যটকরা কী করতে পারবেন (Do's), আর কী করতে পারবেন না (Don'ts), আর কিছু নির্দেশ। স্বাভাবিকভাবে আমরা যেসব বুঝি যেমন বাদ্যযন্ত্র

বাজানো যাবে না; আগুন জ্বালানো যাবে না; বহন করা যাবে না কোনো আগ্নেয়াস্ত্র; তার বাইরে রয়েছে এমন কিছু নির্দেশ বা পরামর্শ যা আমরা জানি না। যেমন পর্যটকদের রঙিন জামা-কাপড়, গায়ে সুগন্ধি মেখে না যাবার পরামর্শ; মদ্যপান বা ধূমপান করায় নিষেধাজ্ঞা; বনভোজন, সাঁতার কাটা বা মাছ ধরায় নিষেধাজ্ঞা; এমনকি নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে না যাওয়ার নির্দেশ।

২১৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ বিশাল বনভূমি আলীপুরদুয়ার জেলার আরও কয়েকটি বনভূমির মাঝে বৃহত্তম। জলদাপাড়া বিখ্যাত হয় এর একশৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য। বস্তুত ১৯৪১ সালে ইংরেজ সরকার এই বিরল প্রজাতির প্রাণীকে রক্ষা করার জন্য জলদাপাড়াকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করে। আসামের কাজিরাঙ্গা ফরেস্টের পর এ জঙ্গলেই সবচেয়ে বেশি ভারতীয় প্রজাতির গণ্ডার রয়েছে। ২০১৪ সালে ভারত সরকার জলদাপাড়া অভয়ারণ্যকে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করে। তোরসা নদীর অববাহিকায় অবস্থিত এ জঙ্গলে প্রচুর ঘাস রয়েছে (tall elephant grass), যা যেমন হাতির প্রিয়, তেমনি গণ্ডারেরও। আর এ দুটি প্রাণী জলদাপাড়া অরণ্যকে বিখ্যাত করে তুলেছে।

সকাল ৭:৩৫ মিনিটে দুটো জিপে চারজন করে আটজন রওয়ানা হলাম জঙ্গল সাফারিতে। খোলা জিপে একটি খাঁচা রয়েছে, যার চার খোপে চার বনসন্দর্শী উঠে দাঁড়িয়ে আরো ভালো করে বন দেখতে পাবেন। মাহমুদ হাফিজ, জুলেখা ভাবি ও আমি যে জিপে চড়ি, সেটিতে যোগ দেন খগেশ্বর চন্দ্র দাস, যার কাছে বন্দুক নেই; আছে বন্দুকের মতো লম্বা ক্যামেরা।

১১

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু ও দীর্ঘ পথ গেছে। মাটির উপর পাথর বিছানো পথ। দু'পাশের গাছগুলোর প্রতিটি যেন অমিতাভ বচ্চন– একহারা, দীর্ঘদেহী, নায়কোচিত। এই জঙ্গল, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান বাংলা সাহিত্যের প্রচুর পৃষ্ঠাজুড়ে বর্ণিত। তার মধ্য দিয়ে সত্যি সত্যি সাফারিতে যাচ্ছি– ভাবতেই সাহিত্যের এক শিহরণ জাগে। 'সাফারি' শব্দটি নিজেই শিহরণ জায়গায়, আর তা শুনলেই মনে পড়ে আফ্রিকার সিংহ ও জিরাফের কথা। এ বনে রয়েছে গণ্ডার আর হাতি। আফ্রিকার জঙ্গলেও তারা রয়েছে। তবে অতদূর যাওয়া তো আর সম্ভব নয়। হাতের কাছে এই জলদাপাড়া জঙ্গল, দেশ বিভাগের সময়ে মুসলমান নেতারা একটু বিচক্ষণ হলে এই অভয়ারণ্য হতে পারত আমাদেরও। তারা সে সময় ব্যস্ত ছিল পাঞ্জাব আর কাশ্মীরের সীমানা টানতে। পূর্ববঙ্গ কী হারাল, তা নিয়ে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বা লিয়াকত আলী খানের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। প্রশ্ন হলো, শেরেবাংলা কী করলেন?

দু'পাশের ভীষণ উঁচু গাছগুলোর মাথায় তুলার মতো ফুল দেখে আমাদের গাইড মোরসালিনকে জিজ্ঞেস করি, ওগুলো তুলা গাছ কিনা? মোরসালিন স্থানীয়; এই জঙ্গলের কাছাকাছি কোথাও তার ঘর। জঙ্গল দেখতে উৎসাহীদের গাইড হিসেবে আরো কিছু যুবকের সাথে সেও কাজ করে। আমাকে জানাল, ওগুলো

তুলা নয়; ওদলা। ফুল নয়; ফল। ওদলা হোক কিংবা তুলা, তাদের রূপ দেখে চলি। খগেশ্বরদা তার বন্দুকের মতো লম্বা নলের জুম লেন্সের ক্যামেরা নিয়ে পাখি খুঁজছেন। হঠাৎ তিনি ড্রাইভার ধনীরাম খারিয়াকে খাড়াতে বললেন। ব্যাপার কী? বাম পাশের গুল্মে ছাওয়া অংশটির অপর পাশে নিচু গাছের বাঁকানো শাখার উপর বসে আছে জগতের সুন্দরতম পাখি– ময়ূর। আহা! ময়ূরীর এত রূপ নাই। গাড়ি আগ-পাছ করে। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে ময়ূরের ১০০ ছবি তুলে কবি ও পাখিপ্রেমী খগেশ্বর চন্দ্র দাস সন্তুষ্ট হলে ধনীরাম খারিয়া গাড়ি দেয় ছাড়িয়া।

এই সড়ক গেছে ২১৬ বর্গ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ জলদাপাড়া বাগানের একটি প্রান্ত ঘেঁষে। বনের পশুরা যাতে জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে না পড়ে, সে জন্য কাঁটাতার দিয়ে জঙ্গলের সীমান্ত বাঁধা। মোরসালিন জানাল, ওই কাঁটাতারে লো ভোল্টেজ ডাইরেক্ট কারেন্ট (DC) রয়েছে। কাঁটাতার পেরুতে গেলেই বৈদ্যুতিক শক খাবে হাতি কিংবা গণ্ডার, কিন্তু মরবে না। ক্ষুদ্র মানুষের বৃহৎ বুদ্ধির কাছে হার মেনে ফিরে আসবে জঙ্গলের ভেতর। একজন গাইডের যে ভূমিকা তা মনে রেখে মোরসালিন আমাদের অভয়ারণ্যের বিভিন্ন তথ্য দিতে থাকে। তার কাছে জানতে পারি, জলদাপাড়া জঙ্গলে এখন গণ্ডার রয়েছে ২১৭টি। কেবল আসামের কাজিরাঙ্গা অভয়ারণ্যে এর চেয়ে বেশি সংখ্যক গণ্ডার রয়েছে। মনুষ্য-গণ্ডারের হাত থেকে এই বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে ভারত সরকারের বন বিভাগের প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

আমরা যখন বনে প্রবেশ করছিলাম, তখন একই সড়ক ধরে আরো প্রত্যুষে যারা সাফারিতে গিয়েছিল, মানুষভর্তি কিছু জিপ ফিরে আসছিল। কিছু জিপ যাচ্ছিল বনের ভেতর। আমাদের এই বিপরীতমুখী চলাচল নিরাসক্ত চোখে দেখছিল পথের পাশে তৈরি ওয়াচ টাওয়ারের প্রহরীরা, যাদের চেহারা ধনীরাম খারিয়ার মতো চ্যাপ্টা; খাড়া নয়। মোরসালিন আমাদের জানায়, বনের যে অংশটি আমরা পার হচ্ছি সেটি বাফার জোন। অনেকটা নো ম্যান্স ল্যান্ডের মতো, তবে দৈর্ঘ্য কম নয়; সাড়ে ছয় কিলোমিটার। বাফার জোনের শেষ প্রান্তে বন বিভাগের একটি বিট অফিস। এ অফিস চত্বরে কয়েকটি পোষা হাতি দেখি। বন্য নয় বলে তেমন উত্তেজনা বোধ করি না। তবে সমুদ্রে বিপুল সংখ্যক তিমি মাছ যেমন উত্তেজনা জাগায়; ডাঙার সবচেয়ে বৃহৎ প্রাণীটি তার তৃণভোজী স্বভাব, বিশাল দেহ, প্রাসাদের গম্বুজের মতো চার পা আর এক শক্তিশালী শুঁড় নিয়ে হয়ে উঠতে পারে ভয়ংকর। এমন বিশাল ও ভয়ংকর প্রাণী কী করে মানুষ পোষ মানাল, সেও এক বিস্ময়!

মনে পড়ল ৯০ দশকের কবি খলিল মজিদের প্রথম কাব্যের নাম পাল কাপ্য। প্রথমবার আমি পড়েছিলাম পাল কাপ্য। খলিল মজিদই জানিয়েছিল, পাল কাপ্য হলেন সেই মানুষটি যিনি বাংলায় হাতিকে পোষ মানিয়েছিলেন। কবিরা বুনো ও হিংস্র শব্দমালাকে পোষ মানান। সুতরাং এই ব্যতিক্রমী নামটি আমাকে অবাক করেনি। এমন একটা সময় ছিল যখন ভারতবর্ষের জঙ্গলগুলো হাতিদের রাজ্য হয়ে

উঠেছিল। চতুর মানুষ বৃহৎ জন্তুগুলোকে দু'বেলা আহারের লোভ দেখিয়ে; স্যালারি ও বেনিফিটের প্যাকেজ ধরিয়ে এমন বশীভূত করে ফেলল যে মানুষের পররাজ্য গ্রাস ও যুদ্ধজয়ের আকাঙ্ক্ষায় হাতিরা অনিচ্ছায় শামিল হলো। বিশাল দেহ থাকলে কী হবে, হাতির বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যখন পড়ি, একেকজন ভারতীয় রাজার সৈন্যদলে হাজার হাজার হাতি ছিল তখন দৃশ্যকল্পের অভিনবত্ব ও বিপুলত্বে বাক-রহিত হয়ে পড়ি। আমরা ঐরাবত দেখি শিশুর মতো কৌতূহলে, সার্কাসের দর্শকের মতো।

বাফার জোনে দেখা না মিললেও মূল জঙ্গলে শুধু হাতি নয়; গণ্ডার ও বাঘের দেখা পাওয়ার (নিরাপদ দূরত্বে অবশ্যই) আকাঙ্ক্ষায় আমরা চোখ খুলে রাখি। যে সড়কে অত যানবাহনের চলাচল, গ্যালারিভরা উৎসাহী দর্শক, সেখানে বন্যপ্রাণী আসবে কোন বোকামিতে? কেবল নির্ভয়ে পাখিরা ওড়ে মাথার উপর; ময়ূর বসে থাকে গাছের ডালে। এই বিপুল জঙ্গলের সর্বত্র অজস্র ফটো স্টুডিও আর শুটিং স্পট। আশ্চর্য মায়াবী নীল-সবুজের পালক, তাতে মুদ্রিত বিস্ময়কর নকশা নিয়ে ময়ূর বসে থাকে বিজ্ঞাপনের মডেল বা চলচ্চিত্রের নায়িকার মতো। ময়ূরের রূপ এত মায়াবী যে, নায়ক বলতে দ্বিধা হয়। মনে হয় নায়িকা।

১২

হলং ফরেস্ট অফিস, যার প্রাঙ্গণে আমরা এক পাল পোষা হাতি দেখেছি, তা পেরিয়ে সড়ক চলে গেছে ৯০ ডিগ্রি কোণে প্রকৃত জঙ্গলের ভেতর। আমাদের ইন্দ্রিয় আরো সতর্ক হয়ে উঠল পশু দেখার জন্য। আমরা বিভিন্ন প্রজাতির উঁচু গাছ দেখি; পশু দেখি না একটিও। এই জঙ্গলে অনেক ফরেস্ট অফিস। তার ভেতরে কতগুলো বিট অফিস আর কতগুলো রেঞ্জ অফিস, তার পরিসংখ্যান দিচ্ছিল আমাদের গাইড গোলাম মোরসালিন। এত মানুষের কোলাহলে পশু-পাখি থাকে কী করে? ভয়ংকর প্রাণী মানুষের ভয়ে সরে গেছে আরো গভীর জঙ্গলে, যেখানে এই জিপ গাড়ি যাবে না। ভাগ্য ভালো হলে যদি পশুদল সড়ক পেরিয়ে বনের এপাশ থেকে ওপাশে যায়, তখন কিছু দেখা যেতে পারে। ভাগ্য মন্দ হলে কিছুই দেখা হবে না। শুধু ময়ূর দেখেই ফিরতে হবে।

আমরা এসে পড়ি আরেকটি রেঞ্জ অফিসে, যার পাশ দিয়ে গাড়ি চলে যায় ৩০ ডিগ্রি কৌণিক পথে। খগেশ্বরদা অনেকক্ষণ ধরেই হর্নবিল বা ধনেশ পাখি খুঁজছিলেন। কতিপয় ময়ূর ছাড়া তেমন কিছু পাননি। রেঞ্জ অফিসের পাশে এক উঁচু ডালে একটি ঈগল দেখতে পেলেন। ঈগল টেরই পেল না, তার ২৫টি ছবি এক প্রকৃতিপ্রেমী কবির ডিএসএলআরে বন্দি হয়েছে। খগেশ্বরদা প্রথমদিকে ছিলেন বৃক্ষপ্রেমী। গাছ দেখতে দেখতে তার পাখিপ্রেম জন্মায়। এখন শুধু পাখির ছবি তোলেন, সাথে কিছু গাছ তো এসেই যায়। জলদাপাড়া জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশে এসে তার কবিসত্তা জেগে ওঠে। তিনি স্মৃতি থেকে নিজের লেখা তিনটি কবিতা আমাদের শোনালেন। তিনটি কবিতাই চমৎকার। শুনে বিমুগ্ধ।

মূল সড়ক ছেড়ে আমাদের জিপ যেদিকে যায় সেদিকে একটি খোলা প্রান্তর। দূরে একটি হাতি দেখে আমরা উত্তেজনা বোধ করি। ক্ষণেক বাদেই বুঝতে পারি, ওটি পোষা হাতি। আমাদের উত্তেজনার আগুনে অদৃশ্য জল ঢেলে দেয় ওই তথ্য। হোক না পোষা, কে বুঝবে– হাতিকে মাঝখানে রেখে মাহমুদ হাফিজ ও জুলি ভাবি এমনভাবে ছবি তোলেন যেন তারা জঙ্গল সাফারি নিয়ে তৈরি এক চলচ্চিত্রের নায়ক-নায়িকা। সম্মুখে কাঠের তৈরি এক ত্রিতল বাড়ি। চূড়ার ছোট্ট ঘরটি নিয়ে পুরো চারতলাই; চারপাশ খোলা সবুজ টিনের ছাউনি দেয়া চালের মাঝে মেঝেগুলো বলে দেয়, ওটি এক ওয়াচ টাওয়ার। পর্যটকরা গভীর রাতে বা অতিভোরে এ টাওয়ার থেকে বন্যপ্রাণীদেও দেখতে পেতেন। কিন্তু প্রাচীন হতে হতে সেটি পরিত্যক্ত। দেখে মনে হয়, যে কোনো সময় হাঁটু ভেঙে বসে পড়বে। সে প্রাঙ্গণে একটি হাতি দেখি, লোহার চেইন দিয়ে বাঁধা। পরবর্তী সময়ে আমরা জঙ্গলের মধ্যেও হাতি দেখেছি, তবে তাদের পিঠে মানুষ দেখে বুঝেছি, ওগুলো পোষ মানা। ফলে হাতি-সংক্রান্ত আমাদের সকল উৎসাহে কিছুটা ভাটা পড়ে।

সে স্থান থেকে ফেরার পথে কয়েকটি পত্রশূন্যপ্রায় গাছের ডালে অনেক ময়ূর দৃষ্টিগোচর হয়। আমাদের গাড়ি দুটি মৃতপ্রায় নদী ও দুটি ক্ষীণধারার ঝরনা পেরোয়, তাদের উপর নির্মিত কাঠের সেতু দিয়ে নয়। কারন সেগুলো ঐ ওয়াচ টাওয়ারের মতো পুরোনো হতে হতে পরিত্যক্ত। জিপ অগভীর জলের নদী ও ঝরনা পার হয়েছে গাড়ির চাকায় জলের স্পর্শ নিয়ে। প্রথমেই হলং নদী, যার উপর তৈরি কাঠের ব্রিজটি সুদৃশ্য প্রত্নরত্ন। ব্রিজের ওপাশে কিছু বানরকে দেখলাম নদী পার হচ্ছে। কতিপয় বসে আছে নদীর অপ্রশস্ত চরে। এর পরই চিরাকোয়াও হোগলাঝরা নামে দুটি খালের মতো জলধারা। চতুর্থ জলধারাটির নাম বুড়ি তোরসা শুনে অবাক হই। আরো অবাক হই যখন শুনি, পুরাকালে এটিই ছিল মূল তোরসা নদী। আজকের জলহীন মৃতপ্রায় নদী দেখে বোঝা যাবে না, এখানে এক সময় পাল তুলে নৌকা চলত। এখানেও একটি সুদৃশ্য কাঠের ব্রিজ রয়েছে, কিন্তু আমাদের জিপ পার হয় নদীর বুক চিরে।

আমরা এসে পড়ি আরেকটি ফরেস্ট অফিসের কাছাকাছি। বন যে মানুষের দখলে, তা বোঝাতে মানুষের চেষ্টার কমতি নেই। ফলে অনুমান করি, জলদাপাড়া জঙ্গলে হাতি ও গণ্ডারের মিলিত সংখ্যার চেয়েও মানুষের বাস বেশি। এই বিশাল জঙ্গলের ভেতর রয়েছে কয়েকটি আদিবাসী গ্রাম। তাদেরই একজনকে জঙ্গলের ভেতর হাতির পিঠে দেখা গেল। আদিবাসী মানুষ, গ্রাম ইত্যাদি শুনে নৃতত্ত্বে আগ্রহী মাহমুদ হাফিজ সেখানে যেতে উৎসাহী হলেন। আমাদের গাইড গোলাম মোরসালিন ‘পথিমধ্যে নামা যাবে না; জঙ্গলের ভেতরে হাঁটা বারণ; আদিবাসীদের গ্রামে যাওয়া নিষেধ ইত্যাদি জঙ্গল-বেদবাক্য শোনাল।

বন বিভাগের তৈরি এই মসৃণ পাথুরে মাটির তৈরি সাদা পথখানিকে মনে হলো ধনীগৃহের বৈঠকখানা; সাজানো পরিপাটি, কিন্তু অন্দরমহলে প্রবেশ নিষেধ। তবে

দ্বিতীয় ফরেস্ট অফিস থেকে উত্তরে বাঁকানো পথ ধরে ফের যখন পূর্বমুখী হলাম তখন বনকে আরো গভীর মনে হলো। তখনই বনের ভেতর গোচরীভূত হলো এক দল বুনো বাইসন। ‘কে দেখেছে, কে দেখেছে/ (খগেশ্বর) দাদা দেখেছে। দাদার হাতে কলম ছিল ছুড়ে মেরেছে।’ কলম হলো ডিএসএলআর ক্যামেরা, যা কলমের চেয়ে অনেক লম্বা এবং ছুড়ে মারা হলো বাইসন বা Indian Gour দলটির দিকে। এ পথে গাছেরা ঘন হয়ে এসেছে। অসংখ্য তুলা গাছ আর তুলা পড়ে আছে পথে সবুজ গুল্মে ছাওয়া প্রাঙ্গণের উপর। ফুটে আছে অজস্র ভাঁট ফুল।

এই পথের দু'ধারে আমরা এক ময়ূর প্রদর্শনী দেখলাম। আমাদের দেখে পেখম মেলে দিল এক ময়ূর। যেন বুঝতে পেরেছে, এরা টাকা খরচ করে এতদূর এসেছে মনে রাখার মতো কিছু দৃশ্য দেখতে। ওপাশে নিচু কাণ্ডের উপর বসে ছিল আরেকটি বড় পুচ্ছের ময়ূর, নড়ছিল না একবিন্দু। ভাবখানা এমন, ‘যত পারো তুলে নাও ছবি। আমার রূপ-লাবণ্য আমারই থেকে যাবে। পারবে না এক ফোঁটা নিয়ে যেতে।’ আমরা ভাবি–

চিত্রে রয়ে গেলে হে বনসুন্দর,
কবিতায় বুনে দিতে পারো
মায়াবী নীল-সবুজের ঐশ্বরিক প্রচ্ছদ;
সৌন্দর্যপ্রিয় বধূ সযতনে তুলিবে নকশা মনোময় আরো,
আকাঙ্ক্ষার বুননে সমৃদ্ধ হবে পরিচ্ছদ।

আমরা এসে পড়ি এক ওয়াচ টাওয়ারের সম্মুখে, যেখানে মুখোমুখি একটি দৃষ্টিনন্দন বনবাংলোর পাশ ঘেঁষে পথ ফের ৯০ ডিগ্রি বেঁকে চলে গেছে দূরতর বনের ভেতর। বেরসিক গাইড জানাল, আমাদের বনদর্শনের ওটাই শেষ বিন্দু!

মালাক্কা: সংস্কৃতির সম্মিলন

চপল বাশার

মালয়েশিয়া ভ্রমণে গেলে সে দেশের মালাক্কা রাজ্য অবশ্যই দেখতে হবে। এটি শুধু আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রই নয়; মালাক্কা ধারণ করে আছে সেখানকার বৈচিত্র্যময় ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বহুজাতিক সংস্কৃতি। মালয়েশিয়ার অন্যান্য রাজ্য থেকে মালাক্কা সব দিক থেকে ভিন্ন। এই ভিন্নতাই পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

মালাক্কা মালয়েশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। মালাক্কা প্রণালীর পাশেই এর অবস্থান। এই রাজ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। রাজধানী মালাক্কা সিটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন। ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণেই ইউনেস্কো ২০০৮ সালে মালাক্কা নগরীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে ঘোষণা করেছে। একে বিভিন্ন সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র বলা হয়। এখানে এক সময় মালয়ী মুসলিম সুলতানদের রাজত্ব ছিল। এর পর পর্তুগিজরা মালাক্কা দখল করে। তাদের কাছ থেকে মালাক্কা ছিনিয়ে নেয় ডাচ বাহিনী। ডাচদের হটিয়ে দিয়ে বৃটিশরা এখানে ঘাঁটি গাড়ে।

মালাক্কা ছিল তৎকালীন মালয় রাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য। ১৯৫৭ সালে মালয় বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর মালাক্কাতেও বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটে। মালাক্কা এখন মালয়েশিয়া ফেডারেশনের ১৩টি অঙ্গরাজ্যের একটি। প্রথমে মুসলিম সুলতানদের শাসন, পর্যায়ক্রমে পর্তুগিজ, ডাচ, বৃটিশ শাসন এবং প্রায় দেড়শ' বছর ধরে চীনাদের ব্যাপক হারে অভিবাসনের কারণে মালাক্কায় বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি। কারণ ভারত ও মালয় উপদ্বীপ থেকে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরাও এখানে এসে বসবাস করছে দীর্ঘদিন থেকে। এ জন্যই মালাক্কা বহু সংস্কৃতির মিলন কেন্দ্র।

মালয়েশিয়ার সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহু দিনের। মালয়েশিয়ার জাতীয় বার্তা সংস্থা বারনামা'র বাংলাদেশ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ পাই ১৯৮৫ সালে এবং তখন থেকে দুই দশকের বেশি সময় ধরে এ সংস্থার জন্য কাজ করেছি। মালয়েশিয়া ভ্রমণের প্রথম সুযোগ পাই ১৯৮৯ সালে। সে সময় পরিবেশ বিষয়ক একটি সেমিনারে যোগ দিতে কুয়ালালামপুর গিয়েছিলাম সপ্তাহখানেকের জন্য। এর পর আরও অনেকবার মালয়েশিয়া যাওয়া হয়েছে।

মালয়েশিয়ার একটি ইংরেজি দৈনিকেও কাজ করেছি বৎসরাধিক। মালয়েশিয়ার বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ও রাজ্য দেখেছি। পরিচিত হয়েছি মালয়েশিয়ার মানুষের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে। এই নিবন্ধে শুধু মালাক্কার কথাই লিখছি। কারণ মালাক্কার ইতিহাস, ঐতিহাসিক নিদর্শন এবং বহুবিধ সংস্কৃতি আমাকে আকর্ষণ করেছে। সে রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনাও করেছি। ১৯৮৯ সালে আমাদের সঙ্গে একজন গাইড ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন দেখিয়ে সে দেশের ইতিহাস বর্ণনা করেছিলেন।

সুলতানি শাসনের আগে মালাক্কা ছিল জেলেদের একটি গ্রাম, যেখানে মূলত স্থানীয় মালয়ীরাই বসবাস করত। সেখানে প্রথম সুলতানি শাসন কায়েম করেন ইস্কান্দার শাহ, পরমেশ্বর নামেও যার পরিচিতি ছিল। তিনি সিঙ্গাপুর থেকে এসে ১৪০০ সাল নাগাদ মালাক্কায় তার রাজত্ব স্থাপন করেন। ইস্কান্দার শাহ দেখলেন, মালাক্কায় একটি সমুদ্র বন্দর স্থাপনের সুবিধা রয়েছে। সেখানে সারা বছর সহজেই যাতায়াত করা যাবে। বিশেষ করে মালাক্কা প্রণালীর পাশে কৌশলগতভাবে সুবিধাজনক স্থানে হবে বন্দরটির অবস্থান।

স্থানটির নাম মালাক্কা হওয়ার পেছনে একটি জনপ্রিয় কাহিনি প্রচলিত। ইস্কান্দার শাহ তথা পরমেশ্বর শিকারে এসে একটি নদীর ধারে গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সে সময় তার একটি পোষা শিকারি কুকুর একটি হরিণকে আক্রমণ করে। কিন্তু হরিণটি কৌশলে কুকুরকে ঠেলে নদীতে ফেলে দেয়। হরিণটির সাহস দেখে পরমেশ্বর মুগ্ধ হন এবং এটিকে সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের জয় হিসেবে গণ্য করেন। তখনই তিনি

এই জায়গাতে রাজত্ব স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। যে গাছের তলে তিনি বসেছিলেন, তার নাম ছিল মেলাকা। রাজ্যটির নামও তিনি রাখলেন মেলাকা (গবষধশধ)। সেই নামটি এখনও মালয়ীরা ব্যবহার করে। তবে পরবর্তী সময়ে বৃটিশ শাসনকালে নামটি পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় মালাক্কা (গধষধপপধ)। এখন এটি মালাক্কা নামেই বেশি পরিচিত।

স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের সহায়তায় ইস্কান্দার শাহ মালাক্কায় একটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর স্থাপনে সমর্থ হন। মালাক্কা প্রণালী দিয়ে যেসব জাহাজ চলাচল করত, সেগুলোকে বন্দরে ভিড়তে বাধ্য ও তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা হতো। বন্দরের কাছেই গুদামের ব্যবস্থা করে বাণিজ্যিক লেনদেনের সুবিধা রাখা হয়। সে সময় মালাক্কায় উৎপাদিত মসলার চাহিদা ছিল বহির্বিশ্বে। এ কারণেই বন্দরটি জমজমাট হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বন্দরকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে মালাক্কার প্রধান জনপদ, যা আজ মালাক্কা সিটি।

মালাক্কা প্রণালী দিয়ে চীনের বাণিজ্যিক নৌবহর চলাচল করত। এ জন্য চীনা বণিক ও শাসকদের কাছেও মালাক্কা বন্দর ছিল গুরুত্বপূর্ণ। চীনের শাসক ছিলেন সে সময় সম্রাট মিং। মালাক্কার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে সম্রাটের এক কন্যা হাং লি পো চতুর্দশ শতকে মালাক্কা আসেন। সঙ্গে ছিল প্রায় পাঁচশ' দাস-দাসী। রাজকন্যা হাং লি পো সুলতান মনসুর শাহকে বিয়ে করেন। মনসুর শাহ ১৪৫৬ থেকে ১৪৭৭ পর্যন্ত মালাক্কার শাসক ছিলেন। হাং লি পোর দাস-দাসীরাও স্থানীয়দের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এদের প্রায় সবাই মালাক্কার 'বুকিত চায়না' নামে পরিচিত একটি অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। ধারণা করা হয়, সে সময় থেকেই মালাক্কায় চীনাদের বসবাস শুরু। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চীনারা তাদের মূল ভূখণ্ড থেকে মালাক্কা ও মালয় উপদ্বীপে আসতে থাকে। এদেরই বংশবিস্তারের ফলে আজ মালয়েশিয়ার জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ চীনা বংশোদ্ভূত, আর মালাক্কার জনসংখ্যার প্রায় ২৬ শতাংশ চীনা।

সুলতানি আমলেই মালাক্কা রাজ্য ও সমুদ্র বন্দর গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি পায়। সেই সাথে অন্যান্য বিদেশি শক্তির নজর পড়ে মালাক্কার ওপর। ১৫১১ সালে ভারতের গোয়া থেকে পর্তুগিজরা এসে মালাক্কা আক্রমণ করে। পর্তুগিজ বাহিনীর নেতা ছিলেন আকোনসো দ্য আলবুকার্ক। তিনি ১৮টি জাহাজে ১২০০ সৈন্য নিয়ে আসেন। ভারতের গোয়া রাজ্য ছিল পর্তুগিজ উপনিবেশ। সেটাই ছিল এ অঞ্চলের পর্তুগিজদের বড় ঘাঁটি। তারা পূর্ব এশিয়ায় তাদের বাণিজ্য ও উপনিবেশ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে মালাক্কা আক্রমণ ও দখল করে। পর্তুগিজদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল সুলতানি বংশের লোক ও মুসলিম সম্প্রদায়। হিন্দু, চীনা ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে তারা সংঘাতে জড়ায়নি। তারা মালাক্কা দখল করলেও মালাক্কা প্রণালীর ওপর আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি। কারণ আশপাশে অন্যান্য বন্দর গড়ে ওঠায় মালাক্কা সমুদ্র বন্দরের গুরুত্ব কমে যায়।

পর্তুগিজরা মালাক্কা শাসন করেছে ১৩০ বছর। এই সময়ে তারা বিখ্যাত 'আ ফামোজা' দুর্গসহ আরও কিছু সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৬৪১ সালে নেদারল্যান্ডের ডাচ বাহিনী মালাক্কা আক্রমণ করে পর্তুগিজদের পরাজিত করে। শুরু হয় ডাচ শাসন। সে শাসন চলে একটানা ১৮৫ বছর। এ সময় তারা বেশ কিছু গির্জা ও ভবন তৈরি করে, যেগুলো আজও রয়েছে। ১৮২৪ সালে বৃটিশ ও ডাচদের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী বৃটিশরা মালাক্কার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। বিনিময়ে ডাচরা পায় সুমাত্রা দ্বীপের বেনকুলেনে পূর্ণ আধিপত্য। এভাবেই মালাক্কা চলে যায় বৃটিশ দখলে এবং তা বজায় থাকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে অবশ্য কিছু সময়ের জন্য মালাক্কা জাপানের দখলে চলে গিয়েছিল। মালাক্কা এক সময় মালয় ইউনিয়নের অংশে পরিণত হয়। ১৯৫৭ সালে মালয় বৃটিশদেও কাছ থেকে স্বাধীনতা পায়। মালাক্কা সে দেশের স্বায়ত্তশাসিত অঙ্গরাজ্যের মর্যাদা পায়। ১৯৬৩ সালে বোর্নিওর সাবাহ ও সারাওয়াক রাজ্য মালয় ফেডারেশনে যোগ দেয় এবং দেশটির নতুন নাম হয় মালয়েশিয়া। আজকের মালয়েশিয়ায় আছে ১৩টি রাজ্য, যার একটি মালাক্কা।

মালাক্কার আয়তন ১৬৬৪ বর্গ কিলোমিটার। মালয়েশিয়ার প্রধান নগরী কুয়ালালামপুর থেকে ১৪৮ কিলোমিটার দক্ষিণে মালাক্কার অবস্থান। সিঙ্গাপুর থেকে মালাক্কার দূরত্ব ২৪৫ কিলোমিটার। মালয়েশিয়ার অন্যান্য রাজ্য সুলতান শাসিত। কিন্তু মালাক্কায় এখন কোনো সুলতান নেই। মালয়েশিয়ার রাজা নিয়োজিত একজন গভর্নও এ রাজ্যের শাসনকর্তা। জনগণের ভোটে একটি আইনসভা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। সরকার গঠন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল, যার প্রধান থাকেন মুখ্যমন্ত্রী।

মালাক্কার জনসংখ্যা ২০১০ সালের লোকগণনা অনুযায়ী ৮ লাখ ২১ হাজার। রাজধানী মালাক্কা সিটি ও রাজ্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পাঁচ লাখের বেশি লোক বাস করে। রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ মালয়ী, প্রায় ৬৩ শতাংশ। চীনা সম্প্রদায়ের লোক ২৫ শতাংশ। ভারতীয় বংশোদ্ভূতদেও সংখ্যা ৬ শতাংশ। এ ছাড়াও রয়েছে পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায়, যাদেরকে কৃস্টাং বলা হয়। ডাচ শাসনের অবসান ঘটেছে প্রায় ২শ' বছর আগে। কিন্তু ডাচ জাতির কিছু লোক এখনও মালাক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

মালাক্কার অর্থনীতি মূলত কৃষি ও শিল্পনির্ভর। কিন্তু রাজ্যের অর্থনীতিতে পর্যটন বড় ভূমিকা পালন করছে। পর্যটন শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে দেশি-বিদেশি পর্যটকের আগমন বাড়াতে রাজ্য সরকারের ব্যাপক উদ্যোগ রয়েছে এবং এ উদ্যোগ ফলপ্রসূ। ঐতিহাসিক স্থান ও নিদর্শন, বিভিন্ন সংস্কৃতির সম্মিলন, ভৌগোলিক অবস্থান মালাক্কাকে পর্যটকদেও কাছে আকর্ষণীয় করে রেখেছে। এখানকার সরকার পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য স্লোগান তুলেছে– 'মালাক্কা ভ্রমণ মানেই মালয়েশিয়া ভ্রমণ'। এ স্লোগানে ভুল নেই। কারণ মালয়েশিয়া যে একটি বহুজাতিক এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির রাষ্ট্র, তার পরিপূর্ণ চিত্র পাওয়া যায় মালাক্কায়। অন্যান্য রাজ্যে এত বৈচিত্র্য নেই।

মালাক্কার জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলোর মধ্যে প্রথমেই পর্তুগিজদের 'আ ফামোজা' দুর্গের কথা বলতে হয়। পর্তুগিজরা মালাক্কা দখলের পর ১৫১১ সালে দুর্গটি তৈরি করে। মালাক্কা প্রণালীর কাছেই বিশাল এলাকাজুড়ে দুর্গটি নির্মিত। এর অবস্থান এমন ছিল, যাতে সমুদ্রপথে আগত বিদেশি শত্রুদের আক্রমণ ঠেকানো যায়। এই দুর্গে অবস্থান করেই পর্তুগিজরা ১৩০ বছর রাজ্য শাসন করেছে। ১৬৪১ সালে ডাচ আক্রমণের সময় দুর্গটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর পর বৃটিশরা দুর্গটি পুরোপুরি ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং সীমানা প্রাচীরসহ বেশ কিছু কাঠামো নিশ্চিহ্ন করে। স্যার স্ট্যামফোর্ড রাফলসের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বৃটিশরা দুর্গ ভেঙে ফেলার কাজ বন্ধ করে। ততদিনে দুর্গের প্রধান ফটক ছাড়া আর সব ধ্বংস হয়ে গেছে। তখনকার বৃটিশ শাসকদের কাছে ঐতিহাসিক নিদর্শনের কোনো মূল্য ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল মালাক্কায় পর্তুগিজ শাসনের চিহ্ন যেন না থাকে। কিন্তু তা হয়নি। পর্তুগিজদের দুর্গ 'আ ফামোজা'র প্রধান ফটক এখনো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এটি সান্তিয়াগো গেট নামেও পরিচিত। দুর্গের কিছু স্থাপনার ধ্বংসাবশেষ এখন সংরক্ষিত। সেখানে পর্তুগিজ শাসকদের কয়েকটি কবরও আছে। পর্যটকরা ঘুরে দেখতে পারেন।

ডাচদের ১৮৫ বছরের শাসনকালে মালাক্কা নগরীতে কয়েকটি গির্জা তৈরি হয়। ডাচ স্থাপত্যের নিদর্শন নিয়ে গির্জাগুলো এখনও টিকে আছে। এর মধ্যে ১৭৫৩ সালে নির্মিত 'ক্রাইস্ট চার্চ মেলাকা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লাল রঙের এই গির্জার ভেতরে সারি সারি কাঠের বেঞ্চ অক্ষত আছে। গির্জার ভেতরে ঢুকলেই বোঝা যায়, এটি ভালোভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এখানে পর্যটকের ভিড় লেগেই থাকে। গির্জার পাশে অনেক দোকান। সেখানে পর্যটকরা স্যুভেনির কিনতে পারেন। ডাচরা ১৭১০ সালে তৈরি করেছিল মালয়েশিয়ার প্রথম ক্যাথলিক গির্জা, যার নাম সেইন্ট পিটার্স চার্চ, সেটিও মালাক্কা নগরীতে। এ ছাড়াও ফ্রান্সিস জেভিয়ার চার্চ, সেইন্ট পলস চার্চ নামে দুটি প্রাচীন গির্জা রয়েছে। ডাচ গভর্নরের জন্য একটি বাসভবন তৈরি হয়েছিল ১৬৫০ সালে। স্ট্যাডথাইস নামের ভবনটি ডাচ স্থাপত্যের একটি নিদর্শন। ভবনটি এখন জাদুঘর। এখানে প্রাচীন মালাক্কার শিল্প, সে সময়ের পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংরক্ষিত। সুলতানি শাসনামলের বিভিন্ন নিদর্শন নিয়ে আরও একটি জাদুঘর আছে মালাক্কায়।

মালাক্কায় বেশ কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ, হিন্দুদের মন্দির, চীনাদের মন্দির, বৌদ্ধ মন্দির রয়েছে। এ ছাড়াও শিখদের একটি মন্দির, যাকে বলা হয় গুরুদুয়ারা এই শহরের কেন্দ্রস্থলে আছে। মালাক্কা শহরের মাঝখানে একটি প্রধান সড়কের উপর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে মসজিদ, হিন্দু মন্দির ও চীনা মন্দির। তিনটিতেই মুসলিম, হিন্দু ও চীনারা উপাসনা করে নিয়মিত। কখনও কোনো বিশৃঙ্খলা বা সংঘাত হয়নি। শুধু মালাক্কা নয়; মালয়েশিয়ার সর্বত্র ধর্মীয় শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিদ্যমান। জনসংখ্যার দিক থেকে মালয়েশিয়ার মালয়ী মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু সে দেশে জাতিগত বা ধর্ম নিয়ে কোনো সমস্যা হয় না। মালয়েশিয়ার লোকেরা এ নিয়ে গর্বিত।

সেইন্ট জনস ফোর্ট নামে একটি দুর্গ মালাক্কায় রয়েছে, যেটিতে একই সাথে পর্তুগিজ ও ডাচ স্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায়। পর্তুগিজরা সেইন্ট জনস্-এর নামে একটি উপাসনালয় তৈরি করেছিল। অষ্টাদশ শতকে ডাচরা এই উপাসনালয়কে দুর্গে পরিণত করে। দুর্গটি মালাক্কা প্রণালীর কাছেই পাহাড়ের উপরে। কিন্তু দুর্গের কামানগুলোর মুখ বাইরে সাগরের দিকে নয়। এগুলো মালাক্কার ভেতরে মূল ভূখণ্ডের দিকে তাক করা। কারণ ডাচরা ভয় করত মালয়ীরা যে কোনো সময় দুর্গের ওপর হামলা চালাতে পারে এবং সেটা হবে মূল ভূখণ্ড থেকেই। অতএব তাদের সতর্ক দৃষ্টি সামনে সাগরের দিকে নয়, পেছনের দিকে। পাহাড়ের উপরে দুর্গটি থেকে সূর্যাস্তের চমৎকার দৃশ্য পর্যটকদের মুগ্ধ করে।

মালাক্কায় পর্তুগিজ শাসনের অবসান ঘটে প্রায় চারশ' বছর আগে। পর্তুগিজ শাসকরা মালাক্কা ছেড়ে গেলেও পর্তুগিজ বংশোদ্ভূত মানুষ মালাক্কা ছেড়ে যায়নি। মালাক্কা সিটির একটি অঞ্চলে তারা এখনও বসবাস করছে। সে জায়গার নাম পর্তুগিজ স্কোয়ার বা মিনি লিসবন। এই স্কোয়ার ঘিরেই তাদের গ্রাম। তাদের পূর্বপুরুষদের প্রধান পেশা ছিল সাগর থেকে মাছ ধরা। এখনও তারা মাছ ধওে; সাগরে যায় নৌকা নিয়ে। তবে পর্তুগিজ জেলের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তারা অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। মালয়েশিয়ার অন্যত্রও যাচ্ছে পেশাগত কারণে। পর্তুগিজ স্কোয়ার বা মিনি লিসবনকে পর্যটকদেও কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে সেখানে পর্তুগিজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে আছে পর্তুগিজ খাবারের রেস্তোরাঁ।

আমি একবার পর্তুগিজ স্কোয়ারে গিয়ে ওদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখেছি। পর্তুগিজদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরে ওরা নৃত্য করে। তাদের জনপ্রিয় গান-বাজনা দিয়ে সন্ধ্যাগুলো মাতিয়ে রাখে। আমি যখন গিয়েছিলাম তখন দেখেছি পর্তুগাল থেকে আগত এক দল পর্যটক ওদের সঙ্গে নাচগান করছে। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, পর্তুগাল থেকে যেসব পর্যটক মালয়েশিয়া আসে, তারা অবশ্যই মালাক্কায় পর্তুগিজ স্কোয়ারে যায়। তারা তাদের স্বজাতির লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়, আনন্দ করে, অতীতে ফিরে যায়। ইউরোপ ও অন্যান্য দেশের পর্যটকরাও এখানে আসে। পর্তুগিজদের মতো ডাচরা মালাক্কায় সংঘবদ্ধভাবে থাকে না। তারা আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। ডাচদের তৈরি বিভিন্ন কাঠামো, স্থাপত্য মালাক্কায় তাদের ১৮৫ বছরের শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়।

মালাক্কায় বৃটিশ শাসনের প্রভাব কিছুটা আছে, কিন্তু তা পর্তুগিজ বা ডাচ শাসনের মতো দৃশ্যমান নয়। মালাক্কা নগরীকে আধুনিক করে তুলতে বৃটিশরা অবদান রেখেছে। সর্বক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মালাক্কা উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে এগিয়ে। পর্যটন শিল্পের প্রসারে মালাক্কা অন্যদেও চেয়ে অনেকটাই অগ্রগামী। পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য তারা সম্ভাব্য সব কিছু করেছে। কম দামি, বেশি দামি সব ধরনের হোটেল রয়েছে সেখানে। পর্যটকদের বাসস্থান কোনো সমস্যা নয়। সব ধরনের খাবার দাবার নিয়ে

বসে আছে পর্যটকদের জন্য। মালয়ী, চায়নিজ, ভারতীয় খাবারের রেস্তোরাঁ রয়েছে অনেক। পর্তুগিজ স্কোয়ারেও খাওয়া যায়। রাস্তার ধারে খোলা জায়গায় অনেক খাবারের দোকান আছে এবং যথেষ্ট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। খোলা জায়গায় বসে খাওয়া-দাওয়া করতে ভালোই লাগে। চড়া রোদ বা বৃষ্টির সময় বড় ছাতার নিচে বসলেই হলো।

মালাক্কা সিটির মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে মেলাকা বা মালাক্কা নদী। নদীটি এখন আর বাণিজ্যিক কারণে গুরুত্বপূর্ণ নয়। এর গুরুত্ব এখন পর্যটনের জন্য। নদীর দুই তীরে অনেক প্রাচীন ভবন সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে। পাশাপাশি আছে আধুনিক ভবন ও স্থাপনা। নদীর তীরে অনেক গ্রামও রয়েছে। গ্রামকে ওরা বলে কামপুং। পর্যটকদের জন্য নদীতে নৌবিহারের সুব্যবস্থা আছে। যন্ত্রচালিত নৌকায় ৪৫ মিনিটের নৌবিহারের সময় পর্যটকরা নদীর দুই তীরে প্রাচীন ভবন, আধুনিক ভবন, গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও গ্রামীন সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। নৌকায় পেশাজীবী গাইড মালাক্কার ইতিহাস-ঐতিহ্য বর্ণনা করেন।

মালাক্কার অর্থনীতি শুধু পর্যটনের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থনীতিতে কৃষির অবদান রয়েছে প্রথম থেকেই। এখন তার সঙ্গে গড়ে উঠেছে শিল্প। ক্ষুদ্র ও মাঝারি অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে গত তিন দশকের মধ্যে। মালয়েশিয়ার অন্যান্য রাজ্যের মতো মালাক্কাতেও পাম ফলের চাষ হয়। এ থেকে হয় পাম তেল। এই পাম তেল রপ্তানি করে মালয়েশিয়া বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। পাম চাষের পাশাপাশি রাবার চাষও হয়।

মালাক্কার চিড়িয়াখানা উল্লে যোগ্য। এটি মালয়েশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম চিড়িয়াখানা, আয়তন ৫৪ একর। ২শ' প্রজাতির প্রায় ১২০০ পশু-পাখি এই চিড়িয়াখানায় আছে। এত রকম পশু-পাশি এখানে থাকায় এটি বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ ও গবেষকদের বিশেষ আকর্ষণ। বিভিন্ন জীবজন্তুর মধ্যে মালয়ী বাঘও রয়েছে। এ বাঘ অন্যান্য দেশের বাঘের চেয়ে স্বতন্ত্র। মালাক্কা সিটি থেকে ১৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত চিড়িয়াখানাটি দেখতে স্থানীয় ও বিদেশি পর্যটকের ভিড় জমে নিয়মিত। বেশ কিছু উঁচুমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে মালাক্কায়। মালয়েশিয়ার অন্যান্য রাজ্য থেকে এবং বিদেশ থেকেও ছাত্র-ছাত্রী এখানে আসে লেখাপড়া করতে। বিদেশি শিক্ষার্থীদেও বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়।

যারা মালাক্কায় কখনও যাননি অথবা যাবেন বলে ভাবছেন, তাদের সুবিধার জন্য জানিয়ে রাখি, মালাক্কার আবহাওয়া বেশ গরম। তাই বলে অসহনীয় নয়। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে মালয়েশিয়ার অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে মালাক্কার আবহাওয়া উষ্ণ। আমি প্রথম যেদিন মালাক্কা যাচ্ছিলাম কুয়ালালামপুর থেকে, তখন ফুলহাতা শার্ট ও একটি জ্যাকেট পরে তৈরি হয়েছিলাম। হোটেল থেকে নেমে যখন গাড়িতে উঠব, সে সময় গাড়ির মালয়ী ড্রাইভার হামিজান হেসে ইংরেজিতে বলল, 'এই পোশাকে তো মালাক্কা যাওয়া যাবে না। ওখানে বেশ গরম। আপনি পোশাক বদলে পাতলা টি-শার্ট পরে আসুন। আরামে থাকবেন।' হোটেলে রুমে গিয়ে শার্ট-জ্যাকেট খুলে একটা হালকা টি-শার্ট গায়ে দিলাম। মালাক্কা গিয়েও দেখলাম পর্যটক এবং স্থানীয়রাও টি-শার্ট অথবা হাফ শার্ট পরে ঘুরছে।

আমরা বিশেষ করে ঢাকাবাসী রিকশার সাথে খুবই পরিচিত। মালাক্কাতেও রিকশা আছে। রিকশাগুলি সুন্দরভাবে সাজানো কাগজ ও প্লাস্টিকের ফুল অথবা আসল ফুল দিয়ে। রিকশার আসন আরামদায়ক, চালক বসেন একধারে। এগুলো মূলত পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য, ভাড়াও নেয় বেশি। সুসজ্জিত রিকশায় বসে বা পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে গেলে রিকশা চালকদের পয়সা দিতে হয়।

পর্যটকদের স্বাগত জানাতে মালাক্কা সরকার তৈরি থাকে সারা বছর। পর্যটকদের সব রকম চাহিদা মেটানোর ব্যবস্থাই তারা রেখেছে। কুয়ালালামপুর থেকে মালাক্কা সড়কপথে যেতে লাগে দু'ঘণ্টা। চমৎকার হাইওয়ে, রাস্তা মসৃণ। ঝাঁকি লাগে না, শরীরও ক্লান্ত হয় না। রাস্তার দু'পাশে অসংখ্য পাম বাগান, রাবার বাগান আরও কত গাছপালা, সবুজ পাহাড়! চোখ জুড়ানো সবুজ আর সবুজ। সড়কপথে মালাক্কা সফরে গেলে এটা হবে বাড়তি পাওয়া।

ভাইকিংদের দেশে

জিকরুর রেজা খানম

আজকের বিশ্বে লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে অভাগা হচ্ছে ভ্রমণ কাহিনী লেখিয়েগণ। ইন্টারনেটের জালে সারা বিশ্ব আজ সত্যি সত্যিই হাতের মুঠোয়। আজকাল আর কম্পিউটার, ল্যাপটপ খুলবার দরকার হয় না। স্মার্টফোনের বদৌলতে মুঠোফোনেই এক লহমায় দেখে নেয়া যায় পৃথিবীর যে কোনো জায়গা। আর উইকিপিডিয়ার কল্যাণে হেন তথ্য নাই যা পাবেন না। তখন কার ঠ্যাকা পড়েছে আপনার আমার বিতিকিচ্ছিরি লেখা পড়বার। এমনিতেই 'দেশে বিদেশে' আর 'পথে প্রবাসে'র নমস্য লেখকগণ ভ্রমণ কাহিনীকে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছেন যে, পাঠকের প্রত্যাশার মাত্রাও এভারেস্টের চূড়ায় গিয়ে উঠেছে। এহেন অবস্থায় ভ্রমণ বিষয়ক লেখা লিখবার হিম্মত খুব কম লোকেরই আছে। ভাবছেন, সবই যখন জানো তবে আর কলম ধরা কেন বাপু? ধরেছি কি সাধে? নতুন কোথাও গেলেই আমার মন পেখম মেলে নাচতে থাকে। সেই খুশির খবর কাগজ-কলমে লেপে না দেওয়া অবধি মন শান্ত হয় না। সেই জন্যই না কলম ধরা। তবে প্রথমেই পাঠককে সাবধান করে দেয়া আমার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। পড়ে তারপর গালমন্দ করবেন, সেটি হচ্ছে না। তাই আগেই সাবধান বাণী– যা পড়বেন, নিজ দায়িত্বে।

২০১৪ সালের মার্চে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল সুইডেনের মালমো। সেই সাথে স্টকহোমে ঝটিকা সফর। সাথে ফাও কোপেনহেগেন। সে গপ্পো না বলা তক আমার পেটের ভাত হজম হবে, ভেবেছেন! তাই বিসমিল্লাহ বলে শুরু করছি! শীত সহ্য করতে পারি না বলে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশে ভ্রমণের তেমন আগ্রহ ছিল না। অনেক বছর আগে আগ্রহটা জন্মেছিল এসটিরিক সিরিজের একটা খণ্ড পড়ে। খুলেই বলি। লেট ফিফটিজে পা রেখে যদি বলি, এসটিরিক কার্টুন পড়ি, তাহলে আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে কেউ এ লেখা আর পড়বেন বলে মনে হয় না। ছেলেরা যখন ছোট ছিল, তখন তাদের বই পড়ায় আকৃষ্ট করার জন্য নানান ধরনের ছবিওয়ালা বই নিয়ে আসতাম এবং তাদের পড়ে শোনাতাম। তাদের প্রিয় কার্টুনের তালিকায় ছিল টিনটিন ও এসটিরিক। পড়ে তাদের বুঝিয়ে দিতে দিতে আর ছেলেরা বড় হতে হতে আমি রীতিমতো টিনটিন ও এসটিরিক বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলাম। ইয়ে, মানে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এ দুটি সিরিজ আমারও দারুণ পছন্দের। তা এসটিরিক অ্যান্ড দি ভাইকিং পড়ে আমার মনে ভাইকিংদের সম্পর্কে দারুণ কৌতূহলের সূত্রপাত হলেও তা মেটানোর সুযোগ এ যাবৎ ছিল না। এই সিরিজটি কৌতুক করলেও বিভিন্ন দেশ-কাল-পাত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো অক্ষুণ্ণ রাখে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে যোগ দেবার কিছুদিন পর পদাধিকারবলে বাংলাদেশের একমাত্র সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির স্থাপন সংক্রান্ত যে কমিটি হয়েছিল, সেই কমিটিতে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিলাম। বাদ বাকি সদস্য সব পণ্ডিত ব্যক্তি, ইউজিসি এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণ। আমার মতো অগামূর্খ একজনও নেই। একে এটি একটি বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই মাপের ও এই বিষয়ের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে কস্মিনকালেও ছিল না; কারো কোনো অভিজ্ঞতাও নাই। কাজেই সিদ্ধান্ত হলো, কমিটি বিদেশে এই বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছে যে ইউনিভার্সিটি, সেখানে গিয়ে সরেজমিন সবকিছু শিখে এসে একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করে দেশে এসে সেই বিদ্যা ফলিয়ে আমাদের মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিকেও সেই লেভেলে নিয়ে যাবে।

বিদেশে যত মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তার মধ্যে সুইডেনের মালমোতে অবস্থিত ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিকে পৃথিবীর সব দেশই উপরের সারিতে রাখে। আমাদের গন্তব্য হলো সেই মালমো। সেখানে যেতে হলে কোপেনহেগেন হয়ে যেতে হবে। স্টকহোমের চেয়ে মালমো কোপেনহেগেনের অনেক কাছে।

আমার খুশি দেখে কে! নোবেল প্রাইজ যে দেশ দেয় সেই দেশের সাথে সাথে লিটল মারমেইড আর হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এনডারসনের দেশও দেখা হবে একদম ফোকটে। এতে কে না খুশি হয়!

ইউজিসির (ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন) সদস্য আতফুল হাই শিবলি স্যার তখন সদ্য ফিনল্যান্ড থেকে ফিরেছেন। তিনি জানালেন, ওখানে এখন ততটা শীত নেই। শুনে আমরা মহাখুশি। কিন্তু তিনি যে এই পরিমাপটা করেছেন মাইনাস ডিগ্রির সাথে তাল রেখে, সেটা বুঝেছিলাম অনেক পরে। সে গল্প এখন থাক। সাবধানের মাইর নাই ভেবে আমি অবশ্য যথেষ্ট গরম কাপড় স্যুটকেস বোঝাই করে সাথে নিয়েছি। মোজা, মাফলার, উলেন টুপি, কোট, ওভারকোট সুদ্ধ।

এয়ারপোর্টে সবাই একত্র হলাম। এর আগে যত বিদেশ ভ্রমণ করেছি, সঙ্গীরা সমগোত্রীয় বা কাছাকাছি গোত্রের ছিল। এইবার যে সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার দলে না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে যোগ দিয়েছি, সেই হিসাব তখনও মাথায় ঢোকেনি। সেটা বুঝেছিলাম অনেক পরে। ততদিনে অঘটন যা ঘটবার ঘটে গিয়েছিল। সে গল্প এখন থাক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির উপাচার্য বা ভিসি হচ্ছেন নৌবাহিনীর রিয়ার অ্যাডমিরাল আবদুল বাতেন। তিনিই দলনেতা। ঐ ইউনিভার্সিটির রেজিস্ট্রারও আছেন দলে। তিনি নৌবাহিনীর কমোডর। দলের অন্য সদস্যরা হলেন ইউজিসি সদস্য হাশেম স্যার, যুগ্ম সচিব ফেরদৌস জামান। সব প্রতিষ্ঠান থেকেই দুইজন, শুধু মন্ত্রণালয় থেকে আমি একা। আমাদের পাঁচজনের সিট পাঁচ জায়গায় কেন পড়ল, সে প্রশ্নের জবাব একমাত্র খোদাতালাই দিতে পারবেন। কিন্তু আমার সিটখানি পড়ল প্লেনের লেজের প্রায় কাছাকাছি। জানালা নয়, আইলের পাশে। সহযাত্রী এক বিদেশিনী। আশ্বস্ত হলাম। দূরের যাত্রা বলে পাশে কে বসছেন, সেটা অবশ্যই অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। ইস্তানবুল গিয়ে প্লেন বদলাতে হবে। জানালা নেই যে বাইরের মেঘমালা দেখব। আর একটানা মেঘ দেখাও ঝকমারি ব্যাপার। কবি হলে না হয় সেটা পারা যেত। সামনে যে খেলনামতো টিভি স্ক্রিন, ওতেও আমার কোনো আগ্রহ নাই। বাসায়ই বলে টিভির ধারেকাছে যাই না, দেখা দূরে থাক। কাজেই প্লেনে সময় কাটানো আমার জন্য বড় ধরনের শাস্তিই বটে। হ্যারল্ড ল্যাম্বের লেখা ক্রুসেডের উপর একখানি বই ভ্যানিটি ব্যাগে নিয়েছিলাম। কারণ রাতের বেলা বই না পড়লে ঘুম আসবে না। আর ঘুম না হলেই আমি চিত্তির।

সে বই খুলে বসলাম। ফেরদৌস একবার এসে খোঁজ নিয়ে গেল। তারও কিছুক্ষণ পর দলনেতা। বুঝলাম, একে মহিলা, তায় মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি; আমার খোঁজ রাখা তাই তারা কর্তব্যের মধ্যেই ফেলেছেন। ইস্তানবুল এয়ারপোর্টে প্লেন বদল করা আরেক ঝকমারি। সেখানে যে লাইনে দাঁড়াতে হয়, সেগুলো দড়ি দিয়ে ভাগ করা এবং দাঁড়ানোর পর দড়িগুলো দেখা যায় না বলে মনে হয়, কোনো জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে আছি। একটু পরপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিই সবাই আছে, নাকি কেউ হারিয়ে গেছে। হারালে এই মানুষের সমুদ্রে খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে। অবশেষে ব্যারিয়ার পার

ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে প্রতিনিধিদল

হয়ে পরবর্তী প্লেনের জন্য নির্ধারিত জায়গায় এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মালপত্র রেখে সবাই পালা করে ওয়াশরুম ঘুরে এলো। এসব করে দুই ঘণ্টার যাত্রাবিরতি কোন দিক দিয়ে শেষ হলো, টেরই পেলাম না।

প্লেনে উঠে মনটা যারপরনাই খুশি হয়ে গেল। জানালার পাশে সিট এবং সহযাত্রী ফেরদৌস। আমার থেকে তার বয়স অনেক কম বলে দিব্যি তার উপর মাতব্বরি ফলানো চলে। ইউরোপে বার কয়েক গেছি বটে, কিন্তু স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশে এই প্রথম। কাজেই জানালার পাশে বসাটা জরুরি ছিল। এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও আমার মনে নানাবিধ কৌতূহল কিশোরী বয়সে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে দেখে সম্ভবত উপরওয়ালা দয়াপরবশ হয়ে এই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রথম থেকেই বেশ জুত করে বসলাম। আল্লাহর রহমতে কোপেনহেগেন পৌঁছব সন্ধ্যা নাগাদ। তখনও যথেষ্ট দিনের আলো পাওয়া যাবে। প্রথম চোটেই প্লেন উঠে গেল মেঘের উপরে। কারণ ইস্তানবুলে বৃষ্টি হচ্ছিল এবং ঠাণ্ডাও ছিল বেশ। উপরে উঠতেই কীসের মেঘ কীসের কী! দিব্যি ঝকঝক করছে দিনের আলো। পায়ের নিচে সাদা মেঘের চাদর বিছানো। উপরে নীল আকাশ, নিচে তাকালে মনে হচ্ছে সাদা উলের বিশাল এক গোল কার্পেট বিছিয়ে রেখেছে কেউ। মন ভীষণ টানতে থাকে সেই কার্পেটে পা রাখার জন্য। আবার কখনো মনে হচ্ছে পায়ের নিচে সাদা কাশবনের সমুদ্র। তবে সবই গোল। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে ৩৫ হাজার ফুট উপরে উঠলে প্লেনের বাইরে গোল ছাড়া কিছু চোখে পড়বে না।

একদম ছোটবেলায় বড় বোন যখন বই পড়ে বলেছিলেন, পৃথিবীটা কমলালেবুর মতো গোল, সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস হতে চায়নি। যত বড় কমলালেবুই হোক, এর মধ্যে এত কিছু এঁটে যাওয়া এক কথায় অসম্ভব বলেই মনে হতো। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাথে তখনও পরিচয় হয়নি বলে ভাবতাম, কিনারায় গেলে গড়িয়ে পড়ে যাবে না! তাই প্রাণপণে ভাবতে চেষ্টা করতাম, পৃথিবী চ্যাপ্টা আর কিনারাগুলোতে পাহাড়, যাতে কেউ পড়ে না যায়! আহ! তখন যদি আমাকে কেউ এমন দূরপাল্লার প্লেনে তুলে দিত, তবে মনে কোনো সংশয়ই থাকত না।

চারদিক একই রকম। প্লেন এগোচ্ছে, না এক জায়গায় স্থির– বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে মেঘ হালকা হয়ে যাচ্ছে, কখনও বা নাই হয়ে যাচ্ছে। ইস্তানবুল এয়ারলাইন্স সম্পর্কে ধারণা বদলাতে হলো। প্লেনের সিটে সিটে টিভি স্ক্রিন নেই। আবার দূরে দূরে যেগুলো থাকার কথা, সেগুলোও গুটিয়ে রেখেছে। কাজেই কোন দিক দিয়ে যাচ্ছি, জানি না। মনে মনে ইউরোপের ম্যাপখানি মাথায় রেখে জানালার নিচে উঁকি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছিলাম, কোথায় আছি। এর মধ্যে খাবার দেওয়া হলো। প্লেন ফের মেঘের রাজ্য পাড়ি দিচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ছোটবেলা থেকে মেঘ নিয়ে যে খেলাটা খেলে আসছি, সেটাই শুরু করলাম। এই দেখা যাচ্ছে প্রকাণ্ড মেরুভালুক, বিশাল হাই তুলছে। হাই তুলতে তুলতেই তার নাকটা লম্বা হওয়া শুরু হয়েছে। এবার সে হয়েছে হাতি। হাতির পাগুলো পরস্পর জুড়ে গিয়ে হয়ে গেল তুলোর ঢিবি। কোনো এক অদৃশ্য ধুনকার সে ঢিবির সব তুলো দ্রুত উড়িয়ে দিচ্ছে হাওয়ায়। এখন আকাশজুড়ে এক খেলার মাঠ। ফুটবল খেলা হচ্ছে। ছবিটা কোনো শিল্পীর আঁকার মতো। যে শিল্পী তুলির টানগুলো খুব তাড়াহুড়ো করে টেনেছেন বলে খেলোয়াড়দেও দেখাচ্ছে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট, কিছুটা অস্পষ্ট।

প্লেনে সাধারণত স্ক্রিনে যে ভ্রমণপথ ম্যাপে দেখায়, তা নেই। নিচে কোন দেশ জানি না। কিন্তু সাদা বরফে ঢাকা পর্বতমালা দেখে আন্দাজ করলাম আল্পস হবে। তবে যা-ই বলুন, পাহাড়-পর্বত মাটি থেকে দেখতেই বেশ লাগে। তাদের বিশালতা দিয়ে নিমিষে সমীহ আদায় করে নেয়। ৩৫ হাজার ফুট উপর থেকে নিচে তাকালে সেই বিশালতা ঠাওর হতে চায় না। পরিচিত জিনিস যখন তার চেহারা বদলে ফেলে তখন মগজ যে সহজে তা গ্রহণ করতে চায় না, সেটা জেনেছি ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেলের সায়েন্স অব স্টুপিড দেখে।

এক সময় দেখি প্লেনের নিচটা একদম বদলে গেছে। জলের ভাগই বেশি। শান্ত বিস্তৃত জলরাশি। এত উপর থেকে সে জলকে কাচের মতো স্থির মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে লম্বা রুপোলি সিলিন্ডারের মতো কী যেন ঝিলিক দিচ্ছে। ঠাওর করে দেখি, এগুলো সমুদ্রগামী জাহাজ। বিশাল জলরাশির মাঝখানে মনে হচ্ছে, একশলা সিগরেট ভেসে আছে। সেই জলের মাঝে মাঝে ছড়িয়ে আছে ডাঙা। কেউ যেন পাতলা রুমালি রুটি বানিয়ে জলের তাওয়ায় মেলে দিয়েছে। এই বিশাল জলে কেউ যদি একটু ঢেউ তোলে, তবে এই রুমালি রুটি এক নিমিষে তলিয়ে যাবে বলে ভয়

হয়। এই রকম দৃশ্য এর আগে দেখিনি। কেমন এক রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনা বুকে চেপে তাকিয়ে আছি নিচে। ইউরোপের ম্যাপটা মনে করে বুঝতে চেষ্টা করছি, এটি কোন জায়গা হতে পারে।

সুইডেন আর ডেনমার্ক পাশাপাশি। আগে সুইডেন, আর সুইডেনের পাশে জার্মানি। এটা তবে জার্মানির শেষ মাথা হবে। এর পরই সুইডেন শুরু। ইটালি ফ্রান্স পার হবার সময় পর্বতমালা চোখে পড়েছে; চূড়াগুলো বরফে ঢাকা। যতই উত্তর-পশ্চিমে যাচ্ছি, জমি ক্রমেই সমান হচ্ছে। হতে হতে পাতলা রুটির মতো দেখাচ্ছে। সৃষ্টির আদিতে সব কিছুই যে পানির মধ্যে ছিল, সেই চিত্রটা অজান্তেই মনে ভেসে আসে।

এর আগে এত একাগ্র মনে কখনো প্লেনের ৩৫ হাজার ফুট নিচের দৃশ্য দেখার চেষ্টা করিনি। এবারের দৃশ্যটাও একটু আলাদা যেন। একবার সৌদি আরবের রাব আল খালির উপর দিয়ে উড়ে আসবার সময় নিচে শুধু বালিয়াড়ির সমুদ্র দেখে দম আটকে এসেছিল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন ধু-ধু বালু আর বালুর পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে চলেছিলাম; এক ফোঁটা পানির চিহ্ন নেই কোথাও। নেই সবুজের নিশানা। এক বিরান প্রান্তর। কী যে এক শূন্যতা ভর করেছিল মনে! উপরওয়ালার অসীম ক্ষমতা দেখে মন একেবারে পানির মধ্যে লবণ যেমন গুলে যায় তেমনি দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর বড় বড় ধর্মের নবীদের আগমন কেন এই অঞ্চলেই হয়েছিল, এক নিমিষে তা হৃদয়ঙ্গম হয়। আমরা যে মাটির পৃথিবী দেখে অভ্যস্ত; মাটি ছেড়ে উপরে উঠলেই সে পৃথিবীর পারস্পেকটিভ একদম বদলে যায়। চেনা পৃথিবীই হয়ে ওঠে একদম অচেনা। বিশাল এই ধরার মাঝে কত যে ক্ষুদ্র– আমরা সেটা ঐ উপরে বসে যতটা বোঝা যায়, তা আর কিছুতে হয় না।

প্লেন এর মধ্যে অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। এবার যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি, তার সৌন্দর্য অভিভূত করে ফেলছে একেবারে। নিচে নীল সমুদ্র। রংটা দেখে বোঝা যায় এখানে গভীরতা কম। দুইপাশে ডাঙা। জলের মাঝে অসংখ্য বাতাস কল তিনটে করে ডানা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সমুদ্র বেশ কর্মচঞ্চল। অনেক বোট ট্রলার স্টিমার সমুদ্রের বুকে। একটু দূরে চমৎকার একটা ব্রিজ সমুদ্রের মাঝামাঝি জেগে আছে। তার একদিক ডাঙায় মিশলেও অন্যদিক সমুদ্রের বুকে হারিয়ে গেছে। ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শুনে বুঝলাম, আমরা কোপেনহেগেন ল্যান্ড করতে যাচ্ছি।

প্লেন থেকে যখন নামছি, তখন সফরসঙ্গীর মধ্যে কেউ একজন বলেছিলেন, প্লেন থেকে যে ব্রিজটি দেখেছেন, আমরা এখন সে ব্রিজ দিয়ে মালমো যাব। এই ব্রিজ সুইডেন আর ডেনমার্ককে যুক্ত করেছে। এর কানেক্টিং রোডের কিছু অংশ গেছে সমুদ্রের নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গপথে। তাই তো বলি! প্লেন থেকে দেখে ভেবে পাচ্ছিলাম না, সাগরের মাঝামাঝি গিয়ে যে ব্রিজ হতভম্ব হয়ে আর সামনে এগোতে সাহস পাচ্ছে না, সে ব্রিজ কোন কাজে লাগবে! টানেলের কথা শুনে সে রহস্য ভেদ হলো।

ভাবছিলাম, যমুনা আর পদ্মার উপর ব্রিজ করতে আমাদের অবস্থা কাহিল হয়ে যাচ্ছে; আর এরা কিনা সাগরকে জুড়ে দিয়েছে!

প্লেন যখন নামল তখন চারপাশে একেবারে অন্য চেহারা। আগে লা ফ্রিসিয়ানা নামে যে টিনের দুধ পাওয়া যেত, তার গায়ে এক গোয়ালিনীর ছবি আঁকা থাকত। চারপাশে চারণভূমি, সেখানে স্বাস্থ্যবতী গরু চরে বেড়াচ্ছে। যেখানে নেমেছি তার চেহারা অনেকটা সেই চারণভূমির মতো। শুধু এয়ারপোর্ট বলে গরুগুলো নাই।

ওয়ার্ল্ড মেরিটাইমের গাড়ি আমাদের জন্য এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছিল। তাতে করে চলেছি মালমো। যিনি চালাচ্ছেন তিনিই গাইড। আকাশ থেকে দেখা সেই ব্রিজের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় মনে হলো, পৃথিবীটা এত সুন্দও, আগে কখনও বুঝিনি। দু'পাশের নীল সমুদ্রকে মনে হচ্ছে একেবারে শান্ত। ফেরদৌস বলল, এদের সমুদ্র দেখেছেন কী শান্ত! বললাম, যতটা শান্ত ভাবছ ততটা শান্ত নয়। ব্রিজের উচ্চতা অনেক বেশি বলে এমন মনে হচ্ছে। ব্রিজের কাছাকাছি দেখ; সেখানে ঢেউ যে আছে; বোঝা যায়।

ব্রিজের একদম উপরের অংশ গাড়ি চলাচলের জন্য। এখান থেকেই চারপাশের মনোরম দৃশ্য চমৎকার দেখা যায়। মাঝের অংশে ট্রেন চলে। মনে হয়, আমাদের প্রস্তাবিত পদ্মা সেতুর উপর দিয়েও ট্রেন, বাস এই আদলে চলবে। ব্রিজটি ৮ কিলোমিটার লম্বা; সুড়ঙ্গ অংশসহ ১২ কিলোমিটার। ওরস্যান্ড প্রণালীর নামে এই ব্রিজের নাম ওরস্যান্ডব্রন। একে অরসান্ডস লিঙ্ক নামেও ডাকা হয়। এই ব্রিজ সুইডিশ অন্তরীপকে সেন্ট্রাল ও পশ্চিম ইউরোপের সাথে যুক্ত করেছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউরোপিয়ান রুট ই টোয়েন্টি এই ব্রিজ ধরেই অগ্রসর হয়েছে।

এই ব্রিজ নির্মাণের চিন্তাভাবনা ১৯৩৬ সালে। নির্মাণ শুরু ১৯৯৫-এ। ১৯৯৯ সালের ১৪ই আগস্ট ডেনমার্কের যুবরাজ ফ্রেডারিক এবং যুবরাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এর উদ্বোধনে অংশ নেন। জনসাধারণের জন্য ২০০০ সালের ১২ই জুন এটি খুলে দেওয়া হয়। এর নির্মাণ কাজ কিন্তু নির্ধারিত সময়ের তিন মাস আগেই শেষ হয়েছিল। সেঞ্জেন চুক্তি অনুযায়ী এই ব্রিজে ডেনিশ অংশে কোনো ইমিগ্রেশন চেকিং হয় না। তবে সুইডিশ অংশে মাঝে মাঝে কাস্টমস চেকিং হয়। কাউ নামে এক ডেনিশ কোম্পানি হচ্ছে এই ব্রিজের নির্মাতা। সুইডেন ও ডেনমার্কের আধাআধি মালিকানা এবং আধাআধি ব্যাংক লোন নিয়ে নির্মিত এই ব্রিজের নির্মাণ ব্যয় ডেনিশ মুদ্রায় ৩০ দশমিক ১ বিলিয়ন। ৩০ বছরের মধ্যে এই ব্যাংক লোন আরামসে পরিশোধ হবে ইউজারদের ফি দিয়েই।

ভাবছেন, এই ব্রিজ নির্মাণে দুই দেশের ঘোড়ার আন্ডা কী লাভ হলো! লাভ হলো দুই দেশেরই নিট ৭৮ বিলিয়ন (ডেনিশ মুদ্রায়)। প্রতি বছরের জন্য এই আয় ধরা হয়েছিল ৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন, সেটা এখন বেড়ে হয়েছে ৭ দশমিক ৭ বিলিয়ন। এই ব্রিজ সুইডেনের অর্থনীতিকে কতটা প্রভাবিত করেছে, সেটা একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। মালমো ছিল ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের ফলে এগিয়ে থাকা শহরগুলোর মধ্যে উপরের সারিতেই। জাহাজ নির্মাণের জন্য এক নামে একে চেনা যেত। জাহাজ

নির্মাণ কোম্পানি কোকামস ক্রেন (Kockums Crane) ছিল মালমোর ল্যান্ডমার্ক। এদের সিমেন্টসহ অন্যান্য শিল্পও ছিল। কিন্তু সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে ধস নামে মালমোর অর্থনীতিতে। এ অঞ্চলের লিডিং ইউনিভার্সিটিটির অবস্থান ছিল লনড এ এবং এর সাথে হাইটেক ও ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিও স্থাপিত হয় সেখানে, যা মালমো থেকে মাত্র ১৬ কিলোমিটার দূরে। ব্যস, মালমোর অবস্থা খারাপ হতে দেরি হলো না। নব্বইয়ের দশকে এই ধস তুঙ্গে উঠল। ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত ২৭ হাজার লোক চাকরি হারাল। বাজেট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াল ১ বিলিয়ন সুইডিশ ক্রোনার।

১৯৯৫-এ সুইডেনের মধ্যে মালমোর বেকারত্বের হার ছিল সর্বোচ্চ। কিন্তু এই অরসান্ডস ব্রিজের মাধ্যমে কোপেনহেগেনের সাথে অর্থনৈতিক সমন্বয় দ্রুতই মালমোকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। এ শহরের অন্তত ১০ শতাংশ লোক কোপেনহেগেনে কাজ করে। ১৯৯৮-এ এখানে ইউনিভার্সিটি স্থাপনের ফলে এটি হয়ে উঠেছে বিভিন্ন হাইটেক সম্পর্কিত শিল্পোদ্যোক্তাদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। গত সাত বছরে অন্তত তিরিশটি কোম্পানি তাদের হেড কোয়ার্টার এখানে স্থানান্তর করেছে এবং ২৩ হাজার কর্মসংস্থান হয়েছে। নতুন কোম্পানি স্থাপনের হারও এখানে বেশ হাই। প্রতিদিন প্রায় সাতটি নতুন ফার্ম খোলা হয় মালমোতে। এগুলোর মধ্যে ট্রান্সপোর্ট, কন্সট্রাকশন, এন্টারটেইনমেন্ট, ফিন্যান্সিয়াল বিজনেস সার্ভিস ইত্যাদিতে বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ছে।

২০০৭-এর হিসাব অনুযায়ী ২৫ মিলিয়ন লোক এই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত করেছে, যার ১৫ দশমিক ২ মিলিয়ন কার বাসে আর ৯ দশমিক ৬ মিলিয়ন ট্রেনে। ২০০৯-এ এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৫ দশমিক ৬ মিলিয়নে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও এর প্রভাব পড়েছে বৈ কি। এ ধরনের যে কোনো স্থাপনাই মানুষের মনে ইতিবাচক প্রভাব, অনুপ্রেরণা দুই-ই সৃষ্টি করে। ২০১১তে ডেনমার্ক ও সুইডেনের টিভিতে 'দি ব্রিজ' নামে যে ক্রাইম থ্রিলার প্রচারিত হতো, সেটি এই ব্রিজকে নিয়েই। ইউরোভিশন সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ২০১৩তে এই ব্রিজকে সিম্বল অব কানেকশান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ম্যানিক স্ট্রিট প্রিচারস নামে সঙ্গীত দলের ফিউচারোলজি নামের অ্যালবামে 'ওয়াক মি টু দি ব্রিজ' নামে গানটির অনুপ্রেরণাও এই সেতু। কাজেই এই সেতুর পানে যদি মুগ্ধ নয়নে তাকাই, তবে সেটা তার প্রাপ্যই বটে।

চারদিক দেখতে দেখতে মালমো এসে গেল। ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে কোথাও যেন একটা মিল রয়েছে চেহারা-চরিত্রে। সাংস্কৃতিক মিলও কম না। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর সাথেও এই সাযুজ্য রয়েছে। কাজেই মালমোর যে হোটেলে উঠেছি, সেটার চেহারা ইউরোপের আর দশটা হোটেলের মতোই। চেকইন, রুম বুঝে নেওয়া ইত্যাদি আবশ্যক কাজ শেষ করে পায়দলে দলের সাথে বের হলাম শহর জরিপ করে দেখতে। সেই সাথে ফেরার পথে কোনো হোটেলে নৈশভোজ সারা হবে। উপরে

নিচে যথেষ্ট গরম জামাকাপড়, টুপি, মোজা সব নিয়ে বের হয়েছি। ওভারকোটের পকেটে এক জোড়া হাতমোজাও নিয়েছি। তেমন বুঝলে ডবল পরে নেব।

সফরসঙ্গী সবাই একাধিকবার ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে গেছেন। ভুল বললাম। তারা পৃথিবীর কোন দেশে যাননি সেটা বরং আঙুল গুনে বলে দেয়া যাবে। প্রত্যেকেই স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল। কাজেই নিচে নেমে দেখি, সবাইকে মোটামুটি বান্ডিলের মতোই দেখাচ্ছে। নিজেকে কেমন দেখাচ্ছে, সেটা বুঝলাম বেরুবার সময় গ্লাসের দরজায়। শুধু মুখখানি বের হয়ে আছে এবং সেই মুখের জেন্ডার নির্ণয় করা যমেরও দুঃসাধ্য। মহিলা হলেও লম্বা-চওড়ায় আমি ছেলেদের মতোই প্রায় বলে আমাকে দলের আর চারজনের চেয়েও বেশি পুরুষালি দেখাচ্ছে। বাংলাদেশের সাধারণ নারীদের তুলনামূলক দুর্বল অবস্থানের কারণে নিজের এই পুরুষালি ভাবে নিজেই মনে মনে দারুণ খুশি হলাম। ভাগ্যিস, দল সে খবর রাখে না।

ঘরের ভেতর কি গাড়ির ভেতর হিটিং সিস্টেম থাকে বলে তাপমাত্রা একদম স্বাভাবিকের মতো। কাজেই বাইরে বের হওয়ামাত্র টের পাওয়া গেল ঠাণ্ডার তীব্রতা। আপাদমস্তক সব ঢাকা সত্ত্বেও সবারই হিহি শুরু হলো। সফরে যাওয়ার আগে বাটা থেকে মোটা সোয়েডের স্রেফ ছেলেদের বন্ধ জুতা কিনে নিয়েছিলাম। তার সাথে দিল্লি থেকে কেনা গরম উলেন মোজার উপর টার্কিশ এয়ারলাইন্স থেকে যে টুকটাক উপহার দিয়েছিল, সেখানে পাওয়া উলেন মোজা পরেছি। এই মোজাগুলো এতই গরম যে, দেশে পরা যায় না। মাথায় নেপালি উলের টুপি, যা কিনা হিমালয়ান ঠাণ্ডা সামলাতে পারে। গলাবন্ধ পুলওভার, তার উপর লং কোট, গলা-মাথা মাফলারে পেঁচানো, সালোয়ারের নিচে থারমোস ইনার, হাতেও গরম উলেন মোজা। তার পরও শীতে জবুথবু হয়ে যাচ্ছি। ঠাণ্ডা বাতাস কোন প্রক্রিয়ায় এত আবরণ ভেদ করে ভেতরে ঢুকছে, বুঝতে পারছি না। হাশেম স্যার পকেট থেকে হাত বের করে জ্যাকেটের হুডির দড়ি টেনে চারপাশ ভালো করে আটকে নিলেন। তখন দেখি, উনার হাত খালি। ভুলে গেছেন হাতমোজা পরতে। পকেট থেকে অতিরিক্ত জোড়া বের করে দিলাম। উনি না না করে চলেছেন। হাত উঁচু করে দেখালাম- নিজেরও আছে। উনি মোজা লাগাতে লাগাতে বিড় বিড় করলেন, শিবলি স্যার মনে হয় আমাদের মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। তা না হলে কেন বলবেন, এই দিকের ঠাণ্ডা এখন কম!

ফেরদৌস যোগ করল, ঠিক বলেছেন স্যার। দেশে ফিরে উনাকে ধরতে হবে। ভাগ্যিস, তাও আমরা কিছু গরম কাপড় এনেছি। নইলে তো মারাই যেতাম শীতে! এই নিয়ে কিছুক্ষণ হাসাহাসি হলো। আসলে শিবলি স্যার যখন এসেছিলেন তখন মাইনাস চলছিল। সে তুলনায় এখন স্বর্গে আছি, বলা যায়। এই সময়টা এদের বসন্তের শুরু। তাহলে বুঝে দেখেন, শীতে কী অবস্থা হয়। আর নেট কি তথ্য দিচ্ছে, শুনবেন? মালমোর আবহাওয়া নাকি ওসেনিক। একই ল্যাটিচুডে অন্যান্য জায়গার তুলনায় উপসাগরীয় সমুদ্রস্রোতের কারণে এর আবহাওয়া আশ্চর্য রকম নমনীয়। নেটের ভাষায় সারপ্রাইজিংলি মাইল্ড। নর্দার্ন ল্যাটিচুডের কারণে গ্রীষ্মে দিনের আলো থাকে ১৭ ঘণ্টা, শীতে সাত ঘণ্টা। গরমের সময় গড় তাপমাত্রা থাকে ২০ থেকে ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। আর শীতে মাইনাস ৩ থেকে ৪। মাইনাস ১০-এ নামে কদাচিৎ। নেটের তথ্যের সাথে বাস্তবের বড়ই ফারাক মনে হচ্ছে। আসলে আমাদের দেশের শীতের সাথে এসব দেশের শীতের ধরন-ধারণে যথেষ্ট তফাৎ। আমাদের শীতের আছে রোদের উত্তাপ। ঠাণ্ডা বাতাসের উৎপাত নাই বললেই চলে। মাঝে মাঝে যখন শৈত্যপ্রবাহ (cold wave) হয়, তখন কিছুটা ঠাণ্ডা বাতাস হয়। হিমালয় যে তার বিরাট দেহ দিয়ে তুন্দ্রা অঞ্চলের হিমশীতল হাওয়া আটকে দেয়, তাই আমরা সত্যিকার ঠাণ্ডার খবর জানি না বললেই হয়।

হাঁটতে হাঁটতে রেলস্টেশনে পৌঁছালাম। ভেতরে ঢুকে শীতের হাত থেকে বাঁচা গেল। সবাই ডলার ভাঙালাম। ইতস্তত ভেতরের নানান স্টলে ঘুরে বেড়ালাম। তারপর আবার বের হলাম রেস্টুরেন্টের খোঁজে। সন্ধ্যা নেমেছে মাত্র। ৮টার পর খাবারের দোকান, রেস্টুরেন্ট সব বন্ধ হয়ে যাবে। এদিকে সন্ধ্যাবেলা ডিনার করার অভ্যাস আমাদের কারুরই নেই। বিদেশে এই এক ঝকমারি ব্যাপার। কি এশিয়া কি ইউরোপ; ডিনার টাইম বড় বেশি আর্লি। তাতে খাপ খাওয়ানো মুশকিলই বটে।

মালমো অনেক বড় শহর। নেটে দেখেছি, এটি সুইডেনের স্ক্যানিয়া প্রভিন্সের সবচেয়ে জনবহুল শহর। সুইডেনের তৃতীয় বৃহত্তর সিটি। গ্লোবাল সিটির ২০১২'র ইনডেক্স অনুযায়ী এর অবস্থান পঞ্চম। কোপেনহেগেনিয়ান ইনডেক্স-২০১৩ অনুসারে বাইসাইকেল ফ্রেন্ডলি সিটি হিসেবে বিশ্বে মালমোর অবস্থান সপ্তম। এটি এখন সুইডেনের হলেও শতাব্দীব্যাপী মালমো ছিল ডেনমার্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম সিটি। এর আসল নাম ছিল Malmhang. অর্থ হলো গ্রাভেল পাইল। ১২৭৫ সালে এই নগরীর পত্তন হয়েছিল। ১৫ শতকে এটি হেরিং মাছ ধরা এবং বিকিকিনির বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। অধিবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ হাজারে। ১৭ শতকে স্ক্যানিয়া প্রভিন্সসহ মালমো সুইডিশদের হাতে আসে Roskilde ট্রিটি অনুযায়ী, যা দুই দেশের মধ্যে ১৬৫৮তে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

আমাদের হোটেলের কাছেই একটা বড় চত্বর। হাঁটতে হাঁটতে সেখানে পৌঁছেছি। দেখি, কিছু রেস্টুরেন্টের সামনে খোলা চত্বরে বড় বড় ছাতা মেলানো, তার নিচে নারী-পুরুষ বসে আছে। তাদের কারো গায়েই গরম কাপড় নেই। আমরা সবাই তাতে তাজ্জব হয়ে গেলাম। বান্ডিল হয়েও শীতে মরে যাচ্ছি, আর এরা কিনা গরম কাপড় ছাড়া দিব্যি বসে আড্ডা দিচ্ছে খোলা আকাশের নিচে! অনেক ভেবেও এর কূলকিনারা করতে না পেরে বললাম, সবার টেবিলে বোতল দেখতে পাচ্ছেন না? ড্রিংক করছে তো। তাই মনে হয় শীত টের পাচ্ছে না। আমার মতো সবাই ধন্দে ছিল বলে কেউ কোনো মন্তব্য করল না। পরে যখন আমরা নিজেরাই এসব রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে ভেতরে বসেছি, তখন রেস্টুরেন্টের ম্যানেজারই বাতিয়েছিল, বসন্তের

কোপেনহেগেনে লিটল মারমেইডের সামনে

এমন সুন্দর সন্ধ্যায় কেন ভেতরে বসবেন? বাইরে বসুন, ভালো লাগবে। গ্যাস চালু করে দেব। আপনারা যেমন চাইবেন তেমন করে।

কীসের গ্যাস! আমাদের বিমূঢ় জিজ্ঞাসা। তখন জানলাম, আঙ্গিনায় যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রতিটি টেবিলের কাছে লাইটপোস্টের মতো ছড়িয়ে আছে, সেগুলো আসলে গ্যাসের চুলা। তার উত্তাপে দিব্যি বসে থাকা যায়। আমি খোলা জায়গায় বসতে চাইছিলাম না বলেই বোধ করি আমার চারপাশের সব ক'টা চালু করে দিল এবং দুই মিনিটের মাথায় ওভারকোট খুললাম। পাঁচ মিনিটের মাথায় উত্তাপ কমিয়ে দেবার অনুরোধ করতে হলো। তখন খোলা জায়গায় দলে দলে লোকজনের গ্রীষ্মকালীন পোশাকে বসে থাকার মোজেজা মালুম হলো।

সে কয়েক দিন পরের কথা। এখন বলছি প্রথম দিনের কথা, যখন আমরা শহরের হালহকিকত বুঝে নিতেই বেশি আগ্রহী ছিলাম এবং ইতস্তত ঘুরছিলাম। আমি বলে নিজের শহরেই রাস্তাঘাটের দিক নিশানা ঠাওর করতে পারি না, তখন বিদেশে সে বৃথা চেষ্টায় যাই না। কাজেই দল যখন বলছে, এই রাস্তাটা দিয়ে একটু আগে এসেছি এবং ঐ রাস্তাটা ধরে সোজা গেলেই আমাদের হোটেল, তখনও আমার চোখে সবই অচেনা ঠেকছে। তার পর দেখি চত্বরের মাঝখানে চেনা মূর্তিগুলি সারিবদ্ধভাবে মার্চ করার ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে আগের মতোই। কেউ ক্লারিনেট বাজাচ্ছে, কেউ ড্রাম, কেউ বিউগল। হাসিখুশি এই মূর্তিগুলি আমার দৃষ্টি কেড়েছিল প্রথম থেকেই। খুব জানতে ইচ্ছে করছিল এগুলো স্থাপনের কারণ। এমনি এমনি নিশ্চয়ই বানানো হয়নি। কিন্তু জানতে পারিনি। যে গুরুগম্ভীর দলের সাথে সফর করছি, তাতে এসব অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে কৌতূহল দেখানোর সাহস পাই না। নেট ঘেঁটে জানবার চেষ্টা করি। তবে আমি হলাম ডিজিটাল যুগের অ্যানালগ (ছেলেদের দেওয়া টাইটেল)। এসব সার্চ কার্যক্রমে সব সময় যে সফল হই, তা নয়। বাসায় ছেলেরা এবং ভাগিনা-ভাতিজা সহায়তা করে। এখানে যে সহায়তা করার কেউ নেই। তাই আমার এসব কৌতূহলের বেশ কিছু মাঠেই মারা গিয়েছিল।

ইতোমধ্যে রাত হয়ে গিয়েছিল এবং আশপাশের হোটেল-রেস্টুরেন্ট বন্ধ। চত্বরের মাঝামাঝি একটা অ্যারাবিয়ান রেস্টুরেন্ট দেখে গেছি আগেই। স্ন্যাক্স জাতীয় খাবারের অনেক পোস্টারের ভেতর চাবাবি নামক টার্কিশ এক আইটেমের পোস্টার দেখে সবাই সেটা খাব বলে ঠিক করেছিলাম। প্রথম দিন কেউই এক্সপেরিমেন্টে যেতে চাইছিলেন না। দোকানপাট বন্ধ হতে দেখে আমাদের হুঁশ ফিরল। সবাই দৌড়ালাম সেই দোকানের দিকে। হায়! সেটিও ক্লোজড নোটিশ লটকে দিয়ে ভেতরের কিচেনে সাফ-সাফাই চলছে। হায় কপাল! না খেয়েই থাকতে হবে নাকি! রিয়ার অ্যাডমিরাল বাতেন সাহেব এগিয়ে গিয়ে ভেতরের লোকজনের সাথে কথা বলছেন। এই ফাঁকে আমি চত্বরে চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি। আর কিছু না পাই, একটা আইসক্রিম হলেও কাজ চলে যাবে। এমন সময় শুনি আরবিতে বাতচিত। তাকিয়ে দেখি ভাঙা ভাঙা আরবিতে রিয়ার অ্যাডমিরাল সাহেব কথা বলছেন আর দোকানের ভেতর থেকে আরবির তুফান ছুটছে। দরজা খুলে যখন হাতের ইশারা করেছে তখনই বুঝেছি, এতক্ষণের তুফানটি ছিল আমাদের সাদর আমন্ত্রণ।

নিজের ভাষার কী মহিমা, তা আমাদের বোঝাতে হয় না। সেই পরীক্ষায় আমরা ৫২তেই ডিসটিংশন নিয়ে পাস করে বসে আছি। পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষার জন্য আত্মদানের উদাহরণ বাংলা ছাড়া আর একটিও নেই। ভেতরে গিয়ে বসেছি; মেন্যুকার্ডসহ মালিক নিজেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোন আইটেম নিলে ভালো হবে। খাবারের অপেক্ষায় আছি, তখন জানলাম এর মালিক ফিলিস্তিনি। বেশ কয়েক বছর হলো এখানে আছেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিল দেবার পালা। ফেরদৌস সবার হয়ে বিনা প্রশ্নে বিল মিটিয়ে দিতে যাবে, বাংলায় বাতেন সাহেব বললেন টাকার অঙ্কটা ভালো করে চেক করতে। কারণ এই ফিলিস্তিনিরা নাকি চান্স পেলেই চিটিংবাজি করতে ছাড়ে না। ফেরদৌস চেক করতে করতেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে অবিশ্বাসের সুরে বলল, এত খাতির করেছে যখন আমাদের সাথে নিশ্চয়ই চিটিংবাজি করবে না। বলতে বলতেই দেখি তার মুখভঙ্গি পাল্টাতে শুরু করেছে। এবারের চেহারাটা অবিশ্বাস্য কিছু দেখলে মানুষ যেমন বিস্মিত হয়, তেমনি অবাক চেহারা। নিজের অজান্তেই বলে ফেলেছে, আরে এখানে তো দেখি বিরাট ভুল! এবার বাতেন সাহেব নিজেই গেলেন। অপর পক্ষ বলল, সরি। হিসেবে ভুল হয়ে গেছে। হোটেলে ফেরার পথে উনি জানালেন, এরা নাকি এসব ভুল ইচ্ছে করেই করে। বেশির ভাগ মানুষ খেয়াল করে না। এটাই তাদের প্রতারণার ধরন। ধরা পড়লে বলে, ভুল হয়ে গেছে। প্রথম দিনের এই ঘটনায় আমাদের মন এমনই বিগড়ে গিয়েছিল যে, এর পর আর

একদিনও ঐ রেস্টুরেন্টে ঢুকিনি। যদিও প্রতিদিনের আনাগোনা এই চত্বরকে কেন্দ্র করেই চলত।

হোটেলে ফিরে স্রেফ যার যার রুমে ফিরে ঘুম দেবার পালা। মোবাইল ফোনে অ্যালার্ম দিয়ে শুলাম, দেশের সময়ের সাথে এখানকার সময়ের বিশাল ফারাকটা যদি মগজ মনে রাখতে না পারে, ভেবে! সকালে ঘুম ভাঙতেই জানালার পর্দা সরালাম। ইউরোপে বেশির ভাগ সময় রোদের দেখা মেলে না। সেই প্রস্তুতি মনে মনে ছিল। কিন্তু মালমো আমার ধারণা পাল্টে দিল কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমাদের মতো না হলেও বেশ আলো ঝলমলই পেয়েছি তাকে দিনের আলোয়। শুধু এক দিন রাস্তায় টিপ টিপ বৃষ্টিতে পেয়েছিল। আর ইউরোপে বৃষ্টি নামলেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগতে থাকে।

রেডি হয়ে নিচে নেমে ডাইনিংয়ে গিয়ে দলের সবাইকে পেলাম। তাদের খাওয়া শেষপ্রায়। চা বা কফি নিয়ে বসেছেন। ফেরদৌস বলল, আপা, আপনার দেরি দেখে একবার ভাবছিলাম, লবি থেকে ফোন দেব কিনা। আমি অবাক হয়ে বললাম, কীসের দেরি? আমাদের অফিসিয়াল প্রোগ্রাম শুরু হতে এখনো এক ঘণ্টা বাকি। আর ব্রেকফাস্ট আওয়ার শেষ হতেও এক ঘণ্টা বাকি। যথেষ্ট সময় আছে হাতে। 'ওমা, আপনি কি একেবারে রেডি হয়ে নেমেছেন! আর রুমে যাবেন না?' বললাম, কোন কামে যাব? 'আমি তাহলে যাই রেডি হয়ে আসি। আপনি লাউঞ্জে আমাদের জন্য অপেক্ষা করেন।'

চা-কফি শেষ করে সবাই রুমে ফিরল। আমি লাউঞ্জে বোর্ডারদের জন্য রাখা ল্যাপটপ নিয়ে বসলাম। দেখি, চ্যাটে ছেলেদের ধরতে পারি কিনা। এর আগে কখনও বিদেশ থেকে ফেসবুক খুলিনি। লগইন করতে পাসওয়ার্ড দেওয়ামাত্র প্রশ্ন, তুমি কি জিকরুর রেজা? আরে মর জ্বালা! আমি না তো কে জিকরুর রেজা? ত্রিভুবনে এই নামে আর কোনো মহিলা আছে বলে আমার জানা নাই। এদিকে যতই বলি, আমিই জিকরুর রেজা; ততই প্রশ্ন, আর ইউ শিওর? এর পর যখন বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে আইডেনটিফাই করতে বলা হলো তখন বুঝলাম, এটা আমার ফেসবুকের সিকিউরিটির জন্যই। বাংলাদেশের জিকরুর রেজা যদি আচমকা সুইডেনে বসে লগইন শুরু করে তাহলে তো ফেসবুক কর্তৃপক্ষ ভাবতেই পারে, কেউ অনুপ্রবেশ করতে চাচ্ছে আমার একাউন্টে। মুশকিলের বিষয় হলো, আমার ফেসবুক বন্ধুদের তালিকায় দুই ছেলে, তাদের বন্ধুরা, কর্তার বন্ধুরা, আমার কলিগরা ছাড়াও আছে দেশে থাকা আত্মীয়সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব। কাজেই ছবি দেখে শনাক্ত করা রীতিমতো বিসিএস পরীক্ষার শামিল।

একেকটা ছবি দেখে আন্দাজ করার চেষ্টা করি– এ ধরনের ছবি কেন দেয়। কারণ ফেসবুকে সবাই আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবের ছবিও দেয়। সবাইকে তো আর চিনি না। আন্দাজ করে করে উত্তর দেবার পর নিজের একাউন্টে ঢুকতে পারলাম। কিন্তু ছেলেরা কেউ নেটে নাই। ছেলের বন্ধুকে পেয়ে তাকে চ্যাটে গিয়ে বললাম। সে ফোন করল বাসায় তবে ছেলেদের পেলাম। ছেলে বলে, স্কাইপে করলেই পারতে।

এই সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে যখন ছেলেদের সাথে কথা বলব, তখনই আমাদের গাড়ি এসে হাজির। রওয়ানা দিতে হবে। এর মধ্যে সবাই লাউঞ্জে এসে গিয়েছেন।

ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছুতে খুব বেশি সময় লাগল না। একজন বয়স্ক তরুণী এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে নির্ধারিত কক্ষে নিয়ে বসালেন। বয়স্ক তরুণী বলছি এ কারণে যে, ভদ্রমহিলার যথেষ্ট বয়স হয়েছে, সেটা তার হালকা-পাতলা শরীর দেখে বুঝবার জো নেই। আমাদের মেরিটাইমের ভিসি বাতেন সাহেব ঢাকা থেকে নিয়ে যাওয়া এমওইউ (মেমোরেন্ডাম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং)-এর কপি নিয়ে ব্যস্ত হলেন শেষ মুহূর্তের ঝালাইয়ে। চাকরিজীবনের বিভিন্ন সময়ে বাধ্যতামূলক যে ট্রেনিংগুলো করা লাগে, তাতে এসব নেগোসিয়েশন বিষয়ে হাতেকলমে শেখানো হয়। শুধু তাই না; তার মক ট্রায়ালও দেওয়া লাগে। এতদিনে সেটা হাতেকলমে কাজে লাগানোর সুযোগ এলো। তা এখানে আমার বিশেষ কিছু করণীয় নেই। যা করার করবেন দলনেতা আর ইউজিসির হাশেম স্যার। কাজেই আমি অনেকখানি হাত-পা ঝাড়া।

ভাববেন না, ট্রেনিং দিলেই আমাদের চারটে হাত-পা গজায় এবং এক লাফে নেগোসিয়েশন নামের মোয়াখানি ছেলের (কাউন্টার পার্ট) হাত থেকে মামার বাড়ির আবদার করার মতো নিয়ে আসি। আজকাল নেগোসিয়েশনের ধরন-ধারণ যথেষ্ট বদলে গেছে। অপর পক্ষে যারা থাকেন তারা একে তো আমাদের থেকে ঝানু; বিশ্ব-রাজনীতি ও অর্থনীতিতে প্রভাবশালী এবং মালদার দেশ। কাজেই নেগোসিয়েশনে উইন উইন সিচুয়েশন করতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। অন্যদের কথা জানি না; আমি ভাই নেগোসিয়েশন নামের বোম্বেটে মরিচকে সাংঘাতিক ডরাই। পারতপক্ষে ঐ ক্যাচালে যেতে চাই না। জীবনের প্রথম নেগোসিয়েশন পড়েছিল একাজে যেসব দেশের নামডাক আছে সেসব দেশের অন্যতম দেশ ভারতের সাথে। সেখানে অবশ্য ঝড়ে বক মরে ফকিরের কেরামতি বাড়ে স্টাইলে প্রতিপক্ষকে কুপোকাত কওে ফেলেছিলাম ভাগ্যজোরে। সব সময় ভাগ্যদেবী যে আমার পক্ষেই থাকবেন– সে নিশ্চয়তা কোথায়!

কাহিনীটা বলতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে, বেশ মজার কিনা! কিন্তু সাহস হচ্ছে না, পাছে পাঠক ধরে নেন, এই চান্সে নিজের ঢোল পিটিয়ে নিচ্ছি। নীরস অফিসিয়াল বিষয় যতটা সম্ভব বাদ দিয়েই বলার চেষ্টা করছি। আজ আলাপ-আলোচনা, কাল এমওইউ স্বাক্ষর হবে। আলোচনা শেষে নিয়ে যাওয়া হলো দারুণ এক রেস্টুরেন্টে। দেয়াল ও ছাদের একাংশ কাচের। চমৎকার নরম আলোয় উদ্ভাসিত সব। দারুণ এক লাঞ্চ হলো সেই রোদ পোহাতে পোহাতে। লাঞ্চের পর পরস্পর বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে ফের বের হবো সবাই ঘুরতে। বিছানায় লম্বা হয়েছি কি হইনি, অমনি ইনটারকম বেজে উঠল। ফেরদৌস জানাল, দু'জন বাঙালি ছাত্র-ছাত্রী আমাদের জন্য লাউঞ্জে অপেক্ষা করছে।

কীসের বিশ্রাম! দুদ্দাড় করে নিচে নামলাম। বিদেশ-বিভূঁইয়ে নিজ দেশের মানুষের দেখা পেলে যেমন ভালো লাগে, তেমনি কোথায় কী আছে- এ সম্পর্কে ভালো ধারণা পাওয়া যায়। ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম এখানে যদি কোনো বাঙালি থাকে তাদেরকে আমাদের ঠিকানা দিতে। তারা সে দায়িত্ব বেশ ভালোমতোই পালন করেছে, সেটা বুঝলাম এদের আগমনে। লবিতে নেমে দেখি, দলের সবাই সেখানে। মেয়েটি নারায়ণগঞ্জের, নাম ফারজানা। ছেলেটি মেরিন একাডেমির অফিসার। নাম রফিক। ওরাও আমাদের পেয়ে মহাখুশি। সবাই মিলে ঘুরতে বের হলাম।

-ম্যাম, আপনি নিজামকে চেনেন? ইনফরমেশন ক্যাডারের? রফিক বলল।

-হ্যাঁ, চিনব বা কেন? অনেক দিন আগে আমরা একই ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছি।

-উনি আমার আপন বড় ভাই।

শুনে খুশি হলাম। নিজাম আমার স্নেহভাজনদের একজন। ইতস্তত শহরে ঘুরে বেড়ানো হলো। তারপর এক মার্কেটে গেলাম। এতক্ষণ এত ওজন বয়ে বয়ে আমার হাঁটু দু'খানি অনেকক্ষণ ধরে করুণ মিনতি জানাচ্ছিল বিশ্রামের। সেই মিনতিতে কর্ণপাত না করায় বেশ কিচ্ছুক্ষণ যাবৎ শোধ নেয়া শুরু করেছে। ভুলেও দলকে হাঁটুর খবর দিই না, পাছে আমাকে বাদ দিয়েই তারা প্রোগ্রাম করে বসে! এই চান্সে একটা বেঞ্চে বসে হাঁটুর ব্যথা সহনীয় করার চেষ্টা করছি। বের হবার রাস্তা এই একটাই। কাজেই হারিয়ে যাওয়ার ভয় নেই। দলের কেনাকাটা শেষে আমরা চললাম সেই চত্বরে। বাতেন সাহেব খুঁজে খুঁজে দেখি ঠিক এক বাঙালি রেস্টুরেন্ট বের করেছেন। সাজসজ্জা সব ভারতীয়। পরিচিতিও ইন্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট নামে। কেন এই বিজাতীয় পরিচয়– জিজ্ঞাসার জবাবে জানা গেল, এখানকার লোকজন বাংলাদেশকে তেমন চেনে না। তাই ব্যবসার খাতিরে এই পরিচয়। আর ইন্ডিয়ান খাবার বেশ পপুলার। এমনিতেই আর দশটা বাঙালির মতো আমার মনোভাব- ইস্ট অর ওয়েস্ট, মাই কান্ট্রি ইজ দা বেস্ট। আর বিদেশে গেলেই সেই দেশপ্রেম যেহেতু আরো চাগিয়ে ওঠে তাই ব্যাপারটা আমার ভালো লাগল না। খাবারের অপেক্ষায় বসে আছি তখন কথাটা প্রকাশ করেই ফেললাম। এখন পরিচিতি নেই, তাতে কী? নিজ দেশের নামে দোকান দিলে একদিন না একদিন পরিচিতি আসবেই।

আজকের ডিনারে ফারজানা আর রফিক আমাদের গেস্ট। তাই সবার কমন মেন্যু। নান চিকেন কারি আর আইসক্রিম। ওরা দু'জনে অবশ্য হোস্ট হতে চেয়েছিল, সবার ধমকিতে বেশি জোরাজুরি করার সাহস পায়নি। কিন্তু পরদিন নিজেদের ডরমিটরিতে রান্না করে খাওয়াবে বলে দাওয়াত দিয়ে বসল। আলু ভর্তা আর ডাল-ভাতের শর্তে আমরা রাজি হলাম। ভাতের জন্য বেশি হেদিয়ে যাই আমিই। কাজেই এ প্রস্তাবে আমিই খুশি হলাম বেশি। খেয়েদেয়ে হেঁটে হেঁটে হোটেলে ফেরা এবং ঘুম।

অফিসের কাজের মাঝখানে দু'দিনের উইকএন্ড পড়েছে। দলনেতা বললেন, হোটেলে ফিরে লবিতে একটু বসতে হবে। উইকএন্ড কে কীভাবে কাটাতে চান, সেটা ঠিক করা দরকার। এ কথা শুনেই আমি চনমনে হয়ে গেলাম। ঘুরে বেড়ানোতে আমার মতো উৎসাহী কমই আছে। ঢোলের বাড়ি ছাড়াই আমি এ ক্ষেত্রে নাচুনি বুড়ি। হোটেলে ফিরে লবিতে আলোচনায় বসা হলো। অরসান্ডসের সমুদ্রটা আমার এতই মনে ধরেছিল যে, প্রস্তাব করলাম, এখান থেকে ফেরিতে ফিনল্যান্ডে যাই; যেহেতু ভিসা লাগবে না। ফের ঐ ফেরিতেই ফেরা হবে। ঐ ফেরিওয়ালারাই (ফেরি চালায় যে কোম্পানি) কনডাক্টেড ট্যুরে ফিনল্যান্ড ঘুরিয়ে দেখাবে। আর ফেরিতে যে লাঞ্চ, ডিনার দেয়, সেটা নাকি এক কথায় ফ্যান্টাস্টিক। এই সমস্ত খবর দেশে থাকতেই জোগাড় করে নিয়ে গেছি। ফোকটে ফিনল্যান্ডও ঘোরা হবে। কিন্তু পড়েছি মোগলের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে। দলের সবাই আমার চেয়ে পদে বড় মুরুব্বিজন। হাশেম স্যার 'হ্যাঁ হ্যাঁ সব হবে সব হবে; আগে খোঁজখবর নিই; সুবিধা-অসুবিধা দেখি তারপর' বলে বাচ্চাদের যেমন করে মানুষ ভুলায় তেমনি সান্ত্বনা দেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে রিয়ার অ্যাডমিরাল বাতেন সাহেব যা বলেন তাতেই সম্মতি দেন। কাজেই আমার মতো অর্বাচীনের সব দাবি মাঠে মারা যায়।

পদমর্যাদা ইত্যাদি বিচার-বিবেচনা ছাড়াই যত্রতত্র যথেচ্ছা দাবিনামা পেশ করার কারণে ইতোমধ্যে বাতেন সাহেব প্রচণ্ড দ্বিধায় পড়েছেন– আমি বোকা, না মহা চালাক তার ক্যাটাগরি নির্ণয়ে। সেটা অবশ্য তখনও জানি না। প্রকাশ করেছিলেন ইস্তানবুলে, যখন আমি বেলি ড্যান্স দেখবার বাসনা প্রকাশ করেছিলাম। আচমকা মাথায় বাড়ি দিলে মানুষের যেমন হতভম্ব চেহারা হয়, তাদের সবার চেহারা হয়েছিল সেই রকম। সেটা দেখে সেই আবদার শুধু তখনি যে গিলে ফেলেছি, তাই নয়; জন্মের মতো বেলি ড্যান্স দেখার ইচ্ছা বিসর্জন দিয়েছি। শাকুর মজিদের 'সুলতানের শহর' বই পড়ে মনে এই খায়েশ জেগেছিল। উনি তো এ সম্পর্কে খারাপ কথা লেখেননি। কাজেই কী করে বুঝব, এটি পৃথিবীর অশ্লীল নাচগুলোর একটি এবং তা কেবল পুরুষ জাতির মনোরঞ্জনের জন্যই।

ফিনল্যান্ডে যেতে বেশির ভাগ সময় সমুদ্রেই কাটবে বলে সফরসঙ্গীরা এতে কেউই রাজি নন। সময়ই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা। তা ছাড়া ফিনল্যান্ডের মতো দেশ এভাবে বুড়ি ছোঁয়ার মতো ছুঁতে চান না কেউই। ফেরদৌস বয়সে সবার ছোট বলে কেবল আমার পক্ষে ভোট দিল। মাত্র দুটো ভোটে কি আর গণতন্ত্রে জেতা যায়! আমাদের প্রস্তাব নাকচ হয়ে যেতে মুখ কালো করে না হোক, চুপচাপ আছি দেখে বাতেন সাহেব বললেন, ম্যাডাম, এত হতাশ হচ্ছেন কেন? আমরা তো সুইডেনই দেখলাম না। স্টকহোমে যাবেন না? অন্তত যেখান থেকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়, সেটা দেখে আসতে পারবেন।

ঠিক হলো, আমরা উইকএন্ড কাটাব স্টকহোমে, আর অফিসিয়াল প্রোগ্রামের ফাঁকফোকর গলে হবে কোপেনহেগেন অভিযান। এইবার খুশি হলাম। মোটে মা রাঁধে না, তায় তপ্ত আর ঠাণ্ডা! বাছাইয়ের সুযোগ কোথায় আমার? নাই মামার চেয়ে কানা মামা জুটেছে, তাই বা কম কীসে? খুশি মনে রুমে চললাম ঘুমাতে। ঢাউস এক

বই এনেছি; দুই পাতা না পড়তেই ঘুমের মাসি-পিসি সব এসে চোখ পেতে বসে যায়। বাকি রাত কোনদিক দিয়ে কাটে, বলতে পারব না। পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে দেখা হলো দলের সাথে। বিদেশে হোটেলের ব্রেকফাস্ট সব সময় আমার দারুণ পছন্দের। যে দেশে থাকছেন সেই দেশের খাবারের ধরন কিছুটা বোঝা যায়। ইচ্ছেমতো এক্সপেরিমেন্টও করা যায়। কিছুদিন আগে সার্ক সম্মেলনে দিল্লি গিয়ে এক দিন সকালে হোটেল অশোকায় অনেক আইটেমের সাথে চাল-ডালের স্রেফ ঢিলা খিচুড়ি পেয়ে দারুণ খুশি হয়েছিলাম।

খেয়েদেয়ে অন্যরা গেল রুমে রেডি হতে, আমি লবিতে ল্যাপটপে বাসার সাথে যোগাযোগ করতে বসলাম। সময়ের ব্যাপারটা মাথায়ই ছিল না। কাজেই কাউকে না পেয়ে এক ভাগিনাকে বললাম বাসায় ফোন করে বলতে। এসব করে যখন কর্তা আর ছেলেদের স্কাইপেতে এনেছি তখন আমার ঘুমকাতুরে স্বামী বললেন, এখন কত রাত জানো? তখনই বিষয়টা মাথায় ঢুকল। একটু পরেই গাড়ি এসে গেল। আজ আমাদের সেশন শেষে মেরিটাইম ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি থেকে লাঞ্চ খাওয়াবে। প্রতিদিন অবশ্য সেই বাঙালি হোটেলে ভাত, মাছ, বিরিয়ানি ইত্যাদি ঠেসে খাওয়া হচ্ছে। আজকে বোঝা যাবে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশের লোকদের খাদ্যাভ্যাস কেমন।

কাজ-কাম শেষে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো খাওয়ার জন্য কাছের এক হোটেলে। যেতে যেতে দর্শনীয় জায়গা এবং স্থাপনাগুলো চিনিয়ে দিচ্ছিলেন উপাচার্য নিজেই। একটা বিল্ডিংকে খুব চেনা লাগছিল। কিন্তু কেন, সেটা বুঝলাম যখন উনি বললেন, এটাই হলো টারনিং টরসো; স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সবচেয়ে উঁচু টাওয়ার। মুভি এবং নেটে দেখেছি। কোকামস ক্রেনকে ২০০২ সালে ভেঙে ফেলে ২০০৫-এ দক্ষিণ কোরিয়াতে নিয়ে যাওয়ার পর এই বিল্ডিংটিই এখন মালমোর আইকন। এটাকে দেখলে মনে হয়, রুবিক কিউবকে যেমন করে মোচড় দিয়ে এর ধাঁধা মেলাতে চাই, ঠিক তেমনি কেউ যেন এর কোমরে ধরে মুচড়ে দিয়েছে। ডিজাইনের অভিনবত্বেও জন্যও এর খ্যাতি আছে। চারপাশে আরও অনেক নির্মাণাধীন স্থাপনা চোখে পড়ল। অরসান্ডস ব্রিজ যে সত্যিই মালমোর অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার করেছে, বোঝা গেল।

সেই একই রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাওয়া হলো। আমাদের জন্য টেবিল রিজার্ভ ছিল। উপাচার্যের সাথে আরও কয়েকজন যোগ দিলেন। বেশ দামি দামি আইটেম খাওয়ানো হলো। স্পেশাল কতগুলো মাছের আইটেম খেতে দিল। এগুলো নাকি বিখ্যাত তার টেস্টের জন্য। আমরা খুব প্রশংসা করলাম। খেতে ভালো লাগলেও আমাদের মিঠাপানির মাছের স্বাদের কাছে কিছুই না। আইটেমের কথায় মজার এক ঘটনা মনে পড়ল। আমার শ্বশুর বেঁচে থাকতে প্রায়ই গ্রামে যেতাম এবং নানা ধরনের রান্না কওে খাওয়াতাম। এতে বাড়ির কাজের লোকজনই খুশি হতো বেশি এবং অপেক্ষায় থাকত আমার রান্নার জন্য। একবার কী কী যেন রান্না করেছি মনে নেই। খেতে দিয়েছি যখন তখন একটি আইটেম দিতে ভুলে গেছি। সবার খাওয়া যখন প্রায় শেষ, তখন মনে পড়তে দৌড়ে রান্নাঘরে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বললাম,

হাত ধুয়ো না কেউ; একটা আইটেম দিতে ভুলে গেছি। আমার সেই চেঁচানি শুনে কাজের লোকজন যে আইটেম খাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তা তো আর জানি না। যখন খাওয়াচ্ছি তারা খাওয়া কিছুতেই শেষ করছে না, হাতও ধুচ্ছে না। তখনও বুঝিনি। শেষে একজন জিজ্ঞেস করে বসল, ভাবি, আমরারে আইটেম দিতাইন না? আমিও অবাক– বললাম, সব আইটেমই তো দিয়েছি। তখন তারাও হতভম্ব হয়ে বলল, আমরা তো সালুন খাইছি, আইটেম খাইছি না!

জানি না, মালমোতে আমার দশাও সেই আইটেমের মতোই হলো কিনা! কারণ এত দামি দামি আইটেম আমার কাছে তেমন লোভনীয় ঠেকেনি। লাঞ্চ শেষে পরস্পর বিদায় নিয়ে আমরা হোটেলে না গিয়ে চললাম ইউনিভার্সিটির পাশেই মেরিটাইম বিষয়ক জাদুঘর দেখতে। হাঁটতে আমার বেজায় কষ্ট হলেও কখনও তা বুঝতে দিই না। এই কারণে দলের সবাই বাংলাদেশে ফিওে যখন বলেছিলেন, বাপ রে! আপনি তো কম যান না। ছেলেদের সাথে সমান তালে হাঁটতে পারেন; তখন মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখা ছাড়া উপায় কী?

অফিসিয়াল কাজে দিনগুলো হাওয়ায় উড়ে গেল। মাঝখানে উইকএন্ড। শুক্রবার রাত ১০টার ট্রেনে চেপে দলের সাথে রওয়ানা দিয়েছি স্টকহোম। ভোরবেলা পৌঁছুবে। এর আগে ২০১২'র মে মাসে চায়নায় বুলেট ট্রেনে চেপে বেইজিং থেকে নানকিং গিয়েছি। কাজেই সুইডেনের ট্রেন দেখে অবাক হবার মতো বাঙাল আর নই। একে রাতের ট্রেন, বাইরের সিন-সিনারি দেখবার উপায় নেই; তার উপর আমার মতো ঘুমকাতুরে কমই আছে পৃথিবীতে। ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা খানেকের ভেতর আমার মাথা ঢলে পড়তে শুরু করল। যতই টান টান করে রাখি, কিছুক্ষণ পর ঝাঁকুনিতে আচমকা জেগে আবিষ্কার করি, দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝখানে আইল, দুই পাশে দুটি করে সিট। হাত-পা এলিয়ে আরাম করে বসার মতো তৈরি। আমার পাশে বসেছে ফেরদৌস। আমাদেও পরের সারির সিট দুটি খালি। এমন মাঝে মাঝে অনেক সিটই খালি পড়ে আছে। সুইডেন তো আর আমাদের মতো জনসংখ্যার ভারে অবনত দেশ নয়! ঘুমে কাতর আমি সামনের সেই খালি সিটে পা গুটিয়ে শুয়ে আরামে ঘুম দিলাম।

এক ঘুমে রাত কাবার। ঘুম যখন ভাঙল তখন কামরার ওয়াশরুমের সামনে লম্বা লাইন এবং একজনের হাতে টুথব্রাশও দেখতে পেলাম। ওরে বাপরে! লাইন ধরে টয়লেটে যাওয়া মোটেও পোষাবে না। কাজেই আমি আর সে চেষ্টায় গেলাম না। স্টেশনে নেমে যথেষ্ট ওয়াশরুম পাওয়া যাবে। দলের কেউ কেউ লাইনে দাঁড়ালেন। অনেকক্ষণ সময় গেল, কিন্তু টয়লেটে যিনি আছেন তিনি কিছুতেই বের হন না। ইউরোপীয় এটিকেটে এ ক্ষেত্রে দরজায় ধাক্কাধাক্কি করা ঘোরতর বারণ বলে সেটা কেউ না করলেও লাইনে দাঁড়ানোদের ভেতর উসখুস শুরু হয়েছে ইতোমধ্যে। কেউ কেউ না ধাক্কালেও হাতল ধরে মুচড়ামুচড়ি শুরু করলেন। তখন আবিষ্কার হলো, বাথরুমের ভেতর কেউ নেই। কোনো অজ্ঞাত কারণে দরজা লক হয়ে আছে। যারা এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তারা হন্তদন্ত হয়ে পরের কামরায়

ছুটলেন। এমন সময় রিয়ার অ্যাডমিরাল দিব্যি ফিটফাট হয়ে পাশের রুম থেকে ফিরে আমাকে শুধাচ্ছেন, টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা। ব্যতিক্রমী কিছু হলে আমার বিটকেল মগজখানি বড়ই মজা পায় এবং নিজের অজান্তেই মনে হয় ঠোঁটের কোনায় হাসি ঝুলছিল। তা দেখে উনি অবাক হয়ে শুধালেন, হাসছেন কেন? কী হয়েছে? ঘটনা শুনে তিনিও হাসা শুরু করলেন। এসব ডামাডোলের ভেতরেই ট্রেন স্টেশনে ঢুকল।

তখনও সকাল হয়নি। ভোরের আভা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে আবছা আবছা। ওয়েটিং রুমের নির্ধারিত জায়গায় বসে অপেক্ষা করছি। বাতেন সাহেবের ভায়রা স্টকহোমে থাকেন; আমরা তারই অতিথি। উনিই এসে আমাদের নিয়ে যাবেন। এই ব্যবস্থায় আমাদের প্রবল আপত্তি এবং দ্বিধা ছিল। অচেনা একজনের ঘাড়ে এত মানুষ বলা নেই কওয়া নেই অতিথি হয়ে চেপে বসতে আমাদের কারুরই মত ছিল না। কিন্তু বাতেন সাহেব কিছুই কানে তোলেননি। তার ভায়রা নাকি নিজেই সবাইকে নিয়ে যেতে বলেছেন। ভাবছি, এসব ভদ্রতা করে বলে সবাই। তাই বলে সত্যি সত্যিই কি মন থেকে চাইবেন উটকো এতগুলো লোক আচমকা আকাশ থেকে তার ঘাড়ে নাজিল হউক! খানিক পর শ্যামলা রঙের মাঝারি গড়নের একজন চারদিকে চোখ বুলিয়ে যখন সোজা আমাদের পানে হাঁটা ধরলেন, তখন মনের দ্বিধাটা অনেকখানিই ডানা মেলে হাত-পা ছড়িয়ে বসেছে।

দুই ভায়রার আলিঙ্গন, কুশল বিনিময়ের পর শুরু হলো পরিচয় পর্ব। মনের কথা কাউকে বলিনি বটে, কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করছিলাম ভদ্রলোককে। অত্যন্ত সাদামাটা সরল মনের মানুষ বলেই মনে হলো। উনি এমন স্বাভাবিকভাবে আমাদের নিয়ে চললেন যেন আমরাও তার আত্মীয় এবং বহুবার এসেছি তার বাড়ি। নেই আদিখ্যেতা, নেই বাড়াবাড়ি। আন্তরিকতারও কমতি নেই। যখন জানলাম, তার বাড়ি কিশোরগঞ্জ, তখন মনে আর দ্বিধা রইল না। এদিককার মানুষকে আমি খুব ভালো চিনি। ভান-ভনিতাহীন সহজ-সরল ধরনের হয়। মনের রাগ-অনুরাগ, সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি সব স্পষ্টই বোঝা যায়। স্টেশনের বাইরে এসে দেখি, টয়োটা স্টারলেট টাইপের ছোট্ট গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসে আছে অল্প বয়সী একটি ছেলে। প্রচণ্ড শীত করছিল। এর মধ্যে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। আমার সামনেই ছিলেন হাশেম স্যার। দেখি, তার কালো জ্যাকেট সাদা দেখাচ্ছে এবং সাদার ভাগ ক্রমেই বাড়ছে। নিজের দিকে তাকাতে রহস্য ভেদ হলো। বৃষ্টি নয়, তুষার পড়ছে। পরিচয় পর্ব শেষে সালাম জানিয়ে ছেলেটি বড় বড় পা ফেলে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। বাতেন সাহেব বললেন, মন্টি, ছেলেকে কোথায় পাঠালে? বৃষ্টির মধ্যে বাসায় যাবে কেমন করে? অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে উনি বললেন, বাসে করে বাসায় চলে যাবে। বেশি দূরে না; আর এইসবে ও অভ্যস্ত আছে। না হলে গাড়িতে জায়গা হবে না। তখন বুঝলাম, উনি আসলেই ভালো লোক। তা না হলে অচেনা অতিথিদের জন্য ছুটির দিনে এত সকালে স্টেশনে আসতেন না, আর ছেলেকে তুষারপাতের ভেতর হেঁটে বাসস্ট্যান্ডে যেতে দিতেন না।

দলে আমিই একমাত্র মহিলা বলে সামনের সিটে বসলাম; পেছনে তারা তিনজন ঠেসেঠুসে বসলেন। মন্টি বসলেন ড্রাইভিং সিটে। অল্পক্ষণের ভেতর বাসায় পৌঁছে গেলাম। মনে মনে খুব শঙ্কিত ছিলাম, মন্টি না হয় সাদরে বরণ করলেন, কিন্তু মিসেস মন্টি? জানি, বিদেশে চাকর-বাকরের কারবার নেই। সব ঝক্কি তো তার উপর দিয়েই যাবে। চার চারজন অতিথি বিদেশে ৪০ জনের সমান। ছোট ছিমছাম দোতলা ডুপ্লেক্স বাসা। নিচে ড্রয়িং-ডাইনিং, উপরে বেডরুম।

শ্যামলা রঙা হালকা-পাতলা গড়নের পারুল নামের মিষ্টি একটা মেয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। সেটা কৃত্রিম কিনা, ধরতে পারলাম না। মনে মনে বললাম, রসো। ছেলেদের চোখ ফাঁকি দিলেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। কাজু বাদাম আর কোল্ড ড্রিঙ্ক দিয়ে উনি কিচেনে গেলেন আমাদের জন্য নাশতা বানাতে। তার আন্তরিকতায় কোনো ঘাটতি খুঁজে পেলাম না। আমি গেলাম তার পিছু পিছু। কিচেন-কাম ডাইনিং। ঝকঝক করছে সব। ভেবেছিলাম, কিছু সাহায্য করব; কিছু ধরতেই দিলেন না। টেবিলভর্তি খাবার। এখন গরম গরম লুচি ভাজা হচ্ছে। বিদেশে গিয়ে যারা বিদেশি খাবার খোঁজেন, আমি তাদের দলে নেই। অচেনা খাবার চোখ-নাক-গলা– কোনোটাই নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করতে চায় না। পেট যেহেতু ক্ষুধার্ত থাকে, তাই হজম করে ফেলে। কিন্তু মনের ভেতরের খাই-খাই ভাব কিছুতেই যায় না। খালি মনে হয়, কিচ্ছু খাইনি। তাই মন্টির বাসার রকমারি দেশি খাবারে আমি খুব খুশি হলাম। খেতে খেতে নানান গল্প হচ্ছিল।

মন্টির গল্প করার কায়দাটা অদ্ভুত। প্রথমে মনে হবে, দেশের বদনাম করছেন আর সুইডেনের সুনাম করছেন। একটু পরেই টের পাবেন, সে সমালোচনা আসলে ঘুরিয়ে ইতিবাচক দিকটিই তুলে ধরছেন। কিশোরগঞ্জের আঞ্চলিক টান রয়েছে তার কথায়। একে আমার ছোট তিন ভাইয়ের মধ্যে মেঝোটার ডাকনাম মন্টি, তাই না চাইতেই তার দিকে অলরেডি আমার স্নেহ জন্মে গেছে, যদিও প্রকাশ করিনি। তার উপর আমার বাড়ি নেত্রকোনা। গ্রেটার ময়মনসিংহ এলাকার মানুষ হিসেবে নিমিষেই বুঝে ফেললাম তার মনটা। বলছিলেন ঠিক এ রকম– ক্যারে যাইতাম দেশে ফিরে। কত আরামে আছি জানেন? এইনো কেউ কারো ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। বিকেলে হাঁটতে যাই পার্কে, আরও অনেকে যায়। বেশির ভাগ বুড়াবুড়ি। সবার সাথে একটা করে কুত্তা। তাদের দিনরাতের সঙ্গী হলো এই কুত্তা। আমার সাথে মাঝে মাঝে আপনার ভাবি থাকে, তখন আমাদের খেয়াল করে, ভাবটা এমন এইগুলা কইত্থেকে আইলো। বউ-পুলাপান সুদ্ধা। কিন্তু ভুলেও কেউ কিছু জিগায় না। দূর থেকে দ্যাখে; সরাসরি নয়। আমরার দেশে হইলে কী হইত? থামায়া কত কথাই না জিগাইতো! শান্তিতে হাঁটতে দিত কেউ? মাঝে মাঝে যখন দেশে যাই, এয়ারপোর্টে নাইম্যাই ঘোষণা করি– কেউ কিন্তু দাওয়াত দিবা না। আমি আমার পছন্দমতো থাকব, খাব। কীসের কী! কেউ কথা শুনে? কমসে কম পাঁচ কেজি ওজন বাড়াইয়া ফিরি।

মন্টির কথা শুনে মনে পড়ল আমার এক কলিগের কথা। অনেক দিন সুইডেনে পোস্টিং ছিল তার। এক দিন কথায় কথায় বলেছিলেন, ঐ সব দেশে থাকা আমাদের পোষায় না। ভেবো না, এত উন্নত দেশ, সবাই খুব সুখে আছে। বেশির ভাগ মানুষ নিঃসঙ্গ। বিশেষ করে বয়স্করা। আমার সাথে আমার বৃদ্ধ বাবা থাকতেন। বিকেলে হাঁটতে যেতেন বাসার সামনে পার্কে, আমার বাচ্চা দুটোর হাত ধরে। উনি বলতেন, পার্কে অনেক সুইডিশ বুড়ো-বুড়ি হাঁটতে আসেন কুকুর নিয়ে। তারা নাকি অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত তাদের দিকে। সেই দৃষ্টিতে নাকি মিশে থাকত ঈর্ষা। ওরা হাঁটে কুকুর নিয়ে, আর আমার বাবা হাঁটেন নাতিদের নিয়ে; খেলা করেন, গল্প করেন। ঈর্ষাতো হবেই- তাদের সঙ্গী জীবজন্তু আর আমার বাবার সঙ্গী হিউম্যান বিইং। হিংসা হবে না?

আরো মনে পড়ে গেল। এখানে আসার আগে স্টকহোমের হালহকিকত জানার জন্য নেটে ঢুঁ মেরেছিলাম। উইকপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী এখানকার মোট পপুলেশনের মাত্র ২৭ শতাংশ ম্যারেড। ৪০ দশমিক ৪ শতাংশ আনম্যারেড; ১১ দশমিক ১ শতাংশের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। কষ্টই হচ্ছিল। পরিবার না থাকলে কীসের জীবন! কেউ একজন যদি না থাকল জীবনে, যার জন্য আমার সব দিয়ে দিতে ইচ্ছে হবে; সবকিছু স্যাক্রিফাইস করা যাবে; তাহলেই না মানবজীবন সার্থক। সেই যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন– 'চন্দন-পালঙ্কে শুয়ে একা একা কী হবে/ জীবনে তোমায় যদি পেলাম না।' ভালোবাসার পাত্র বয়েসের সাথে সাথে বদলায়। স্বামী বা স্ত্রী থেকে তা গড়ায় ছেলেমেয়েতে, তারপর নাতিপুতিতে। তাতেই জীবনের সার্থকতা। কাজেই মন্টির গল্প শুনে মনে হচ্ছিল, আহারে বেচারা সুইডিশ পাবলিক! প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যে মূল্যবোধের তফাৎটা কিন্তু এর পেছনে কাজ করে কিছুটা হলেও।

মধ্যযুগের শেষে ইউরোপীয় রেনেসাঁ এনেছিল ধর্মের জায়গায় ব্যক্তির জয়জয়কার। ঊনবিংশ শতকের শিল্প বিপ্লব ইউরোপকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিল, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উত্থানে পেছনে ঠেলে দিল অনেক কিছুই। আমাদের প্রাচ্যে যেসব মূল্যবোধ দীর্ঘদিন ধরে লালিত হচ্ছিল তা হলো- ভোগ নয়, ত্যাগেই সুখ। আর পাশ্চাত্য শিখিয়েছে যত পারো ভোগ করে নাও। আপনি বাঁচলে তবে বাপের নাম। যার ফলাফল এই বিবাহ বিচ্ছেদ আর বিবাহে অনিচ্ছুক সমাজ। আমরাও নিজেদেও ঐতিহ্য আর মূল্যবোধগুলোকে লালন না করে নিয়ে আসছি পশ্চিমা ধাঁচের উন্নতি। গোদের উপর বিষফোড়ার মতো সাথে সাথে আসছে মাদকাসক্তি আর বিবাহ বিচ্ছেদ। ছোট ছোট পরিবার গড়ছি আর বাচ্চাদের স্বার্থপরতা শেখাচ্ছি। সেই দিন বেশি দূরে নয়, যখন আমাদের সমাজের সাথে পাশ্চাত্য সমাজের তফাৎ থাকবে না। বিশ্ব আজ সত্যিই গ্লোবাল ভিলেজ। আকাশ সংস্কৃতির কল্যাণে কোথাও কিছু ঘটলে সাথে সাথে ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। খেয়াল করে দেখবেন, আজকের যুগের সব দেশের সমাজের সুবিধাভোগী অগ্রসর শ্রেণির ছেলে-মেয়ের পোশাক-আশাকে তেমন তফাৎ নেই। চায়নিজ, জাপানি, আমেরিকান, ইন্ডিয়ান, বাংলাদেশি– সব এক রকম।

জাপানিদের কিমানোর ঠাঁই হয়েছে জাদুঘরে। আমাদের শাড়িরও সেই দশা আগামী একশ বছর পর হবে কিনা, কে জানে!

খাওয়া-দাওয়ার পর মন্টি তার গাড়িতে আমাদের নিয়ে ঘুরতে বের হলেন। পারুল রইলেন। আমাদের জন্য চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় পাকাবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দুপুরে খাওয়ার পর হবে আরেক দফা ঘোরাঘুরি। তখন পারুলও সঙ্গী হবেন। শহরের কেন্দ্রস্থলে গিয়ে আর দশটা পর্যটক যা কওে, আমরা তাই করব। অর্থাৎ দর্শনীয় সব জায়গা গো-গ্রাসে দেখে ফেলা। আমি অবশ্য জায়গা দেখার চাইতে সে দেশের মানুষ আর তাদের সংস্কৃতিকে জানতে বেশি আগ্রহী। কিন্তু সে ফুরসত মিলছে কই! তাই নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো নীতিতেই খুশি থাকতে হচ্ছে।

প্রথমেই গেলাম স্টকহোম ইউনিভার্সিটিতে। বন্ধের দিন বলে অধিকাংশ অফিস খোলা নেই। তাতে কী! আমরা হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। বাতাস বইছে বেশ জোরে। ঠাণ্ডাও লাগছে বেশ। কেউ যখন কিছু বলছে না তখন আমিও টুঁ শব্দ করলাম না। এক সময় দেখি, নাক দিয়ে পানি পড়ছে। টিস্যু দিয়ে মুছছি বার বার। এক সময় অবাক হয়ে দেখি, সাদা টিস্যু লাল হয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডার চোটে নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে। কাউকে কিছু বললাম না। নিজের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে অন্যদের ব্যতিব্যস্ত করতে লজ্জা লাগে খুব। নিশ্চিতভাবেই জানি, প্রকাশ করলেই সবাই হুলস্থূল শুরু করবে। এমনিতেই একটু পরপর মন্টি ফিরে ফিরে জিজ্ঞেস করছেন, আপা ঠিক আছেন তো?

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে টপ র‍্যাংকিং দেশগুলোর একটি সুইডেন এবং স্টকহোমও এ ক্ষেত্রে বেশ এগিয়ে। বিশ্বের নামকরা ইউনিভার্সিটির তালিকায় রয়েছে স্টকহোম ইউনিভার্সিটির নাম। এ ছাড়াও অনেক টেকনিক্যাল এবং রিসার্চ ইন্সটিটিউশন আছে এখানে, যেগুলি বেশ পুরাতন। অষ্টাদশ শতকে এসব প্রতিষ্ঠান যাত্রা শুরু করেছিল। স্টকহোম ইউনিভার্সিটি ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। তবে ইউনিভার্সিটির স্ট্যাটাস পায় ১৯৬০ সালে। ২০০৮ সালের স্ট্যাটিস্টিক অনুযায়ী এর ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫২ হাজার। তবে তাদের থাকার ডরমিটরির সংখ্যা কম।

স্টকহোমে থাকা-খাওয়া বেশ ব্যয়বহুল হওয়ায় এটি এক সমস্যা। এই ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত অনেক নামকরা ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান। যেমন সুইডিশ মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি, অবজারভেটরি, বারগিয়ান্সকা বোটানিক্যাল গার্ডেন। আমি শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে একেবারেই রবীন্দ্রপন্থী। নেহায়েত জমানা বদলে গেছে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙাতে বাধ্য হয়েছি। পড়ার বই ছাড়া দুনিয়ার তাবৎ বই পড়তে রাজি আছি। পড়ার বই? নৈব নৈব চ। মনে আছে, জন স্টুয়ার্ট মিলের লিবার্টি পরীক্ষার সময় চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে পড়তাম। সেই বই-ই চাকরিতে ঢুকে পরম আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। কারণ সেটা তখন আমার কাছে আউট বই। একই ব্যাপার ঘটেছিল অ্যারিস্টটলের পলিটিক্স আর ম্যাকিয়াভেলির দি প্রিন্সের বেলায়। তাই ঠাণ্ডার মধ্যে

দলের পিছু পিছু হাঁটছি 'মেরি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্ব'-এর সুবোধ ভেড়ার ছানাটি হয়ে।

ঘণ্টাখানিক ঘোরাঘুরির পর মন্টি হন্যে হয়ে ক্যাফেটেরিয়া খুঁজতে লাগলেন। একে ঠাণ্ডা তায় হাঁটতে কষ্ট হচ্ছিল বলে আমি এই রকম এলোপাতাড়ি খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে একধার দেখে দেখে যেতে আগ্রহী ছিলাম বেশি। তার উপর এলাকাটা সমতল নয়। কোথাও সিঁড়ি বেয়ে চত্বরে উঠতে নামতে হচ্ছিল। তাই বললাম, ক্যাফেটেরিয়া দিয়ে কী হবে ? সকালে যা খাইয়েছেন, সেগুলো হজম হতে এখনও দু'দিন লাগবে। আমার কথায় কান না দিয়ে উনি বললেন, এক কাপ কফি খাওয়া যাবে। শরীরও গরম হবে। পাশ্চাত্যের কফির প্রতি আমার মোটে ভক্তি-শ্রদ্ধা নাই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কালো রঙের দুধ-চিনি ছাড়া তিতকুটে এক বস্তু, যা আমার অনভ্যস্ত জিবে পুরোপুরি বিস্বাদ ঠেকে। দলের সাথে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই বলে বিরস চিত্তে চললাম। ক্যাফেটেরিয়াতে পৌঁছে প্রথমে বেশ আরাম বোধ করলাম। এই ফাঁকে সবাই ওয়াশরুম ঘুরে এলেন। মিনিট ১৫ পর দেখি গরম লাগছে। উপরের কোট খুললাম। সাথে সাথেই ফের গায়ে চাপাতে হলো, কারণ আমাদের গাইড আবার যাত্রা শুরু করেছেন। এভাবে যেখানেই গেছি খোলা জায়গায় কি খোলা রাস্তায় মিনিট বিশেক হাঁটার পরই উনি কোনো রেস্তোরাঁ কি শপিং মলে ঢুকেছেন এবং কিছুক্ষণ পর আবার বের হয়ে এসেছেন। স্বল্প সময়ের ভ্রমণে এসেছি বলে সময়ের এই রকম অপচয়ে মনে মনে নাখোশ হলেও তা প্রকাশ করিনি। আমাদের সফর শেষে উনি যখন আমাদের ট্রেনে তুলে দিচ্ছেন তখন সে রহস্য ভেদ করলেন এবং তখন তার ভীষণ কেয়ারিং মনের পরিচয় পেয়ে এতই অভিভূত হয়েছিলাম, যথারীতি আমার বিটকেল স্বভাব অনুযায়ী একটা কথাও বলতে পারিনি, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ দূরে থাকুক। কিন্তু কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে গিয়েছিল। উনি বলেছিলেন, আপনাদের কপাল খারাপ। এই সময় স্টকহোমের আবহাওয়া বেশ ভালো থাকে। কিন্তু আজ অনেকখানিই ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডায় বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে আপনারা অসুস্থ হয়ে পড়তেন, বিশেষ করে আপার (এই অধম) অবস্থা কাহিল হয়ে যেত, উনার জন্যই আমি বিরতি নিচ্ছি বার বার।

ইউরোপীয় কালচারাল ক্যাপিটাল হিসেবে পরিচিত স্টকহোমকে এভাবে চেনা দেখা এক কথায় অসম্ভব হলেও কিছুটা ধারণা অন্তত করা যাবে, এই আশায় গডডলের মতো চলেছি আর চারপাশে চোখ বুলিয়ে মনের মধ্যে যে ছবি এতদিন আঁকা ছিল তার সাথে মিলিয়ে নিচ্ছি। গ্রিন সিটি হিসেবে স্টকহোম সারা বিশ্বে জায়গা করে নিয়েছে বেশ উপরের দিকেই। ইউরোপীয় গ্রিন ক্যাপিটাল অ্যাওয়ার্ড স্কিম-২০১০ এ একে ইউরোপের সবুজ রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ২০০৭-এর এনভায়রনমেন্টাল ইকোনমিস্ট ম্যাথু কান রিডার ডাইজেস্টেও হয়ে যে সার্ভে করেছিলেন, তাতে বিশ্বের গ্রিনেস্ট ও বাসযোগ্য শহর হিসেবে ১ নম্বর স্থান অধিকার করেছিল স্টকহোম। শুধু রাজধানীই নয়; এটি সুইডেনের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং মিডিয়া সেন্টারও বটে। পার ক্যাপিটা জিডিপির র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের

প্রথম ১০টি দেশের একটি সুইডেন এবং সুইডেনের জিডিপির র‍্যাংকিংয়ে স্টকহোমের স্থান তৃতীয়। এটি নরডিক অঞ্চলের কর্পোরেট হেড কোয়ার্টারগুলোর প্রধান কেন্দ্র।

তবে এই বৈশিষ্ট্যগুলো কমবেশি প্রায় সব ইউরোপীয় দেশেরই রয়েছে। যে কারণে স্টকহোম আমার কৌতূহলের মাত্রা বৃদ্ধি করেছিল তা হলো ২০০৮-এ রিডার ডাইজেস্টের সার্ভে অনুযায়ী সারা বিশ্বে অনেস্ট সিটি হিসেবে চতুর্থ এবং ইউরোপের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। উন্নত বিশ্বের সব জায়গায় এই সততার দেখা মেলে না। আমেরিকাকে আমরা ধরি ১ নম্বও মহাশক্তি হিসেবে। সেই আমেরিকাতেই কয়েক বছর আগে ঘূর্ণিঝড়ে কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎবিহীন ছিল কয়েকটি অঙ্গরাজ্য। ঐ কয়েক ঘণ্টার ভেতর সীমাহীন লুটপাট, ধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়ে বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়েছিল আমেরিকার মতো সুপার পাওয়ার। যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ওলন্দাজ প্রভৃতি ঔপনিবেশিক শক্তি এতদিন ডাবল স্ট্যান্ডার্ড চালু রেখেছিল। নিজেদের দেশে ভালোমানুষির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে আর এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোকে কলোনি বানিয়ে তাদেও উপর শোষণ-জুলুম-নির্যাতনের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। এদের এই কপটচারিতার তুলনা পাওয়া মুশকিল। ঊনবিংশ শতকের যে শিল্প বিপ্লব ইউরোপকে যে একলাফে উন্নতির শিখরে তুলে দিয়েছিল, তার কারণ এশিয়া-আফ্রিকার এসব নির্যাতিত দেশ। শিল্প বিপ্লবের কাঁচামাল এসব দেশই জোগাত। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনাও ভুলে যাইনি। সেসবের নাটের গুরু ইউরোপের দেশগুলোই। ইনারা নিজেরা কম মারামারি ঝগড়াঝাঁটি করেননি। কথায় বলে, সাড়ে নয়শ' ইঁদুর খেয়ে বিল্লি চললেন তীর্থে, অনেকটা সে রকম ব্যাপার।

যাদের আমরা এখন আদর্শ মানি এবং প্রাণপণে অনুসরণ করার চেষ্টা করি, তারাও যে সাধু পুরুষ ছিলেন না– সে কথা আমার বেয়াড়া মনটা কিছুতেই ভুলতে চায় না। কাজেই অনেস্ট সিটি হিসেবে স্টকহোম আমার মন কেড়েছিল অনেক আগেই। মালমোতে দেখেছি, ডেনমার্কের সাথে মিলেমিশে কেমন ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। আলাদা দুটি দেশ– তা বোঝারই উপায় নেই। তবে সুইডেনও একেবারে দুধে ধোয়া তুলসীপাতা নয় কিন্তু। এই ডেনমার্কের সাথেই অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের কাহিনী আছে স্বার্থ আর রাজ্য বিস্তারের প্রশ্নে। সেই দিকে আর যাচ্ছি না। ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি আমার মতো গোমূর্খের কাজ নয়। সেটা পণ্ডিতজনের জন্যই তোলা থাকুক।

যে কথা বলছিলাম। স্টকহোম ইউনিভার্সিটি থেকে আমরা চলে এলাম নগরীর কেন্দ্রস্থলে। এবার আমাদের টার্গেট স্টকহোম সিটি হল। এখানেই নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। নগরীর কেন্দ্রস্থলে পা দিয়ে মালুম হলো, কেন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক ট্র্যাভেলার ম্যাগাজিন ২০০৮-এ একে গামা স্ট্যান (Gamla Stan) বা পুরাতন নগরী আখ্যা দিয়েছে এবং হিস্টোরিক প্লেস হিসেবে পৃথিবীতে এটি ষষ্ঠতম স্থানের অধিকারী। একনজরেই বোঝা যায়, এটি খুব প্রাচীন শহর। হবে নাইবা কেন। এখানে মানব বসতি শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৮০০০ অব্দে। বরফ যুগে তাপমাত্রা

কমে গেলে লোকজন দক্ষিণে সরে যায় এবং এক হাজার বছর পর তাপমাত্রা কমে সহনীয় মাত্রায় এলে তখন ফিরে আসে। ১০০০ সালে ভাইকিংরা দখল করে এবং স্টকহোমের বর্তমান অবস্থানে আসার পেছনে ভাইকিংদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। এরাই এখানকার ট্রেড রুট চালু করেছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল, যা স্টকহোমকে আজকের অবস্থানে নিয়ে এসেছে।

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সবচেয়ে জনবহুল সিটি স্টকহোম। ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের হিসাব অনুযায়ী, ২০১৩-তে এটি বিশ্বের ৮ম মোস্ট কম্পিটিটিভ সিটি। যথেষ্ট পুরাতন এবং জনবহুল, সেটা লোকজনে সরগরম দেখে সহজেই বোঝা যায়। শহরের কেন্দ্রস্থলে রেলস্টেশনের বাইরে পা দিয়ে সেই বহু ব্যবহৃত কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল নিজের অজান্তেই, যা মেয়েদের বয়স সম্পর্কে বলা হয়। কথাগুলো এই রকম– টিনএজে মেয়েরা আফ্রিকার মতো বুনো এবং এখনও কিছুটা অনাবিষ্কৃত; তিরিশের কোঠায় এশিয়ার মতো সমৃদ্ধশালী; চল্লিশের পর ইউরোপের মতো অর্ধেক ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্ধেক অভিজাত; পঞ্চাশের পর সাহারার মতো, যেখানে কেউই যেতে চায় না। যদিও এই কথাগুলো কখনোই ভালো লাগে না, তারপরও চারদিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল সেই কথাই– হাফ রুইন্ড হাফ অ্যারিস্টোক্র্যাটিক। পথে ঘাটে দালানকোঠায় পুরোনো কাহিনী যেন খোদাই করা। রেলস্টেশনের ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের দালান ও কারুকাজ সমৃদ্ধ অতীতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল, যা কালের স্রোতে ম্লান হয়ে এসেছে। এখানে প্রচুর লোকের আনাগোনা। বিশেষ করে ট্যুরিস্ট স্পটগুলোতে। প্রচুর সংখ্যক হকার চত্বরগুলোতে তাদেও পসরা সাজিয়ে বসেছে এবং ডাকাডাকি করছে। শুনেছিলাম, সুইডেন ইউরোপের ধনী দেশগুলোর একটি। কাজেই হকারদের এমন ডাকাডাকি আমাকে অবাক করল। তবে এদের কাউকে অরিজিনাল সুইডিশ বলে মনে হলো না। তখন মনে পড়ল, জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ হচ্ছে বাইরের ইমিগ্র্যান্ট। এদের মধ্যে ইরাক, ইরান, পোল্যান্ড, তুরস্ক, সোমালিয়া, চিলি ইত্যাদি দেশও আছে।

নোবেল প্রাইজ দেয় যেখানে সেটি বন্ধ থাকায় ঢোকা গেল না। বাইরে থেকেই ঘুরেফিরে আমরা পার্লামেন্ট আর রাজবাড়ির দিকে চললাম। নোবেল প্রাইজওয়ালারা আমার প্রিয় লেখক তলস্তয়কে প্রাইজ দেয়নি বলে এর উপর আমার সামান্য হলেও রাগ আছে। তবে একটি জিনিস ভালো। তা হলো এই পুরস্কার জীবিতকালেই দেওয়া হয়। মরণোত্তর পুরস্কারে আমার বিশেষ ভক্তি নাই। যাকে পুরস্কার দিচ্ছি তিনি যদি জানতেই না পারলেন, তবে সে পুরস্কারের ফায়দা কী! ঠাণ্ডা বাতাসে কাবু হয়ে রাজবাড়ি আর পার্লামেন্টের সামনে দিয়ে ঘোরাঘুরি করা হলো। একে যদি বলি দেখে এলাম, সত্যের অপলাপ হবে। কাজেই কেমন দেখলাম যদি জিজ্ঞেস করেন তবে একটা জোক শোনাই। এক বাচ্চা ছেলে বাপের অনুপস্থিতিতে দোকানে বসেছিল। এক কাস্টমার চারদিকে সাজানো লজেন্স মিঠাই দেখে প্রশ্ন করলেন, খোকা তোমার লোভ হয় না? খেতে ইচ্ছে হয় না? বাচ্চা ছেলেরা এত ছল-চাতুরী জানে না। অকপট জবাব দিল, হ্যাঁ হয়। কাস্টমারের আবার প্রশ্ন, তখন কী করো? খোকার জবাব, কী

করি? এপাশ-ওপাশ চেটে ফের বয়ামে রেখে দিই। আমরাও ঐ বাচ্চা ছেলেটির মতো চেটে রেখে দিয়েছি। তাই তার বর্ণনায় যাচ্ছি না। তবে অনেক ট্যুরিস্টের ভিড়ে লম্বা প্রবেশপথ দিয়ে রাজবাড়ি যেতে যেতে আমার মনে হয়েছিল, পুরান ঢাকার সদরঘাট দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। কেন মনে হয়েছিল? সে কথা বলতে পারব না। দৃশ্যত কোনো মিল না থাকলেও সম্ভবত আবহে মিল ছিল। কিন্তু মিলটা কোথায়– স্পষ্ট করে আমার মনও তা ধরতে পারেনি।

এই রকম দেখা আমার পছন্দ নয়, কিন্তু সময়ের অভাবে আমাদের বিকল্প কিছু হাতে নেই। হুড়মুড় কওে চলতে হচ্ছে। জীবনে বহুবার হোঁচট খেয়ে পা ভেঙে মচকে শয্যাশায়ী হয়ে আমার বোধোদয় হয়েছে ভালো রকম। এখন কোথায় পা ফেলছি, আগে দেখে নিই। কাজেই দৃষ্টি একবার পায়ে আরেকবার দ্রষ্টব্যের উপর ফেলে চলতে হচ্ছিল। বাচ্চাদের খেলার জন্য কাঠির উপর পুতুল আটকানো থাকে যেমন ঠিক তেমন। কাঠিতে চাপ দিলে পুতুল ডিগবাজি খেয়ে একবার উপরে একবার নিচে নামে। তেমনি আমার দৃষ্টি উপর-নিচ করছিল। এভাবে কি স্বস্তিমতো কিছু দেখা যায়! অচিরেই আমার উৎসাহ কমে এলো। ইতোমধ্যে দুপুর হয়ে গেছে। কাজেই আমরা ফিরে চললাম।

পারুল পরিপাটি করে টেবিল সাজিয়েই রেখেছেন। খাওয়ার বর্ণনা দেব না। তাতে পাঠক আমাকে পেটুক ভেবে বসতে পারেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে কিচ্ছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তাদেও পারিবারিক অ্যালবাম দেখতে দেখতে গল্প-গুজব করে ফের অভিযানে বের হলাম। এবার পারুলও আমাদের সঙ্গী হলেন বলে গাড়ি বাদ দিয়ে মেট্রোতে যাব। গাড়িতে এত মানুষের ঠাঁই হবে না। দুপুরে এত আইটেম ছিল যে, আমরা ডেজার্ট পর্বের শেষ মাথা পর্যন্ত যেতে পারিনি। পায়েস সেমাই পুডিং পর্যন্ত গিয়েই ক্ষান্ত হতে হয়েছিল। ফলফলারি তেমনই রয়ে গিয়েছিল। বের হবার আগে পারুল সেগুলো ঠেসে আমার ব্যাগে ঢুকাতে লাগলেন। যত 'না' করি তত বলেন, রাস্তায় খাবেন; ক্ষিদে পাবে হাঁটাহাঁটি করে। পাশ থেকে ফেরদৌস ফোড়ন কাটল, আমারটাও নেন। আর কারো ভ্যানিটি ব্যাগ নেই বলে তাদেরগুলোও আমার ব্যাগে ঢুকল। রিয়ার অ্যাডমিরাল আড়ে আড়ে দেখেন আর মিটিমিটি হাসেন; কিছু বলেন না। এ তো আচ্ছা মানুষ দেখি! নিশ্চয়ই আগে থেকে জানতেন, মন্টি আর পারুল এমন আতিথেয়তা করবেন। তার আত্মীয় তিনি জানবেন না তো কে জানবে! তাই আমাদের শত আপত্তি কানে তোলেননি। ধরে নিয়ে এসেছেন। অচেনা আত্মীয় কারো ঘাড়ে এভাবে সওয়ার হতে আমাদের বেশ আপত্তি ছিল। বিদেশে সবাইকে কী রকম উদয়াস্ত ব্যস্ত থাকতে হয়, কে না জানে! ছুটির দিনগুলোতে ধোয়া-পাকলা, বাজার-সদাই কাজকামও কম থাকে না। সপ্তাহান্তে বেড়ানোর প্রোগ্রামও থাকতে পারে। আমাদের জন্য তাদের সব মাটি হবে। আপত্তির জবাবে বাতেন সাহেব বলেছিলেন, ঠিক আছে। আপনাদের না হয় হোটেলে ব্যবস্থা করে দেব তেমন বুঝলে।

মন্টি আর পারুলের ব্যবহারে বুঝতেই পারিনি, আমরা তার কেউ নই। মেট্রো স্টেশন তেমন আহামরি মনে হলো না। কারণ বিভিন্ন দেশে আরও আধুনিক মেট্রোতে চড়ার সুযোগ হয়েছে। কিন্তু স্টেশনের ডেকোরেশন একটু আলাদা ধরনের মনে হলো। শুনলাম, ২ দশমিক ৪৪ বিলিয়ন ইউএস ডলার ব্যয়ে স্টকহোমে পরিবেশবান্ধব মেট্রো চালু করা হয়েছে। অল্পক্ষণের ভেতর মেট্রো এলো। শহরের সেন্ট্রাল স্টেশনে গিয়ে আমাদের মালমোর ট্রেন ধরতে হবে। মালমোর ট্রেনে উঠে তবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। পেটে বিশেষ জায়গা ছিল না, কিন্তু রাতের খাবার মিস করলে চলবে না। এমন উন্নত একটা দেশের ট্রেনের ডাইনিংয়ের ব্যবস্থা কেমন সেটা জানার জন্য আমার মনটা ব্যাকুল হয়ে ছিল। কাজেই বাতেন সাহেব যখন ডাকলেন, পিছু পিছু সুবোধ বালিকার মতো গেলাম। হাশেম স্যার আর ফেরদৌসকেও ডেকে নেওয়া হলো। হাঁটাহাঁটি করে সবার ক্ষিদে পেয়েছিল কম না। তার চেয়ে বেশি ছিল কৌতূহল। ছোট্ট একটা কাউন্টারের পেছনে বছর তিরিশেক ভদ্রলোক একাই অর্ডার নিচ্ছেন, ক্যাশ মিলাচ্ছেন, বিল করছেন আবার অর্ডার দেবার পর রান্নাও করছিলেন এক চিলতে জায়গায়।

ওভেন চুলা সবই আধুনিক। এক সুন্দরী তরুণী খাবারগুলো পৌঁছে দিচ্ছিল। কোথাও কোনো চেঁচামেচি, বিশৃঙ্খলা নেই। নিঃশব্দে কাজ হয়ে যাচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব কিছু। চকিতে মনে পড়ে গেল আমাদের দূরপাল্লার ট্রেনের খাবারের ব্যবস্থার কথা। নিজের অজান্তেই তুলনাটা মনে এসে যায়। জানি, অসম তুলনা। তারপরও মনটা নিজের দেশটাকে একই উচ্চতায় দেখতে চায়। বিজাতীয় আমাদের চেহারা, গায়ের রং আর চুল দেখে কাউন্ট্যারের লোকটির কৌতূহল না জেগে পারে না– এ বিষয়ে আমি বাজি ধরতে রাজি। কিন্তু তার চেহারায় সেসবের কিছুই প্রকাশ পেল না। নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কারণ একে অচেনা খাবার থেকে স্বাদমতো আইটেম বাছাই করতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল, তার উপর আইটেমের সংখ্যাও ছিল কম। বাঙালি অভ্যাসমতো আমরা খেতে এসেছি সবার শেষে, ততক্ষণে বেশির ভাগ খাবার শেষ। কি ইউরোপ কি এশিয়া, বিদেশে বেশির ভাগ জায়গায় রাত ৮টার মধ্যেই ডিনার টাইম শেষ হয়ে যায় বলে ভেতো বাঙালি মুশকিলে পড়ে যায়। অনেক বাছাই শেষে একটা কাটলেট, প্যান কেক আর দোসার মাঝামাঝি একটা আইটেম নিলাম সবাই। সাথে কোল্ড ড্রিঙ্ক। ক্ষিদের কারণে, না খাবারের গুণে জানি না, দোসা খেতে অসাধারণ লাগল। সবাই প্রশংসা করলেন। সত্যি সত্যি দোসা নয়, নামটা মনে নেই আর, তবে অনেকটা সে রকমই। খেয়েদেয়ে ফের কামরায় ফিরলাম। ইচ্ছে ছিল, আসবার সময় যেমন ঘুম দিয়েছিলাম তেমন একটা চান্স নেব; সুযোগ মিলল না। প্রতিটি সিটে না হোক, বেশির ভাগেই প্যাসেঞ্জার বসা। দুই একটা খালি থাকলেও এক সাথে দুটো সিট কোথাও খালি নেই। কাজেই বার বার ঘুমে ঢলে জেগে উঠতে হচ্ছিল। বসে বসে কি ঘুমানো যায়!

সকালে এসে পৌঁছলাম আমাদের পরিচিত মালমো সেন্ট্রাল রেল স্টেশনে। মালমো এই কয়দিনে এমনই আপন হয়ে উঠেছে, যেন বিদেশ থেকে নিজ দেশে এলাম।

স্টেশন থেকে আমাদের হোটেল হন্টনবর্তী দূরত্বের। ব্রেকফাস্ট সেরে নিজ নিজ রুমে খানিকক্ষণ ঘুমানোর চেষ্টা। লাঞ্চের পর ফের ঘোরাঘুরি হবে। লিফটে ফেরদৌস বলল, আপা, দুপুরে ঠিক টাইমে নিচে নামবেন। না হলে কিন্তু আপনাকে ফেলেই খেতে চলে যাব। এহেন সাবধান বাণী শুনে স্রেফ দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করার চেষ্টা করলাম ফেরদৌসকে। কলি যুগ বলে ভস্ম হলো না বটে, চোখ পাকানিতে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি যোগ করল, অবশ্য আপনি কখনও দেরি করেন না।

সন্দেহ আছে তোমার? আমি পুরুষদের চেয়েও তাড়াতাড়ি রেডি হতে পারি। বাজি ধরে দেখতে পারো। একলা মেয়ে হয়ে সমান তালে পাল্লা দিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পাও না? কখনও কোথাও আমার জন্য তোমাদের দেরি করতে হয়েছে, বলো? লিফট ইতোমধ্যে গন্তব্যে পৌঁছে গিয়েছিল বলে ঝগড়াটা বিশেষ জমল না। অবলা নারী হতে আমি কোনোমতেই রাজি না। আর আমাকে যে অবলা ভাববে, তার কপালে রীতিমতো দুঃখ আছে। রুমে এসে জামাকাপড় পাল্টে হাতমুখ ধুয়ে মোবাইল ফোনে অ্যালার্ম দিয়ে সোজা বিছানায় চিৎপাত। বাপও, ঘুম ছাড়া আমার চলবে না কিছুতেই। ঘুম থেকে উঠে গোসল সেরে রেডি হয়ে লাউঞ্জে নেমে দেখি, দলের দেখা নাই। ল্যাপটপ নিয়ে পড়লাম। জানি, বাংলাদেশে এখন গভীর রাত। তাই মেসেজ দিলাম দুই ছেলেকে– কার কী চাই। নিশ্চিত জানি, বড়টি কিছুই চাইবে না। বড়জোর বই চাইতে পারে। ছোটবেলা থেকেই আমার এই পুত্রধনটি বিচিত্র স্বভাবের। অতি তুচ্ছ বিষয়ে মজা পাওয়া আর বই ছাড়া দুনিয়ার সব ব্যাপারে সেইন্টসুলভ এক ধরনের নির্লিপ্ততা আছে তার। তবে ছোটজনের নানা বিষয়ে ছোটখাটো বায়না থাকে।

মিনিট ১৫ বাদে প্রথমে নামলেন রিয়ার অ্যাডমিরাল। বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি ঘুমাননি, নাকি?

-কে বলেছে? ঘুম-গোসল সব কিছুই হয়েছে।

-আপনি দেখি আসলেই পাংকচুয়েল খুব!

-সন্দেহ আছে আপনার?

-না না, সন্দেহ কেন থাকবে?

খানিক পর বাকিরা নামতে আমরা পদব্রজে চললাম দুপুরের খাবার খেতে। যেতে যেতে বাতেন সাহেব বললেন, প্রতিদিন বাংলাদেশি খাবার খাচ্ছি। দেশে ফেরার পর আফসোস হবে কিন্তু! তখন চাইলেও আর এগুলো খেতে পাব না। আজ অন্য রকম কিছু খেলে কেমন হয়? অ্যাটলিস্ট ট্রাই করে দেখা যাক না। আমি বাদে সবাই সানন্দে রাজি হলো, তখন নিজের আপত্তির কথাটা আর জানালাম না কাউকে। আমি ভয়ানক ডেমোক্র্যাসিতে বিশ্বাসী কিনা। রাস্তায় যেতে যেতে দোকানের সাইনবোর্ড, খাবার দাবার সবকিছু মিলেই খুঁজছিলাম পছন্দসই রেস্টুরেন্ট। যদিও জানি, যত লোভনীয়ই হোক, আমার রসনায় ইউরোপীয় খাবার রুচবে না কিছুতেই। ঝাল-মসলাবিহীন আলুনি জিনিস আমার পছন্দ হয় না। মেজাজটার মতো পছন্দটাও আমার কড়া কিনা! কেক পেস্ট্রি আরও অপছন্দ। কিন্তু দলকে সে কথা বলতে যাইনি। আমার

জন্য অন্যের আনন্দ নষ্ট হোক, সেটা একেবারেই না-পছন্দ। অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা গ্রিক রেস্তোরাঁ বাছাই করলাম। কাউন্টারের পেছনে যিনি সাদা অ্যাপ্রন পরে ব্যস্ত হাতে অর্ডার নিচ্ছিলেন এবং সার্ভ করছিলেন তার সুন্দর প্রশান্ত চেহারা, কোমল অভিব্যক্তি দলকে আকৃষ্ট করেছিল। এই বয়সেও মহিলা যথেষ্ট অ্যাট্রাক্টিভ। চেহারার ধাঁচটা পূর্ব ইউরোপীয়। এদিককার মেয়েদের রূপের খ্যাতি বিশ্বজোড়া।

দলের কেউই না স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, না পূর্ব ইউরোপিয়ান; কোনো জায়গার খাবার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। তাই আমরা সবাই মিলে বাতেন সাহেবকেই পাঠালাম অর্ডার দিতে। একমাত্র উনিই টার্কিতে ছিলেন দীর্ঘ দিন। আমি বসে পড়েছিলাম একটা চেয়ারে। হাঁটু জোড়াকে বিশ্রাম দেবার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করি না সহজে। বসে বসে দেখছিলাম সাজসজ্জা, আচার-ব্যবহার সবকিছু। আরও দুয়েকজন কাস্টমার ছিল। তারা ঝটপট খেয়ে বিল মিটিয়ে চলে যেতে রেস্টুরেন্টে আমরা আর মহিলাটি ছাড়া আরও দু'জন ছিলেন। একজন বেশ বয়স্ক; জানালার পাশে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলেন আর মাঝে মাঝে এমন ভঙ্গিতে মহিলার সাথে কথা বলছিলেন যে বহুদিনের হৃদ্য আর আন্তরিক সম্পর্ক ছাড়া তা সম্ভব নয়। মহিলার পাশে সুকুমার চেহারার একটি তরুণ সাহায্য করছিল। তার গলায়ও অ্যাপ্রন ঝুলানো। আন্দাজ করলাম, ছেলে হবে। বুড়ো লোকটি হয়ত আত্মীয়।

বাতেন সাহেবের সাথে দলের বাকিরাও কাউন্টারে। খাবার পছন্দ করছেন। মন স্থির করতে পারছেন না বলে মহিলাকেই জিজ্ঞেস করছেন। অল্পবয়সী ছেলেটি কৌতূহলী চোখে চাইছিল আমাদের দিকে। বুঝলাম, বাঙাল দেখে অভ্যস্ত নয় বেচারা। অর্ডার নেওয়া শেষ হতে ছেলেটি অ্যাপ্রন খুলে দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে বিদায় নিল। যাওয়ার আগে মায়ের গালে গাল ঠেকিয়ে আন্তরিক চুমু খেল। মহিলাও ছোট বাচ্চাদের যেভাবে আদর করে সেভাবেই প্রত্যুত্তর করলেন। আন্দাজ করলাম, খুব প্রিয় ছেলে হবে। কারণ চুমু দেবার সময় একদম ছোট শিশুদের বেলায় ওলে লে বলে আমাদের যেমন মুখের ভঙ্গি করি, তার ভঙ্গিটাও ছিল তেমন। বিদেশে গিয়ে দর্শনীয় জায়গা দেখার চেয়ে মানুষজন আর তাদের সংস্কৃতি আমাকে আকৃষ্ট করে বেশি। যে কারণে সেই ছোটবেলা থেকে আজ অব্দি দেশে বিদেশে আমার প্রিয় বই আর ইদানীংকালের লেখকদের মধ্যে মঈনুস সুলতানের লেখা পড়তে ভালো লাগে।

ছেলেটি চলে যেতে বুড়ো উঠে গিয়ে মহিলাকে সাহায্য করতে লাগলেন। বাতেন সাহেব দীর্ঘ আলাপ জুড়েছেন তাদের সাথে। মহিলার হাত চলছে, সেই সাথে বাতচিত। বয়স্ক লোকটি শুধু স্মিতহাস্যে সায় দিয়ে যাচ্ছেন। সেলফ সার্ভিস ব্যবস্থা। খানিক পরে বাতেন সাহেব আর ফেরদৌস দুই হাতে ট্রে নিয়ে এলেন। সাথে সেই মহিলাও একটি ট্রে এনে আমাকে দিলেন। খুব অপ্রস্তুত হলাম। ইউরোপে এমন সৌজন্য সহজে দেখা যায় না। শুধু ধন্যবাদ যথেষ্ট নয়। ফেরদৌস আর বাতেন সাহেবকে অনুযোগ জানালাম, বললেই হতো। এটুকু দূর থেকে খাবারের একটা ট্রে কি আনতে পারতাম না!

-আফটার অল, আপনি হলেন গিয়ে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি। বাতেন সাহেব বললেন।

-আরে আপা, আপনি হলেন আমাদের ভেনারেবল আপা। আপনার জন্য এটুকু কষ্ট না হয় করলামই! স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ফেরদৌস বলল।

-তোমার এই ভেনারেবলটা আবার কী জিনিস! আমি অবাক হয়ে বললাম।

-বুঝলেন না? অনারেবল হলো সম্মানীয়। আর তার চেয়ে বেশি সম্মান দেখালে হয় ভেনারেবল।

-ঠাট্টা করার আর জায়গা পাও না?

-ছি ছি! ঠাট্টা করব কেন? আপনার সাথে কি ঠাট্টা করতে পারি? আধহাত লম্বা জিভ কেটে ফেরদৌস বলতে না বলতে হেসেই ফেলেছে। হেসে ফেলেছি আমিও। বললাম, একদিন তুমি আমার হাতে মাইর খাবে নির্ঘাত! আর জানো তো মাইরের উপর ওষুধ নাই।

খেতে খেতে বাতেন সাহেবের কাছ থেকে জানলাম মহিলা গ্রিস থেকে সপরিবাওে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে এদেশে এসেছেন বেশ কয়েক বছর। স্বামী-স্ত্রী মিলে রেস্টুরেন্ট চালান। ঐ বুড়ো লোকটিই স্বামী। আর ছেলেটি হচ্ছে জামাই। কাছেই চাকরি করে বলে লাঞ্চের সময় এসে শাশুড়িকে সাহায্য করে। ভালো লাগল শুনে। স্টকহোমে গিয়ে সুইডিশদের বিয়ে-শাদীর বিত্তান্ত শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এই গ্রিস পরিবারটির ইতিহাস শুনে ভালো লাগল। মুশকিলের বিষয় হলো ভদ্রমহিলা কাজ চালানোর মতো ইংরেজি জানেন বলে আলাপ-সালাপ বেশি করা গেল না। কথার চেয়ে হাসি বিনিময় হলো বেশি। তবে সানন্দে ছবি তুলতে রাজি হলেন। বিদায় নিয়ে আসার সময় আন্তরিকভাবে গালে গাল ঠেকিয়ে বিদায় জানালেন। অন্য কাস্টমারদের বেলায় তা করতে দেখিনি। বুঝলাম, তার দোকানে বাঙালের আসা-যাওয়া বিরল ঘটনা। যদিও সুইডেনে প্রচুর বাঙালি আছে; মালমোতেও।

সবাই বেশ আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে এবং বাতেন সাহেবের বাছাইয়ের প্রশংসা করছে। আমিও করলাম। কিন্তু খেতে পারলাম না কিছুই। ডালের মতো একটা আইটেম সবার পছন্দ হলেও আমার মুখে রুচছিল না। বাতেন সাহেব ব্যাপারটা খেয়াল করে বললেন, আপনার জন্য অন্য কিছু অর্ডার দেব? কিছুই তো খাননি। সচেতন হয়ে গুপুস করে কতকটা ডাল মুখে চালান করে বললাম, আমি তাড়াতাড়ি খাই তো তাই বুঝতে পারছেন না। পেট ভরে গেছে বলে এই ডালটা আর খেতে পারছি না। রুটিগুলো তো দারুণ লেগেছে।

খেয়েদেয়ে আবার ঘোরাঘুরি। হোটেলে খামোখা কেউ ফিরে যেতে চাচ্ছেন না। এই ফাঁকে টুকটাক কেনাকাটাও করা যাবে ভেবে আমি রাজি হলাম। সেটা শুনে বাতেন সাহেব একটু মুচকি হাসলেন। খানিক পরে এক শার্টের দোকানে নিয়ে গিয়ে বললেন, কর্তার জন্য একটা শার্ট কেনেন এখান থেকে। নানান রকম শার্ট। ঘুরে দেখে আমি একটা শার্ট বাছাই করলাম। সুইডিশ ক্রোনারে দাম লেখা বলে বুঝতে

পারলাম না, দামটা কেমন। হিসাব-কিতাব আমার জন্য বড়ই খতরনাক জিনিস। বিসিএস পরীক্ষায় সবাই অঙ্কে নাম্বার তোলে। আমার বেলা হয়েছিল উল্টো। স্রেফ পাস মার্কের বেশি তুলতে না পারায় আমাকে বরং অন্য সাবজেক্টে নাম্বার তুলে অঙ্কের ঘাটতি পূরণ করতে হয়েছে। কত ডলারে কত টাকা হিসাব করতে গেলে মাথায় গন্ডগোল বেধে যায়। তার উপর মাগো এ-------তো টাকা লাগবে! বলে আক্ষেপ তো আছেই। তাই আমার হিসাব সোজাসাপটা। এক ডলার মানে এক টাকা। এক ইউরো মানেও এক টাকা। এক ক্রোনার মানেও এক টাকা। এক টাকার কমে তো আর মুদ্রা হতে পারে না। এই নিয়মেই আমি বিদেশে নিশ্চিন্ত মনে বাজার-সদাই করি। সেই একই নিয়মে এখানেও দুটি শার্ট বাছাই করে যখন ইতিউতি চাইছি আরও নেয়া যায় কিনা তখন বাতেন সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, সত্যি সত্যি কিনবেন নাকি? আমার হ্যাঁ জবাব আর মুখভঙ্গি দেখে বুঝলেন, মোটেও ঠাট্টা করছি না। তখন আবার শুধালেন, সত্যিই কিনবেন?

-হ্যাঁ। একটা কর্তার জন্য, ছেলের জন্য একটা। বড়টা শার্ট পরে না। ওর জন্য গেঞ্জি নেব।

-আপনার কি মাথা খারাপ? এই দামে শার্ট নেবেন? সত্যি সত্যি? আপনাকে এখানে আনাই ভুল হয়েছে। আমি ঠাট্টা করছিলাম। চলেন চলেন; কিনতে হবে না। আপনার ডলারে কুলাবে না।

-আরে ক্রেডিট কার্ড আছে সাথে। তিন হাজার ডলার পর্যন্ত খরচ করা যাবে এই কার্ডে।

-কী করতে কিনবেন? এই টাকায় বাংলাদেশ থেকে এর চেয়ে ভালো ২০টা শার্ট কিনতে পারবেন। এগিয়ে এসে বললেন হাশেম স্যার। একমাত্র ফেরদৌস বুঝেছিল গলদটা কোথায়। আমার সাথে তার পরিচয়ই বেশি দিনের। সে বলল, আপা, এই একেকটি শার্টের দাম বাংলাদেশি টাকায় কত জানেন?

-না, কত?

-যেটা দুলাভাইয়ের জন্য বেছেছেন তার দাম ২৮ হাজার সাতশ। আর ছেলেরটার দাম.................

-ওরে বাপরে! চাই না, চাই না। ফেরদৌসের কথা শেষ হবার আগেই আমি আঁতকে উঠে আর্তনাদ করে উঠলাম। আমি কি জানি এত দাম! ঢাকায় এমন শার্ট তিন হাজারেই পাওয়া যায়। আমি প্রায় দৌড়ে বের হয়ে এলাম। ফিরে দেখি সেলসম্যান নির্বিকারভাবে আমার নামানো শার্টগুলো তাকে তুলে রাখছে। সন্দেহ হলো, হয়তো হেসেছেও। রাস্তায় নেমে হাসাহাসি হলো খুব। বাতেন সাহেব বললেন, আমি তো বুঝতেই পারিনি, আপনি সিরিয়াসলি কিনতে বসেছেন। আমি এখানকার জিনিসের দাম সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য নিয়ে গেছি।

এর আগে স্টকহোমে জিনিস কিনেছি। তখন পারুল ছিলেন সাথেভ উনিই বেছেবুছে দিয়েছেন; আমি চোখ বুজে দাম দিয়েছি। ক্রোনারে বলে টের পাইনি। অবশ্য তখনও বাতেন সাহেব আপত্তি করেছিলেন। আমি বলেছি, ছেলের বায়না। শুনে আর কিছু বলেননি। তখন যদি জানতাম কী দরে জিনিস কিনছি! এর পর আমার আর জিনিসপত্র কেনা দূরে থাক, দেখবারও হাউস হয়নি। মার্কেটে গিয়ে আমি বসার একটা জায়গা খুঁজে নিয়ে স্রেফ বসে থাকতাম। পরদিন আমাদের কোপেনহেগেন অভিযান। ৮টায় নাশতা সেরে রওনা দিয়েছি। হেঁটে হেঁটে রেল স্টেশন। সেখান থেকে ট্রেনে কোপেনহেগেন। এর আগে অরসান্ডস ব্রিজ পার হয়েছি গাড়িতে। এবার ট্রেনে। তাই আজকে অন্য রকম উত্তেজনা।

ব্রিজটি এতই সুন্দর যে, ভালো লাগবেই। কে বলবে, আমরা ভিন দেশে এসেছি। কোনো ইমিগ্রেশন চেকআপ নেই, তল্লাশি নেই। স্রেফ ট্রেনে উঠা আর নামা। রেল স্টেশন থেকে বের হয়ে পদব্রজে চলেছি সবাই। ইচ্ছে হিপহপ বাসে শহর ঘুরব। স্বল্প সময়ে কোনো জায়গা দেখতে হলে এটাই সর্বোত্তম পন্থা। তবে হিপহপ বাসগুলোর ছাদ, জানালা সবই আছে। না থেকে যাবে কোথায়! স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি। বছরে ১৮ মাসই তীব্র শীত। ছাদ খোলা হিপহপ বাস হলে একটা যাত্রীও পাবে কিনা, সন্দেহ। আমরা আপাদমস্তক বান্ডিল হয়ে তবে রাস্তায় নেমেছি। এই কয়দিনে বুঝে গেছি, কত হাওয়ায় কত ঠাণ্ডা! শহরের কেন্দ্রস্থলে চৌরাস্তার মোড়ে কয়েকটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেহারাই বলে দেয়, এগুলো ট্যুরিস্ট বাস। লিটল মারমেইড আর হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের কারণে ডেনমার্কে কম ট্যুরিস্টের আগমন ঘটে না। ছোটবেলায়; না শুধু ছোটবেলায় কেন; বড়বেলায়ও হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের দারুণ ভক্ত ছিলাম আমি। রূপকথার চেহারা যিনি পাল্টে দিয়েছেন এবং তাতে অন্য রকম এক মাত্রা যোগ করেছেন। তার প্রতি দুর্বলতা পোষণ করেন না, এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বিশেষ করে যাদের বই পড়ার অভ্যাস আছে ছোটবেলা থেকে। মনে আছে, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের সাথে প্রথম পরিচয় একদম ছোটবেলায় কচিকাঁচা নামে এক কিশোর ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সেই বিখ্যাত গল্পের মাধ্যমে, যেখানে একটি ছোট্ট মেয়ে শীতের রাতে ঠাণ্ডায় জমে মারা গিয়েছিল এবং মেয়েটি ছিল দেয়াশলাই বিক্রেতা। মৃত্যুর আগে সে সব ক'টি দেয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে এক স্বপ্নময় ভুবন তৈরি করেছিল এবং হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসন সেই অপার্থিব জগৎটি এত সুন্দর করে এঁকেছিলেন; সেই ছোট্ট বয়সেই এক ধরনের মুগ্ধতা মাখানো তীব্র বেদনাবোধ তৈরি হয়েছিল আমার মনের গহীনে। সেই মুগ্ধতা আজতক যায়নি। যে লিটল মারমেইড স্ট্যাচু এত ট্যুরিস্ট প্রতি বছর চুম্বকের মতো টেনে আনে, সেই কালজয়ী রূপকথার নির্মাতাও তিনি। শেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটকখানিও ডেনমার্কের রাজপুত্রকে নিয়ে লেখা। কাজেই কোপেনহেগেনে নেমে অব্দি অন্যরকম শিহরণ জাগছিল মনে। কিন্তু সে কথা ভুলেও প্রকাশ করতে যাইনি। বাপরে, সঙ্গীরা সবাই ওজনদার লোকজন। সাহিত্য-ফাহিত্যেও ধার ধারেন কিনা, সে কথা জিজ্ঞাসা করারও হিম্মত আমার হয়নি। প্রত্যেকেই জ্ঞানী-গুণী। জিজ্ঞেস করে নিজের বারোটা

বাজানোর মতো বেআক্কেল আমি নই। বাতেন সাহেবকে অবশ্য অষ্টপ্রহর বই হাতে দেখি। বেশির ভাগই জ্ঞান-বিজ্ঞানের। উনি একে রিয়ার অ্যাডমিরাল, তায় বুয়েটের কৃতী ছাত্র। হাশেম স্যারের পড়াশোনা ম্যানেজমেন্টে। তাদের কি রূপকথা পড়েন কিনা, জিগানো চলে? তাই আমি নিজের উত্তেজনা মনের মধ্যেই চেপে রাখলাম। একেবারে এয়ার টাইট বয়ামে বন্ধ করে।

দলের পিছু পিছু হাঁটছি। চোখ পায়ে। হোঁচট খেলেই আমি চিত্তির। জেব্রা ক্রসিং ধরে রাস্তা পার হয়ে এইপারে আসতেই কানে এলো, আপনারা বাঙালি? আহা! কানে যেন মধুবর্ষণ! নিজের ভাষা সুদূর ডেনমার্কে অন্তত আশা করিনি। তাও আবার বাসস্ট্যান্ডে। আমি তো খুশি, দলও দেখি মহাখুশি। বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েই আলাপচারিতা চলল। বছর পঁচিশেক বয়স। এখানে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছে বছর খানেক হয়। নামটা ভুলে গেছি। দেখলাম, হাশেম স্যার তার চাচাকে খুব ভালো করেই চেনেন। এক সময় তার সহকর্মী ছিলেন। ছেলেটির হাতে কতগুলো লিফলেট। ট্যুরিস্ট কোম্পানির। কোন বাসে গেলে ভালো হবে, ভালো কওে বুঝিয়ে দিল। আরও জানাল, সে তার বাসে আমাদের নিয়ে যেতে পারলে সব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিতে পারত। কিন্তু সেটার সিরিয়াল আরও পরে। আর সিরিয়াল ব্রেক করে আমাদের তার বাসে উঠালে রিপোর্ট হয়ে চাকরিতে সমস্যা হবে।

বাসে উঠে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বাপরে! ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছিল। আকাশ রৌদ্রকরোজ্জ্বল। তাতে কী! বাতাস যেন বরফের ছুরি। ট্রেন, বাসের ভেতর কি হিটিং সিস্টেম আছে? রাস্তায় নামলেই শীতে জমে যাচ্ছিলাম প্রায়। এয়ারফোনে ধারাবর্ণনা শুনতে শুনতে আর দেখতে দেখতে যাচ্ছি। নতুন আর পুরাতনে মেশানো কোপেনহেগেন আর ১০টা ইউরোপীয় সিটির মতোই। শুধু রাজবাড়ির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটকের কল্যাণে ভালো করে দেখলাম। বাইরে থেকে আহামরি মনে হয়নি। এর চেয়ে ঢের বেশি রাজকীয় হাঙ্গেরির রাজবাড়ি। অস্ট্রিয়ার রাজবাড়িও কম যায় না। তবে হ্যামলেটের কারণে এই রাজপ্রাসাদের মূল্য আলাদা। ভেতরে গিয়ে দেখতে পারলে হতো। কিন্তু আমাদের হাতে সে সময় নেই, সুযোগও নেই। তাই দুধের সাধ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপায় কী?

বাস এসে থামল কোপেনহেগেন হারবারের সামনে। এখানেই আছে লিটল মারমেইডের সেই বিখ্যাত স্ট্যাচু, যা ডেনমার্কের ট্যুরিস্ট আইকনে পরিণত। প্রতি বছর প্রচুর ট্যুরিস্ট এটি দেখতে আসে। বাস থামামাত্র হুড়মুড় করে সব ছুটেছে। মে মাসে এটি পুরোপুরি ডাঙায় থাকে। এখন মার্চ। তাই লিটল মারমেইডের চারপাশে পানি। নানান দেশের ট্যুরিস্টের কলতানে নিমিষে জায়গাটা মুখর হয়ে উঠল। ছবি তোলা চলছেই। বাস থেকে নামার সময় ড্রাইভার বলেছিল : অনলি ফাইভ মিনিটস। তাই আমি সবাইকে তাড়া দিচ্ছি– হয়েছে হয়েছে। যথেষ্ট ছবি তোলা হয়েছে। এইবার চলেন, পাঁচ মিনিট কিন্তু প্রায় শেষ। কেউ কথা কানেই তুলল না। ফেরদৌস বলল, রাখেন। আগে ভালো করে একটা ছবি তুলে নিই। আর কবে এখানে আসা হয়-না হয়, কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে!

তাকিয়ে দেখি বাস অলরেডি স্টার্ট নিয়েছে। ঐ যে বাস ছেড়ে দিল বলে আমি হাচর-পাচর করে ঐ টুকরো পাথর ফেলা হারবারের গা বেয়ে উঠে সোজা ছুট লাগালাম। আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত হাঁটু নিয়ে এমন পাথর বাওয়া যদিও আমার জন্য মোটে সহজ কথা নয়। বাস মিস করলে আমারই যে বারোটা বাজবে সবার আগে। ফেরদৌস ঘাড় ঘুরিয়ে এক পলক দেখেই তিন লাফে আমাকে ডিঙিয়ে চিৎকার করতে করতে বাসের পিছু পিছু ছুটল। তার পিছু পিছু হাশেম স্যার বড় বড় পা ফেলে চলেছেন। একে টিচার তায় ইউজিসির সদস্য। আর যাই হোক উনি তো আর দৌড় লাগাতে পারেন না। বাতেন সাহেব এবার তার মিলিটারি স্কিল দেখালেন। তিনি ছিলেন সবার পেছনে। কোন কায়দায় সামনে চলে গেছেন, বলতে পারব না। তখন সবাই আমরা টেনশনে। ড্রাইভার আমাদের দেখতে পেয়েও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে বাস ঘুরিয়ে স্পিড বাড়িয়ে সোজা চলে গেল। এমন রাগ লাগল যে কী বলব! দুই ঘণ্টায় আমরা এখানে এসেছি, কম দূর নয়। এখন যদি হাঁটতে হয় কী দশা হবে, চিন্তা করেই মাথা গরম হয়ে গেল। অন্যদের কিছু বলা শোভন দেখায় না। তাই আমি ফেরদৌসকেই বকতে লাগলাম– কখন থেকে বলছি : পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে। তা না; কথা কানেই যায় না! এখন তোলো ছবি!

-ঠিক বলেছেন। বাস যখন চলেই গেছে তখন ছবিই তুলে নিই, বলেই ফেরদৌস বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ফের গিয়ে ছবি তুলতে লাগল।

-এত চিন্তা করছেন কেন? কিছু একটা ব্যবস্থা তো হবেই। ঐ যে, আরো বাস আছে না? রিকোয়েস্ট করলে কি আমাদের নেবে না? আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি জিজ্ঞেস করে আসি বলে বাতেন সাহেব আধা খালি বাসগুলো টার্গেট করলেন। ছেড়ে যাওয়া তেমনি এক বাসের ড্রাইভারের সাথে কথা বলে ফিরে এলেন।

-এক ঘণ্টা পরপর বাস আসছে। বলল, তোমাদের কোম্পানির বাস সার্ভিস যখন বন্ধ হয়ে যাবে, তখন নিতে পারবে; তার আগে না। তাহলে বিজনেসের রুল ভঙ্গ করা হবে। এও বলল, প্রতি ঘণ্টায় সব কোম্পানির বাসই আসে। অপেক্ষা করো।

-অপেক্ষার খ্যাঁতা পুড়ি। বিড়বিড় করলাম।

-কী বলছেন?

-বলছি, এই ঠাণ্ডা বাতাসে এই রকম খোলা জায়গায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকেন দেখি! বাস নয়, অ্যাম্বুলেন্স লাগবে।

-আসলেই প্রচণ্ড শীত লাগছে। হাশেম স্যার সায় দিলেন। চারপাশ খোলা। কোথাও আশ্রয় নেবার মতো কিছু নেই। ছোট্ট একটা টং ঘরে স্যুভেনিরের দোকান দিয়েছে অল্প বয়সী একটা মেয়ে। সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন বাতেন সাহেব।

-চলেন ঐ দোকানটার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। কম শীত লাগবে।

-ঘোড়ার ডিম লাগবে। দেখছেন না, বাতাস ঐ দিক থেকেই আসছে।

-চলেন তো দেখি। এই জায়গার চেয়ে অন্তত কম লাগবে।

মিনিট ৫ হয়নি। এর মধ্যেই সবাই শীতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। সবাই সেই দোকানের সামনে গিয়ে হাজির হলাম। বাতেন সাহেব দেখি টুকটাক জিনিস দেখছেন। অবাক তো অবাক।

-আপনিই না বললেন, এখানে জিনিসের অসম্ভব দাম!

-হ্যাঁ, তাই বলে দেখতে তো মানা নাই। আর কিছু না কিনলে বা কেনার ভান না করলে মেয়েটি কি তার দোকানের সামনে দাঁড়াতে দেবে?

-অ, আচ্ছা। বলে আমিও দেখতে লাগলাম। দেখি ছোট-বড় নানা ধরনের ভাইকিং পুতুল। প্রতিটির মাথায় শিঙওয়ালা লোহার টুপি। কোমরে পশুলোমের জোব্বা বেল্ট দিয়ে আটকানো, হাতে কুঠার। দেখে আমি আর নাই। একটা ভাইকিং আমার লাগবেই লাগবে। জানি, বড় ছেলের স্বভাব আমার মতোই। তারও পছন্দ না হয়ে যায় না! বড় একটা বাছাই করলাম। এক হাজার ইউরো। কুলাবে না। একটু ছোটটা নিলাম। ৬০০ ইউরো। এটা কেনা যায়, তবে কর্তার মহা গ্যাঞ্জাম লাগানোর আশঙ্কা পুরোমাত্রায়। যখনই বাইরে যাই, পুতুল কেনার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। শুধু নিষেধাজ্ঞা নয়। প্লেনে উঠাতক পই পই করে মনে করিয়ে দেন। কাজেই আমি মাঝারি একটা বাছলাম, ৩০০০ ইউরো। আমার কাছে ডলার আর সুইডিশ ক্রোনার। ইউরো নেই। ডেনিশ মুদ্রাও নেই। এখানে এমন জিনিস পাব, কে জানত! কোপেনহেগেনে তো আমাদের কেনাকাটা করার কথা না। তবে আশার কথা শুনেছিলাম, ডেনমার্কে নাকি সুইডিশ ক্রোনারও চলে। ক্রোনার দিলাম। দোকানি মেয়েটি মাথা নাড়ল। এবার দিলাম ডলার। তাও দেখি মাথা নাড়ে!

-এই ফেরদৌসকে, আমাকে ৩০০ ইউরো দাও তো। মালমো গিয়ে ফেরত দেব।

-কী করবেন?

-এই পুতুলটা কিনব।

-এই পুতুল কিনবেন তি-----------ন------- শো ইউরো দিয়ে! আপনার কি মাথা খারাপ? স্যার দেখে যান (হাশেম স্যারকে) আপার কাণ্ড! এই পুতুল কিনতে চায়! ৩০০ ইউরো দিয়ে!

-খামোখা কেন পয়সা নষ্ট করবেন! কোনো দরকার আছে?

স্যার পুতুলটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে রেখে দিলেন। অবস্থা বুঝে আর কেনার কথা বললাম না। সফরসঙ্গী কেউই আমার এই বেহিসেবি কেনাকাটায় সায় দেবেন না; ধার দেওয়া দূরে থাক। আমাকে সদুপদেশ দেওয়াকে তারা নৈতিক দায়িত্ব বলেই মনে করছেন। কী আর করি! মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাতেন সাহেব পুরা ঘটনা মন দিয়ে দেখলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। মনে পড়ল ওয়েলসে কাপড়ের তৈরি দারুণ সুন্দর ডাইনি বুড়ি পেয়েছিলাম। সেখানেও দলের কেউ কিনতে

দেননি খামোখা পয়সা খরচ ভেবে। সেই দুঃখ আমার আজতক যায়নি। কেবল কর্তা শুনে দারুণ খুশি হয়েছিল। একটু দূরে দুটো বেঞ্চ পাতা। সবাই তাতে বসলেন। কমপক্ষে এক ঘণ্টা বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমি সেই দোকানের পাশেই ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। ব্যাপারটা খেয়াল করে মিনিট ১৫ পরে বাতেন সাহেব এসে শুধালেন, আপনি কি সত্যিই এটা কিনতে চান?

মেজাজটা গরম হয়েই ছিল। তাই জবাব দিলাম, মিথ্যা মিথ্যা কেনা যায় নাকি! আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওয়ালেট বের কওে ৩০০ ইউরো আমার হাতে দিয়ে বললেন, নেন। এইবার কেনেন। যেমন মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন... কথাটা উনি শেষ করলেন না; মুচকি হাসলেন শুধু। হাসবেন না কেন! এইটুকুতেই আমি খুশিতে আত্মহারা। সম্ভবত সাহিত্যিকরা যেমন বর্ণনা দেন, আমার মুখেও নির্ঘাত সে রকম ২০০ ওয়াটের বাতি জ্বলে উঠেছিল। নিজের মুখ তো আর সেই মুহূর্তে দেখিনি। মেয়েটি যখন প্যাকেট করছিল তখন আমি তাকে ক্রমাগত সাবধান করেই চলেছি– বি কেয়ারফুল! গোয়িং ভেরি ভেরি ফার; প্যাক ইট কেয়ারফুলি ইত্যাদি। মেয়েটিও হাসছে। কিচ্ছু মনে করলাম না। এদেশে এটা সহজলভ্য হলেও আমার দেশে তো নয়। পুতুলটি বগলদাবা করে তারপর ফুরসত মিলেছে বাতেন সাহেবকে ধন্যবাদ দেবার। সত্যি ভীষণ কৃতজ্ঞ লাগছিল। উনি হেসে বললেন, শখের তোলা ৮০ টাকা বলে একটা কথা আছে না! দেখলাম, আপনি ভীষণ মন খারাপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন। দোকানের পাশ থেকে নড়ছেন না পর্যন্ত। টাকা ধার দিলে আমার তো আর ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। বাক্সটা বুকে চেপে দু'জনে দলের কাছে ফিরলাম ৩২টি দন্ত বিকশিত করে। সেটা দেখে ফেরদৌস আর হাশেম স্যার দু'জনেই হাসলেন– কিনেই ছাড়লেন! তবে পুতুলটা দেখলে ভয় করে। 'করবে না আবার! ভাইকিং যে!'

এক ঘণ্টা অপেক্ষার পরও আমাদের কোম্পানির কোনো বাস এলো না। ভাইকিং পেয়ে আমার আর শীতের কথা খেয়াল ছিল না। কিন্তু দলের বাকি সবাই এই এক ঘণ্টায় বেজায় কাবু হয়ে পড়েছেন। বাতেন সাহেব ফের উঠে গিয়ে দোকানি মেয়েটির কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসে জানালেন, কাছেই একটা রেল স্টেশন আছে হন্টনবর্তী দূরত্বে। এক ঘণ্টা পরপর ট্রেন আছে। সেটায় সেন্ট্রাল রেল স্টেশনে গেলে শহরের কেন্দ্রস্থলে যাওয়া যাবে। আমাদের এমনিতেও সেন্ট্রাল রেল স্টেশনে যেতে হবে। কারণ আমরা ট্রেনেই মালমো যাব কিনা। ওখান থেকেই উঠতে হবে। কাজেই আমরা হেঁটে রেল স্টেশনের দিকে রওয়ানা দিলাম। পেছন থেকে একটা ট্যুরিস্ট বাস আসছিল। বাতেন সাহেব বললেন, শেষ চেষ্টা করে দেখব নাকি একবার? আমার হাঁটতে অসুবিধা নাই। কিন্তু স্যার আর জিকরুরের পক্ষে পানিশমেন্ট হয়ে যাবে।

আমাদের সম্মতির অপেক্ষা না করেই উনি হাত দেখিয়ে বাসটা থামালেন। বিত্তান্ত খুলে বললেন। লিফট চাইবার আগেই চালক এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে সেই একই কথা আউড়ে গেল। নিয়মবিরুদ্ধ; এক কোম্পানির বাস অন্য কোম্পানির যাত্রী নিতে

পারবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। চালকের চেহারায় এশীয় ছাপ, ইংরেজতেও। বাতেন সাহেব শুধালেন, আর ইউ টার্কিশ? ইয়েস জবাবের পর উনি কী বললেন তার বিন্দু-বিসর্গ বুঝলাম না। শুধু অ্যাডমিরাল শব্দটা কানে আসতে বুঝলাম, তুর্কি ভাষার তুবড়ি চালাচ্ছেন। জানতাম, অ্যাডমিরাল শব্দটা তুর্কি থেকে এসেছে। তার কথা শেষ হবার আগেই ড্রাইভার সিট থেকে নেমে খটাস করে গোড়ালিতে গোড়ালি চেপে পেল্লায় এক মিলিটারি স্যালুট ঠুকল। সেও তুর্কিই বলছে। কাজেই কী বলছে, কিছুই বুঝলাম না একমাত্র অ্যাডমিরাল ছাড়া। যেমন সমীহের সাথে শব্দটা উচ্চারণ করল, তাতে বুঝতে বাকি রইল না যে জলজ্যান্ত একজন অ্যাডমিরাল পেয়ে কী করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। প্রায় কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে আমাদের বাসে উঠার জন্য ইশারা করল। খালি সিট দেখিয়ে বসতে ইশারা করল। বাতেন সাহেব তার পেছনের সিটে বসলেন এবং তাদের কথাবার্তা আরও কিছুক্ষণ চলল।

উনি ট্রেনিং উপলক্ষে তুরস্কে ছিলেন দুই বছর। কাজেই তুর্কি ভাষা ভালোই রপ্ত। তুর্কিরা হলো যোদ্ধার জাত। তাদের কাছে যোদ্ধার সম্মান অনেক উঁচুতে। বাতেন সাহেব জানালেন, সে নাকি আমাদের বিনা পয়সায় পুরো রাইড ঘুরে দেখার অফার দিয়েছে। একবার বাস ফেল করে ফের কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নই। কাজেই আমি স্রেফ না করে দিলাম। আর না। যথেষ্ট হয়েছে। হাশেম স্যারও আমার দলে। কাজেই ড্রাইভারকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা সেন্ট্রাল রেল স্টেশনের সামনে নেমে পড়লাম। বার বার করে সে বুঝিয়ে দিল, কোনদিক দিয়ে যেতে হবে। মালমো যাওয়ার ট্রেনে উঠে সবাই হাত-পা এলিয়ে বসলাম। এতক্ষণে মনের ভেতর থেকে উৎকণ্ঠা গেছে। মালমো আমাদের কাছে প্রায় নিজের বাড়ির মতোই দাঁড়িয়েছে এই কয়েক দিনে।

-লিটল মারমেইডের মূর্তিটা তো তেমন আহামরি কিছু না! তবু এটা দেখবার জন্যই কেন এত মানুষের ভিড় হয়! ফেরদৌস নিজের মনেই বলল।

-তাও তো ছবি তুলতে এত ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলে যে, বাস মিস করেছ!

সবাই হাসছে। আসলে মনে হয় সবার মনের ভেতরেই লিটল মারমেইডের একটা ছবি আঁকা থাকে। সেই ছবির সাথে না মিললেই আশাভঙ্গের বেদনা থেকে স্ট্যাচুকে আর ভালো লাগতে চায় না। তা ছাড়া আমাদের মুসলিম সংস্কৃতি ন্যুড মূর্তি মেনে নিতে অবচেতন মনেই হয়তো বাধা দেয়। ছোটবেলায় এই রূপকথার গল্পটি আমার মনেও সুন্দর একটি ছবি এঁকে রেখেছিল। তার পরও মূর্তিটিকে ভালোই লাগে। এটি তৈরি ও স্থাপন করেছিলেন কার্ল জ্যাকবসেন, যিনি কোপেনহেগেনের রয়েল থিয়েটারে যে ব্যালে হতো, তার অন্ধ ভক্ত ছিলেন। যখন লিটল মারমেইডের মূর্তি তৈরি করতে মনস্থ করলেন তখন সেই ব্যালেতে যিনি লিটল মারমেইডের ভূমিকায় নাচতেন তাকেই মডেল করবেন বলে ঠিক করলেন। কিন্তু ব্যালেরিনা ন্যুড স্ট্যাচুর মডেল হতে কিছুতেই রাজি হননি। তবে প্রচুর অর্থেও বিনিময়ে তার মুখমণ্ডল আর মাথা ব্যবহারে সম্মতি দেন। ভাস্করের স্ত্রী হলেন লিটল মারমেইডের দেহের মডেল।

১৯১৩ সালের আগস্ট মাসে একে উন্মুক্ত করা হয়। তবে সেই ব্যালেরিনার মাথাটি কিন্তু আর নেই। রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বহু ধরনের হামলার শিকার হতে হয়েছে এই লিটল মারমেইডকে। ১৯৬৪-তে এর মাথা চুরি যায়, যা আর কখনো ফেরত পাওয়া যায়নি। প্রতিবারই একে মেরামত করে পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়াও অনেকবার এর হাত নয়তো মাথা চুরির চেষ্টা হয়েছে বা চুরি গেছে। কখনো রং ঢেলে, কখনো কুপিয়ে, কখনো গলা কেটে একে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা হয়েছে। ২০০৩-এ একে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যা পওে হারবারের পানিতে পাওয়া যায়। ২০০৪-এ তুরস্ক যখন ইউরোপীয় ইউনিয়নে ঢোকার আবেদন জানায়, তখন লিটল মারমেইডকে বোরকা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রতিবাদ হিসেবে। ২০০৭-এর মে মাসেও একে হিজাব ও বোরকা পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপরও লিটল মারমেইডের জনপ্রিয়তা কমেনি। পৃথিবীর অনেক শহরেই এর রেপ্লিকা স্থাপিত হয়েছে। এ তালিকায় মিশিগান, ক্যালিফোর্নিয়া, আইওয়া, মাদ্রিদ, রোমানিয়া, কানাডার ক্যালগরিও রয়েছে। এর পেছনের কারণ বোধ করি হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের কালজয়ী রূপকথাটি। এর সার্বজনীন আবেদন দেশ-কালকে অতিক্রম করে গেছে অনেক আগেই।

অনেক আগের পড়া রূপকথাটি মনে পড়ে গেল নিজের অজান্তেই। সাগরতলে পাতালপুরীর রাজার মেয়ে ছিল লিটল মারমেইড। তারা ছিল তিন বোন। সবার ছোট লিটল মারমেইড। বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর জন্মদিনে মৎস্যকন্যারা পৃথিবী দেখবার জন্য সাগরের উপরে উঠবার অনুমতি পেত। বড় বোনদের কাছে সেই গল্প শুনে শুনে অধীর আগ্রহে লিটল মারমেইড অপেক্ষা করছিল পৃথিবী দেখবার। অবশেষে অনুমতি পেল সে। সাগরের উপরে উঠে এক রাজকীয় বজরায় এক অচেনা রাজপুত্রকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তার প্রেমে পড়ল লিটল মারমেইড। বজরাটি ঝড়ের কবলে পড়ে রাজপুত্রের ডুবে মরার উপক্রম হলে সে তাকে উদ্ধার করে কাছেই এক মন্দিরে রেখে আসে। মন্দিরে আগত একটি মেয়ে তার সেবা-শুশ্রূষা করলে চেতনা ফিরে পেয়ে রাজপুত্র ভাবে, এই মেয়েটিই তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। দূও থেকে লিটল মারমেইড দেখে সবই। হায়! তার তো পা নেই। কী করে সে রাজপুত্রের কাছে পৌঁছাবে! দিনের পর দিন সাগরে ভেসে নীরবে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে দেখে তার প্রেমাস্পদকে। অবশেষে বিচ্ছেদের জ্বালা সইতে না পেরে সাগরতলের ডাইনি বুড়ির কাছে তার অপরূপ জাদুভরা কণ্ঠ আর লেজের বিনিময়ে মানুষের মতো পা গজানোর ওষুধ সংগ্রহ করল। সেই ওষুধে পা গজালো বটে, কিন্তু শর্ত ছিল– রাজপুত্র যদি তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় তবে তার একটি চুম্বনেই সে পুরোপুরি মানুষ হতে পারবে। রাজপুত্র যদি অন্য কাউকে বিয়ে কওে তবে সে পরিণত হবে সমুদ্রের ফেনায়। মানুষের মতো পায়ে হাঁটতে গেলে লিটল মারমেইডের প্রচণ্ড যন্ত্রণা হতো। মনে হতো, কাচের ভাঙা টুকরোর উপর দিয়ে হাঁটছে। মানুষ হয়ে প্রেমাস্পদের সাথে মিলিত হবার বাসনা তাকে সব কষ্ট সইবার শক্তি দিত। রাজপুত্রের সাথে তার প্রেম হলো। কিন্তু রাজা-রানী যখন এক রাজকুমারীর সাথে রাজপুত্রের বিয়ে ঠিক করলেন তখন রাজপুত্র

জানাল, তাকে যে মেয়ে পানি থেকে তুলেছিল তাকেই বিয়ে করতে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তখন জানা গেল, রাজকন্যাই সেই মন্দিরের মেয়ে, লেখাপড়া শেখার জন্য তাকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল। এই কথা জেনে রাজপুত্র তাকে বিয়ে করতে রাজি হলো। লিটল মারমেইড তীব্র হতাশা আর বেদনায় আচ্ছন্ন হলো। সে কিছুতেই রাজপুত্রকে জানাতে পারল না– সেই তাকে উদ্ধার করেছিল। লিটল মারমেইডের বোনেরা সেই ডাইনির কাছ থেকে মন্ত্রপড়া ছুরি এনে দিয়ে বলল, এই ছুরি দিয়ে রাজপুত্রকে হত্যা করে তার তাজা রক্ত নিজের পায়ে ফেলতে পারলেই লিটল মারমেইড তার আগের লেজ ও জীবন ফিরে পাবে। রাজপুত্রকে হত্যার বদলে লিটল মারমেইড নিজেই সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফেনায় পরিণত হলো। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসনের গল্প বলার যে অনবদ্য গতি আর কাব্যিক মোহাচ্ছন্নতা, তা আমার বর্ণনায় পাবেন না। যারা তার আস্বাদ পেতে চান তাদের মূল গল্প পড়ার আহ্বান জানাচ্ছি। যদিও এই রূপকথাটি পড়েননি এমন মানুষ কমই আছে পৃথিবীতে। এটি অবলম্বনে বহু নাটক, সিনেমা ও অ্যানিমেশান চিত্র তৈরি হয়েছে।

মালমো ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। আজ রাতে আমাদের ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত সেই বাঙালি ছেলেটি আর মেয়েটির ডরমিটরিতে ডিনারের দাওয়াত। হোটেলের লবিতে ওরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। খুব বেশি দূরে নয় বলে সবাই হেঁটেই চললাম। সারাদিনে কম হাঁটাহাঁটি হয়নি। আমার নাজুক হাঁটু দু'খানি আর চলতে চাইছিল না। প্রচণ্ড ব্যথা তো করছিলই; হাঁটতেও অসুবিধা হচ্ছিল। সবাই হাসিগল্পে মশগুল। আমি সবার পিছনে পড়েছি। বাধ্য হয়ে ফারজানা আমার সাথে সাথে চলেছে।

ভেবেছিলাম, এত নামকরা ইউনিভার্সিটির ডর্ম না জানি কেমন হবে! তেমন আহামরি কিছুই না। তবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা আছে। প্রত্যেকের আলাদা রুম। একটি সিঙ্গেল খাট এক পাশে; ওয়ার্ডরোব, পড়ার টেবিল, চেয়ার আর একপাশে। একটা টু সিটার। এক চিলতে রান্নাঘরে বার্নার ফ্রিজ সিঙ্ক, সবই আছে। তবে একজন ঢুকলে আরেকজনের জায়গা হয় না। কাজেই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনো সাহায্য করা গেল না। তা ছাড়া ওরা দু'জনেই নিজেদের রান্নার কেরামতি দেখাতে উদগ্রীব। বুঝলাম, রান্নাবান্নার কেরামতি তারা এই সুদূর মালমোতে এসেই শিখেছে। ফারজানা যদিও বিবাহিতা, কিন্তু রান্না শেখা মনে হয় দেশে থাকতে হয়নি। মনে পড়ল, ওর বয়সে আমি রান্নার র-ও জানতাম না। আরও কয়েকটি ছেলে ঘরে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। রফিক পরিচয় করিয়ে দিল সবার সাথে। আমাদের অনারে আজ ওদেরও দাওয়াত। অল্পবয়সী ছেলেপুলে সব। দু'জন ইন্ডিয়ান, একজন পাকিস্তানি, ফিলিপিন্সের একজন। সব মিলে ১২/১৩ জন। অনেকক্ষণ ধরে রান্নাই হচ্ছে।

ফারজানা বলেছিল, সব রান্না শেষ। আমরা গেলে শুধু সালাদ বানাবে আর ভাত রান্না করবে। সারাদিনের পরিশ্রম, হাঁটাহাঁটি মিলিয়ে যেমন ক্লান্তি লাগছিল, তেমন ক্ষিদেও পেয়েছিল। ভাত আর হয় না। ভাত হতে যে টাইম লাগে, তা অনেক আগেই

পেরিয়ে গেছে। সন্দেহ হলো। রান্নাঘরে গেলাম বিষয়টা কী, জানতে। চুলার উপর চাপানো হাঁড়িতে চাল ফুটছে টগবগ করে। তার সাইজ দেখেই সকল রহস্য নিমিষে উদ্ঘাটিত হলো। পাত্রটিতে বড় জোর তিনজনের আন্দাজ ভাত ধরবে। তাই তারা বার বার রান্না করছে। আরও জানলাম, একই পদ্ধতিতে তরকারিও রান্না হয়েছে। সুদূর মালমোতে অতিথি আসবে কোথা থেকে! তাও আবার পাঁচজন? তাদের হাঁড়ি-পাতিল সবই একজন আন্দাজের। এমনকি প্লেট-বাসনও আশপাশের রুম থেকে ধার করা।

আমরা ডাল-ভাত, আলুর ভর্তা খেতে চেয়েছিলাম। ঐগুলোর সাথে আছে মুরগি আর সবজি। তবে ভাতের মাড় কীভাবে ঢালে, এ নিয়ে আমার কিছুটা শঙ্কা ছিল। আমি নিজেও এ কাজে বিশেষ পারঙ্গম নই, আর এরা দু'জন বিশেষ করে রফিক কী করে পারবে– ভেবে ভয় পাচ্ছিলাম। দেখলাম, আমার চেয়েও সুন্দর করে রফিক মাড় ফেলল। তবে মূল্যবান একটা উদ্ভাবনী পরামর্শ দিতে ভুললাম না। বললাম, সুপার মার্কেটে রান্নার তৈজসপত্রের কর্নারে হাতলওয়ালা বড় বড় তারের ঝাঁঝরি মতো পাওয়া যায়, যেগুলো রেস্টুরেন্টে ডিপ ফ্রাই করতে ব্যবহৃত হয়। তার একটি সাইজমতো কিনে নিয়ে ভাত রান্না করে তাতে ঢেলে দিলেই চলবে। মাড় গালবার ঝামেলা গেল। ফারজানা বলল, তাই তো! খুব ভালো বুদ্ধি দিয়েছেন আপা। তখন বুঝলাম, এ কাজে সে আমার মতোই আনাড়ি। আরও বুঝলাম এই জন্য, রফিক পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও ফারজানাকে না ডেকে নিজেই এই কঠিন কাজটি করছিল।

সুইডেনে আসার পর এই প্রথম আমরা বাংলাদেশি স্টাইলে বাংলাদেশি মেন্যুতে বাংলাদেশি সময়ে ডিনার করলাম। অর্থাৎ কিনা রাত ১০টায়। ইতোমধ্যে অনেকক্ষণ আরাম করে বসে থেকে আমার পায়ের ব্যথ্যা কমে সহনীয় মাত্রায় পৌঁছেছিল। কাজেই পরস্পর বিদায় নিয়ে যখন ফিরছি, আমি আগের মতোই চাঙ্গা। ব্যাপারটি খেয়াল কওে ফেরদৌস না কে মনে নেই মন্তব্য করল, আপা মনে হয় ক্ষিদেয় কাতর হয়ে ছিলেন। আসার সময় সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। অথচ এখন উনার হাসিই বেশি শোনা যাচ্ছে। কিছু বললাম না। খামোখা নিজের অকর্মা হাঁটুর খবর বলে ব্যতিব্যস্ত করার কী দরকার! রাস্তায় নেমে সুনসান নীরবতা দেখে ভয় হলো। দুই-একটা গাড়ি হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ছে। ইউরোপ তো জানি রাতে জেগে থাকে। আমাদের হাজার বারণ সত্ত্বেও রফিক আর ফারজানা আমাদের সাথে সাথে এগিয়ে দিতে এসেছিল। ওরা বলল, এখানে হাইজ্যাক বা বর্ণবিদ্বেষী কোনো ঘটনা ঘটে না। পকেটমারের ভয় নেই। কাজেই নিশ্চিন্তে চলে যান। ভয়ের কোনোই কারণ নেই।

ওয়ার্ল্ড মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির চৌহদ্দি শেষ হয়ে চৌরাস্তার মোড় পর্যন্ত এসে জোর করে রফিক আর ফারজানাকে ফেরত পাঠানো গেল। তার পরের কাহিনী খুব সোজা-সরল। হোটেলে ফিরে বাক্সপেটরা গুছিয়ে ঘুম দাওরে, সকালে ওঠোরে, এয়ারপোর্টে পানে ছোটরে, প্লেনে ওঠোরে-নামোরে, বাসায় যাওরে। সে গল্প কেউ শুনতে চাইবে বলে মনে হয় না। তাই আমার নটে গাছটি এখানেই মুড়োলো।

গাজী-কালু-চম্পাবতী

ড.ডি.এম. ফিরোজ শাহ্

গাজী-কালু ও চম্পাবতীর নাম বাংলাদেশের বাউল, সাধক, পীর-ফকির ও অধ্যাত্মবাদীদের কাছে খুবই জনপ্রিয়। ছোটবেলায় গল্পের ছলে বা কিচ্ছা-কাহিনীতে এসব কথা খুব শুনতাম। বড় হয়ে, কিছুটা পড়াশোনা করে জানতে পারি, ঘটনার ঐতিহাসিকতা থাকলেও বর্ণিত ঘটনায় সত্য তথ্যের চেয়ে আবেগি কল্পকাহিনীতে ভরা। দেশের অনেক স্থানে যেমন বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলায় গাজী-কালু ও চম্পাবতীর মাজার রয়েছে বলে জানা যায় এবং আমি সেটি পরিদর্শনও করেছি। তবে গাজী-কালু ও চম্পাবতীর মাজার ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজারের পূর্ব পাশে রয়েছে বলে সকলে মনে করেন।

২০২২ সালের জুন মাসের এক মাঝ দুপুরে তিন ভূগোলবিদ আমি, মাহমুদ হাসান ও মোখলেসুর রহমান রওয়ানা হলাম চতুর্থ ভূগোলবিদ শেখ মনিরুল ইসলাম আলমগীরের আমন্ত্রণে, যিনি ওখানকার জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা। রাত ৮টায় ঝিনাইদহ শহরে পৌঁছে তার আতিথ্য গ্রহণষ করে পরদিন রওয়ানা হলাম কাঙ্ক্ষিত গাজী-কালু ও চম্পাবতীর মাজার পরিদর্শনে। এ যাত্রায় আমাদের সাথী হলেন বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম। ঝিনাইদহ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার সরকারি বাহনে চেপে যশোর রোড ধরে ৮ কিলোমিটার গেলে বারোবাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এটি জেলায় আইসিটি ও নানা উদ্ভাবনী কাজ করে দেশব্যাপী সাড়া ফেলেছে, যার মূল কারিগর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম। বিদ্যালয়টি এক পাক ঘুরে চা-নাশতা খেলাম।

ঝিনাইদহ জেলার ইতিহাস থেকে জানা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যশোর শহর থেকে ১১ মাইল উত্তরে বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার অন্তর্গত কালীগঞ্জ উপজেলার ঐতিহাসিক বারোবাজার অঞ্চলে যে সকল আধ্যাত্মিক সাধক ইসলাম প্রচারে অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে গাজী, কালু ও চম্পাবতী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বারোবাজার ইউনিয়নের বাদুরগাছা গ্রামে তাদের মাজার। ঝিনাইদহ থেকে বাস অথ বা অটোরিকশায় এ মাজারে যাওয়া যায়। আমরা প্রধান সড়ক ধরে একটু পিছনে এসে ডান দিকে গ্রামীণ সরু পথে ঢুকে পড়লাম। আঁকাবাঁকা রাস্তায় খানিকক্ষণ পাজেরো চলার পর বটবৃক্ষতলের একটি গেটে এসে থামল। সাদামাটা একটি গেট, চন্দ্রাকৃ তি গেটের উপরে মার্বেল পাথরে খোদাই করা 'শাহ গাজী কালু চম্পাবতীর মাজার শরীফ'। পকেট গেটের ডানে ও মূল গেটের সাথে নির্দেশনা– 'জুতা খুলে প্রবেশ করুন'। উপরে রয়েছে একটি চলমান ডিজিটাল সাইনবোর্ড। কোনো ভক্ত বা দর্শনার্থী নেই। অলসভাবে শুয়ে থাকা কয়েকটি নেড়ি কুকুর আলস্য নিয়ে তাকিয়ে তাচ্ছিল্যেও সাথে আমাদের স্বাগত জানাল।

শাহ গাজী কালু চম্পাবতীর মাজারের বটগাছের গোড়া যেখানে ভক্তরা নানা মনবাসনা পূরণে সুতা বেঁধেছেন

চার ভূগোলবিদ- মোখলেসুর রহমান, লেখক, শেখ মনিরুল ইসলাম আলমগীর ও মাহমুদ হাসান

জনশ্রুতি, বিরাট/বৈরাগ নগরের শাসক দরবেশ শাহ সিকান্দারের পুত্র শাহ গাজী। কালু হলেন শাসক সিকান্দারের পোষ্য পুত্র। পালিত ভাই কালু অত্যন্ত ভালোবাসতেন শাহ গাজীকে এবং সর্বত্র তাকে অনুসরণ করতেন। অন্যদিকে চম্পাবতী ছিলেন পার্শ্ববর্তী সাপাই নগরের সামন্ত রাজা রামচন্দ্র ওরফে মুকুট রাজার কন্যা। মুকুট রায় ঝিনাইদহ, কোটচাঁদপুর, বারোবাজারের পূর্ব এলাকা ও বেনাপোল অঞ্চলের সামন্ত রাজা ছিলেন। অন্যত্র তিনি রামচন্দ্র, শ্রীরাম বলে পরিচিত। রাজার চারটি বাড়ি ছিল– ঝিনাইদহের বাড়িবাথান, বারোবাজারের ছাপাইনগর (বর্তমানে বাদুরগাছা), কোটচাঁদপুরের জয়দিয়া বাওড়ের বলরামনগর ও বেনাপোলের কাগজপুরে।

গাজীর পরিচয় সম্পর্কে আরেকটি ঐতিহাসিক তথ্য প্রচলিত, যা ঘটেছে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে। হোসেন শাহের সময়ে (১৪৯৩-১৫৩৮) মুকুট রাজার শাসনকাল ছিল খানজাহান আলী পরবর্তী সময়ে সুলতান রোকনউদ্দীনের প্রধান সেনাপতি হিসেবে আসাম ও বাংলার বিভিন্ন অভিযানে তিনি অংশ নেন। সিলেট ও ঝিনাইদহের বিভিন্ন অঞ্চলে তার দরগা বা মাজার আছে। একদা শাহ গাজীর সাথে ছাপাইনগরের সামন্ত রাজা রামচন্দ্র ওরফে মুকুট রাজার মেয়ে চম্পাবতীর দেখা হয়। তারা একজন আরেকজনকে দেখে এতটা মুগ্ধ হন, গাজী ভুলে যান তিনি মুসলমান; চম্পাবতীও ভুলে যান তিনি হিন্দু রাজার মেয়ে। তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠল। তাদের মিলনের মাঝে দুর্ভেদ্য প্রাচীর হয়ে দাঁড়াল সামাজিক ও ধর্মীয় বাধা। রাজা তার সেনাপতিদের গাজী ও কালুকে শায়েস্তা করতে হুকুম দিলেন। ঘোর যুদ্ধে রাজা মুকুট রায়ের সেনাপতি দক্ষক্ষণা রায় পরাজিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে গাজীর অনুসারী হন। মুকুট রাজা বা রাজা রামচন্দ্র গাজীর বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে চম্পাবতীকে নিয়ে তার প্রধান বাড়ি ঝিনাইদহের বাড়িবাথানে চলে আসেন। গাজীও তাকে

অনুসরণ করেন। ঝিনাইদহে গিয়ে গাজী রাজার সেনাপতি গয়েশ রায়ের প্রমোদ ভবন জালিবল্লা পুকুরপাড়ে কদমতলীতে ছাউনি ফেলেন। এখানেও গাজীর মাজার দেখতে পাওয়া যায়। নিরুপায় রাজা মুকুট রায় কন্যা চম্পাবতীকে নিয়ে চলে যান জয়দিয়া বাওড়ের বাড়িতে। জয়দিয়ার বাওড় এক সময় ভৈরব নদের অংশ ছিল। বাওড়ের পূর্বপাড়ে ছিল রাজার বাড়ি। বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটার পূর্বে বলহর বাওড়, যা এক সময় কপোতাক্ষ নদের অংশ ছিল। দুই বাওড় তথা দুই নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত এই রাজবাড়ির গুরুত্ব অপরিসীম। দক্ষিণ পাশে বাওড়ের কূল ঘেঁষে তমাল গাছের নিচে আজও গাজীর দরগা বিদ্যমান।

চম্পাবতীর প্রেমের টানে শাহ গাজী এখানেও ছুটে এসেছিলেন সঙ্গী কালুকে নিয়ে। বহু খণ্ডযুদ্ধের পর রাজা রামচন্দ্রের কাছ থেকে প্রেমিকা চম্পাবতীকে উদ্ধার করে শাহ গাজী বারোবাজার ফিরে আসেন। কিন্তু গাজীর পিতা শাহ সিকান্দার বিষয়টা মেনে নেননি। মুকুট রাজা ছিলেন শাহ সিকান্দারের প্রতিবেশী। হিন্দু সমাজের অসন্তুষ্টির কারণে তিনি গাজীকে বাড়ি উঠতে দেননি। বাধ্য হয়ে গাজী দরবেশের বেশে চম্পাবতীকে নিয়ে বাদা বনে বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গী হলো কালু ও দক্ষক্ষণা রায়। সুন্দরবনের বাদা বন বেশি দূরে ছিল না। নাভারণ, বেনাপোল, সাতক্ষীরা, বনগাঁ বাদা বন অঞ্চল ছিল। অসীম সাহসী গাজী আস্তানা গাড়লেন বাদা বনে। গরিব কাঠুরিয়ারা তার ভক্ত হলো। মৃত্যু পর্যন্ত তারা সেখানেই ছিলেন।

ভেতরে প্রবেশের পর বাম দিকে চোখে পড়ল দুটি দৃষ্টিনন্দন বটবৃক্ষ। পাকা বেদির উপর দাঁড়ানো বৃক্ষ দুটির গুচ্ছাকার গুঁড়ি। এর পর একটা অংশ পর্যন্ত সাদা চুনের প্রলেপ লাগানো। গুঁড়ির প্রতিটি শিকড়জুড়ে রয়েছে ভক্তদের মানত করা বিভিন্ন লেখা

শাহ গাজী কালু চম্পাবতীর মাজার শরীফের গেট ও স্মৃতিফলক

পলিথিন বা চিপসের প্যাকেটে লেখা। মানুষের মন যে কত বৈচিত্র্যময় তা মাজারে গিয়ে তাদের কর্মকাণ্ড দেখে বোঝা যায়।

৩টি মাজারের সামনে দক্ষিণ পাশে রয়েছে একটি বড় বটগাছ। এখনে হিন্দু-মুসলিম ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ রোগমুক্তি বা অন্য কোনো আশায় মানত করে। বটগাছের লতায় বেঁধে দেয় পলিথিন। প্রতি বছর ফাল্গুন মাসের শেষ বৃহস্পতিবার বসে মেলা বা ওরস। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে জড়ো হয়। সামনে একটি একতলা ভবনের ভেতরে রয়েছে তিনটি কবর যা গাজী-কালু-চম্পাবতীর মাজার নামে খ্যাত। মাঝখানে বড় কবরটি গাজীর, পশ্চিমেরটি কালুর এবং পূর্বের ছোট কবরটি চম্পাবতীর বলে জনশ্রুতি। মাজার সন্নিহিত দক্ষিণ-পশ্চিমে একটি প্রাচীন বটগাছ। এই বটগাছের তলদেশে একটি শূন্যস্থান দেখা যায়। এটিকে অনেকে কূপ কিংবা অন্য কোনো কবর বলে মনে করেন।

১৯৯২ সালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসন কবর তিনটি বাঁধাই করে বেষ্টনী ও খাদেমদের থাকার জন্য সেমিপাকা টিনশেড তৈরি করেছে। এখানে গাজী-কালু-চম্পাবতীর সাথে দক্ষক্ষণা রায়ের কবরও রয়েছে। এ ছাড়াও প্রতি বছর এখানে ওরস ও মেলা বসে। প্রতিনিয়ত এখানে ভক্ত-সাধক ও দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটক আসেন। গাজী-কালু- চম্পাবতীর মাজারের উত্তর পাশে রয়েছে শ্রীরাম রাজার দীঘি। চারপাশে পানি, মাঝখানে ছোট দ্বীপ। দ্বীপটির বৃক্ষরাজির ছায়া পানিতে অসম্ভব সুন্দর এক প্রতিবিম্বের সৃষ্টি করেছে, যা খুবই নান্দনিক। গাজী ও চম্পাবতীর গভীর প্রেম এবং পালিত ভাই কালুর আনুগত্যের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের পরবর্তী গন্তব্য এশিয়ার সর্ববৃহৎ বটবৃক্ষ দর্শনে চার ভূগোলবিদ বের হলাম।

মাল্টা: মদিনা থেকে রাবাত

ফরিদুর রহমান

'মনে বড় আশা ছিল যাব মদিনায়...' আব্দুল আলীমের কণ্ঠে কবি জসীম উদ্‌দীনের লেখা বহুবার শোনা এই গান আশৈশব মনের ভেতরে গাঁথা ছিল। শেষ পর্যন্ত একদিন সত্যিই পৌঁছে গেলাম মদিনায়। তবে নাম শুনলে প্রথমেই যেমনটা মনে হয় মরুময় আরবের পবিত্র নগরী মদিনার কথা, এই মদিনা সেই মদিনা মুনাওয়ারা নয়। এ শহরে উটের কাফেলা নেই। নেই সারি সারি খেজুর গাছ; নবী-রাসুল (সা.) এর কোনো পদচিহ্ন পড়েনি এই শহরে। পাথরের শক্তিশালী দেয়াল দিয়ে ঘেরা মাত্র শূন্য দশমিক ৯ বর্গকিলোমিটারের ছোট্ট দুর্গ নগরীর সাথে আমাদের স্বপ্নের শহর মদিনার কোনো সম্পর্ক নেই। মাল্টার বর্তমান রাজধানী ভ্যালেটা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে দেশটির প্রায় কেন্দ্রভূমিতে পুরোনো, আসলে পরিত্যক্ত রাজধানী মদিনা।

মাল্টায় আমাদের সংক্ষিপ্ত সফরে পান্থনিবাস ছিল সেইন্ট জুলিয়ানের ফ্লেমিংগো হোটেল। রিসেপশনের

ফিলিপিনো মেয়েটি এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়েছিল মদিনা: বাস নম্বর ২০২! ডাইনে বেরিয়ে মোড় থেকে বাঁয়ে ঘুরলেই বাসস্ট্যান্ড। আমরা পৌঁছাবার একটু আগেই একটা বাস চলে গেছে। শনিবার বলে পরের বাস আসবে আরো ২০/২৫ মিনিট পর।

ফুটপাথে বেশ লম্বা লাইন পড়ে গেছে। অন্য রুটের একটা বাস আসায় কিছু যাত্রী চলে গেলেও লাইন লম্বা হচ্ছে। বেশ রোদ উঠেছে। জ্যাকেট পরে গরমই লাগছে। এরই মধ্যে আমাদের দেশের মুড়ির টিনের মতো একটা বাস এসে দাঁড়াল। বাসের নাম জব্বার, গন্তব্য লেখা রাবাত, মদিনা ও ভ্যালেটা। আমরা মদিনার যাত্রী, কিন্তু এটার নম্বর তো ২০২ নয়। দরজার কাছে এগিয়ে জিজ্ঞেস করতে যাব, এরই মধ্যে একজন জানতে চাইলেন, এটা কি ২০২? বৃদ্ধ রসিক ড্রাইভার উত্তর দিলেন, দিস ইজ সামথিং লাইক টু জিরো টু। আমি সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, এই বাস কি আমাদেও মদিনা নিয়ে যাবে?-'ননস্টপ! সরাসরি মদিনায় পৌঁছে দেবে।' দ্রুত উঠে পড়লেও ড্রাইভারের সামনের টিকেট মেশিনে কার্ড পাঞ্চ করে টিকেট হাতে পেতে পেতেই আরো দুজন যাত্রী টপাটপ উঠে পড়ল। ফলে বসার জায়গা পাওয়া গেল না। পেছনের দিকে একটা সিটে আমি শেষ পর্যন্ত বসে পড়তে পারলেও আমার সফরসঙ্গীকে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। সামনে আরো একজন ঘাড় কাত করে দাঁড়িয়ে ছিল। বেচারার মাথা ছাদ ছুঁয়ে যাচ্ছিল।

মুড়ির টিন বাসের ভেতরটা ছোট হলেও দু'পাশের দুই দুই চার সিটের বসার ব্যবস্থা ভালো। বড় জানালাগুলোর কাচের ওপাশে দৃশ্য পরিবর্তিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। পাশে বসা হাফ প্যান্ট পরা লোকটি আমার জ্যাকেট দেখে বললেন, তোমার গরম লাগছে না? বললাম, আমরা গরমের দেশের লোক, ঠাণ্ডা ভীষণ ভয় পাই। তাই শীতের যাবতীয় প্রস্তুতি নিয়ে বের হয়েছি। পথের পাশে সরিষা ফুলের মতো হলুদ ফুলে ছাওয়া ক্ষেত পার হয়ে যাচ্ছিল। হলুদ ফুলের ক্ষেতগুলো সরিষা নয়; রেপসিড নামে এক ধরনের তেলবীজ। আর লালগুলো সম্পর্কে সহযাত্রীর মত, এগুলো নেহায়েত আগাছা।

এত সুন্দর ফুলের সমারোহ কেবলই আগাছা! উঁচু-নিচু পাহাড়; পাথরের সীমানা দেয়াল দিয়ে ঘেরা চাষের জমি আর সুদৃশ্য আগাছার লাল-সবুজ মাঠ পার হয়ে বাদামি রঙের বাড়িঘরের আভাস দেখা দিলে বুঝলাম, আমরা মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। হাতের বাঁ দিকে কয়েকটা রেস্টুরেন্ট, ডান দিকে ভাস্কর্যে সাজানো নগর কেন্দ্রের একটি চত্বর। টার্কিশ কাবাব সাইনবোর্ড দেখে ভেবে রাখলাম, লাঞ্চটা এখানেই সারা যেতে পারে। চত্বরটা ঘুওে ভিন্টেজ বাস থেমে গেল বাসস্ট্যান্ডে। ড্রাইভার মনে করিয়ে দিল, এখান থেকে ফেরার জন্য দুটি ট্রিপ; একটা দুপুর দেড়টায় আরেকটা বেলা সাড়ে ৩টায়। এই বাসে ফিরতে চাইলে সময়মতো চলে এসো। বললাম, সে জন্য কি আবার টিকেট কিনতে হবে? একগাল হেসে বলল, ফিরে যেতে চাইলে রিটার্ন টিকেট কিনতে হবে। আর ভূতুড়ে শহরে রাতটা থেকে যেতে চাইলে ভিন্ন কথা।

ভাস্কর আন্তন আগিয়াস

মদিনার ইতিহাস প্রায় চার হাজার বছরের পুরোনো। ধারণা করা হয়, সমুদ্রতীর থেকে বেশ দূওে মাল্টার এই এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠেছিল প্রাগৈতিহাসিক কালে। কিংবদন্তি অনুসারে মাল্টার সুরক্ষিত মধ্যযুগীয় মদিনা এবং রাবাত যে এলাকায় অবস্থিত, ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ সেইন্ট পল জাহাজডুবির সময় সেখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। স্বয়ং ঈশ্বর তার প্রতিনিধিকে সাগরজলে নাকানি-চুবানি খাইয়ে তার পর পাহাড়ি জনপদে এনে ফেলেছিলেন। অতএব সেইন্ট পল মহোদয়ের জন্য একটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তিনি যে আগে থেকেই করে রেখেছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

মদিনা গেট নামের সুদৃশ্য তোরণ পার হয়ে ভেতরে ঢুকতেই আমরা ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে কয়েকশ' বছর পেছনে চলে যাই। পাথুরে দেয়াল আর সরু গলিপথ ধরে পায়ে পায়ে এগোতে থাকি। ইতিহাসের তথ্য অনুসারে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে ফিনিশীয়দের কলোনি স্থাপনের মধ্য দিয়ে হয়েছিল মদিনা নগরীর গোড়াপত্তন। ফিনিশীয়, রোমান, আরব এবং নাইটস অব সেইন্ট জোনস কয়েকশ' বছরের বিভিন্ন সময়ে এই নগরে কর্তৃত্ব করেছে। আরব শাসনকালে এই শহরের নাম রাখা হয় মদিনা। সেই কবে কোন শৈশব থেকে কত হাজারবার শুনেছি মক্কা-মদিনার কথা! কিন্তু আরবি 'মদিনা' শব্দের আক্ষরিক অর্থ যে 'শহর', তা মাল্টার এই মদিনায় না এলে হয়তো কখনো জানাই হতো না।

বর্তমানের ক্ষুদ্র এই দুর্গ নগরী গ্রিক ও রোমানদের সময়ে বেশ বিস্তৃত ছিল। ৮৭০ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে আরবরা মাল্টা দখল করে নেয়। তখনই নগরীর নাম রাখা হয় মদিনা এবং মুসলিম শাসকরা প্রশাসনিক ও সামরিক কেন্দ্র

হিসেবে গড়ে তোলে এই নগরী। দুশ’ বছরের বেশি সময় ধরে মুসলিম শাসনের সময় আরবি ছিল এদেশের প্রশাসনিক ভাষা। ফলে বর্তমানের মাল্টিজ ভাষায় রয়েছে আরবি, ইতালীয় ও ইংরেজির সংমিশ্রণ।

অপরিসর সড়কের দু’পাশে ভবনগুলোর রঙিন দরজা আর গলির মাথা বা পথের কোণে সুন্দর ভাস্কর্যগুলো ছাড়াও যা চট করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা হলো দরজার হাতল। প্রতিটি দরজায় নানা প্রতিকৃতির, বিভিন্ন ধরন এবং নানা আকারের ধাতব হাতল কড়া বা নকার দরজা বা গলিপথের সৌন্দর্যে যুক্ত হবার সাথে সাথে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে, যা ইউরোপ বা বিশ্বের অন্য কোথাও আমার চোখে পড়েনি। সঙ্কীর্ণ সড়কপথের মাঝে মাঝেই বৃক্ষ-লতার দেখা পাওয়া যায়। কোথাও পথের পাশে লাগানো গাছের সারি, কোথাও বড় বড় টবে রঙিন ফুল বা বাহারি পাতা, আবার কোথাও ঝুল বারান্দা থেকে ঝুলে পড়েছে পুষ্পগুচ্ছ কিংবা সবুজ লতাগুল্ম। চারপাশে অসাধারণ রঙিন পাতার গাছপালা এবং ছোট ছোট ঝোপঝাড় পথের দূরত্ব ভুলিয়ে দেয়।

১১ শতকের শেষ দিকে সিসিলির নরম্যান শাসকরা মুসলিমদের হটিয়ে মদিনা দখল করে নেয়। শদেড়েক বছর মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির কিছুটা প্রভাব থাকলেও ধীরে ধীরে মুসলমানদের জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে এবং বাদ বাকিদের বিতাড়িত করার মধ্য দিয়ে মুসলিম আধিপত্য পুরোপুরি বিলুপ্ত করা হয়। বর্তমানে এখানে মসজিদ, মাদ্রাসা বা ইসলামী ক্যালিগ্রাফির কোনো চিহ্ন নেই। দুটি গির্জা, দেয়াল বা গলিপথের মোড়ে যিশু খ্রিস্ট, মা মেরি এবং অন্যান্য সাধু-সন্তের মূর্তি, ম্যুরাল, ভাস্কর্য

মদিনার অভ্যন্তরে একমাত্র বাহন

মদিনার গলিপথ

দেয়ালচিত্র মিলিয়ে এটি পরিপূর্ণ একটি খ্রিস্টান অধ্যুষিত শহর। নগরীর স্থাপত্যশৈলী বারোক এবং মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের মিশ্রণ ইওরোপের আর কোথাও দেখা যায় না।

মদিনার পরিচিতি এখন নীরব শহর হিসেবে। বিশ্বের সবচেয়ে জনাকীর্ণ জীবন্ত দুর্গনগরী জয়সালমিরের স্থায়ী জনসংখ্যা সাড়ে তিন হাজারের মতো। আর আজকের মদিনা শহরে বাস করে মাত্র আড়াই থেকে তিনশ’ মানুষ! এক সময়ের জমজমাট রাজধানী প্রথমে ভিট্টিওসায় এবং আরো পওে ভ্যালেটাতে স্থানান্তরিত হবার পর মদিনা প্রায় জনবসতিহীন হয়ে পড়েছিল। তখন ভূতের শহর হিসেবে বিবেচিত এই নগরীর নামই হয়ে যায় ‘নীরব শহর’। এখনো কোনো জনশূন্য গলিপথে দু’চাকার সাইকেল আরোহী ঘণ্টি বাজালেও পর্যটক চমকে ওঠেন। কখনো নিজের পায়ের জুতার শব্দও নিজের কানে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসে। শহরের গলিপথ এতটাই সরু যে, বৃষ্টির দিনে দু’জন পর্যটক ছাতা মেলে ধরে একেজন অন্যজনকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারবেন না। এখন অবশ্য পর্যটকের পদচারণায় দিনব্যাপী ব্যস্ত থাকে মদিনা। তবে নগরদুর্গের দেয়ালের ভেতরে নীরবতার একটা শান্ত-সমাহিত পরিবেশ পাওয়া যায়। জরুরি পরিষেবার বাহন ও অভ্যন্তরের স্থায়ী বাসিন্দাদের গাড়ি ছাড়া প্রাচীর সীমানার ভেতরে যন্ত্রচালিত যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ।

পাথরে বাঁধানো গলি এবং দু’চারটি প্রশস্ত সড়কসহ দর্শনীয় জায়গাগুলো ঘুরে দেখবার জন্য ঘোড়ার গাড়ি চলে মদিনাজুড়ে। অশ্ব-শকটগুলো এই ঐতিহাসিক শহরের নান্দনিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে দিয়েছে। অভিজাত কিংবা বিলাসী পর্যটক অথবা চলাচলে

অক্ষম বয়োবৃদ্ধ অনেকেই নগর পরিভ্রমণের জন্য ঘোড়ার গাড়ি বেছে নিয়ে বেশ আয়েশি ভঙ্গিতে চলেফিরে বেড়াচ্ছেন।

দীর্ঘ পথ হাঁটতে আমাদের সমস্যা থাকলেও পকেটের অবস্থা বিবেচনা করে চরণযুগল ভরসা করেই ঘুরে বেড়িয়েছি মদিনার অলিগলি। সুদৃশ্য ঝুল বারান্দাসহ দু'পাশের সারি সারি প্রাচীন ভবনের ভেতর দিয়ে কয়েকটি সরু গলি পেরিয়ে প্রথম যে চত্বরে এসে পৌঁছলাম, সেটি সম্ভবত মদিনার সবচেয়ে জনপ্রিয় জায়গা; ১২ শতকে নির্মিত প্রধান গির্জা সেইন্ট পলস ক্যাথেড্রাল। জাহাজডুবি থেকে ঈশ্বরের কৃপায় বেঁচে যাওয়া এই সন্তের নামে যে উপাসনালয় তার চূড়াটি মনে হয় বিশাল একটি চিত্রিত কেক। নানা দেশের পর্যটক চারদিকের এই সুদৃশ্য ভবন ও গির্জার ছবি তোলায় ব্যস্ত। ক্যাথেড্রালের সামনের খোলা জায়গায় কয়েকটা বেঞ্চ পাতা। রোদের তাপ যথেষ্ট বেড়েছে। অনেকটা হেঁটে পা ধরে এসেছিল বলে পানির বোতল খুলে বেঞ্চে বসে পড়লাম। গির্জার প্রবেশদ্বার, দেয়াল, ভাস্কর্যসহ ১৭ শতকের বারোক শৈলীর মনোমুগ্ধকর স্থাপত্যেও প্রশংসা না করে পারাই যায় না। ক্যাথেড্রাল এবং জাদুঘরের প্রবেশমূল্য ১০ ইউরো। ক্যাথেড্রালের অভ্যন্তরে দৃষ্টিনন্দন ভাস্কয, অসাধারণ বর্ণিল কারুকাজ ও ১৪ শতকের শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ জাদুঘর মদিনা পর্যটকদের অভিজ্ঞতায় অনবদ্য সংযোজন বলে বিবেচিত হবে।

অপ্রশস্ত গলি, পথের পাশে স্যুভেনির শপ ও কাফে রেস্তোরাঁর গোলক ধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে এক সময় মনে হতে পাওে, আমরা পথ হারিয়ে একই জায়গায় চক্কর খাচ্ছি। পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যস্ত দু'জনকে বেরিয়ে যাবার পথ দেখাতে বললে ভাষা বিভ্রাটের কারণে দু'জন দুই দিক দেখিয়ে দিল। একটা গলির মুখ থেকে বেরিয়ে একজন

মদিনার সেইন্ট পল ক্যাথেড্রালের পাশে

অভিজ্ঞ ট্যুর গাইডকে জিজ্ঞেস করলে সে হাসতে হাসতে উত্তর দিল, তোমরা সম্ভবত পুরো শহর দু'বার ঘুরে এসেছ। এখানে ইচ্ছে করলেও হারাতে পারবে না। এবার সে বেরিয়ে যাবার সোজা পথ দেখিয়ে দিলে সে পথে একটা স্যুভেনির শপে ঢুকে পড়লাম। টি-শার্ট, দেয়ালচিত্র, সিরামিকের জিনিস, ধাতব প্লেট, খেলনা ছাড়াও বিচিত্র সব স্মারক সামগ্রীতে সাজানো বিপণী কেন্দ্রগুলোতে কেনাকাটার বিরাম নেই।

আমরা যেখানে ঢুকেছিলাম সেই দোকানের সপ্রতিভ সেলস গার্ল এক টুকরো হাসি দিয়ে বলল, তোমরা নিশ্চয়ই ইন্ডিয়া থেকে এসেছ? বললাম– না। এই ভুলটা সকলেই করে। আমরা আসলে এসেছি বাংলাদেশ থেকে। এর পর সে নিজে থেকেই বলল, আমি তোমাদের প্রতিবেশী; ভারতের কেরালার মেয়ে। বললাম, গত বছর এই সময় আমরা মুন্নার, আলেপ্পি, থেক্কাডি থেকে ত্রিবান্দ্রাম পর্যন্ত চষে বেড়িয়েছি। তোমরা ত্রিবান্দ্রাম নাম বদলে কী যেন করেছ; উচ্চারণ করতে পারি না। সে হাসতে হাসতে বলল, থিরুভানাথাপুরাম! কিছুক্ষণ কথা বলে কেনাকাটা না করেই আমরা বেরিয়ে এলাম।

মদিনা ন্যাশনাল মিউজিয়াম হাতের বাঁয়ে রেখে যে গেট দিয়ে বেরিয়ে এলাম, সেটি ভিন্ন পথ। এদিক দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকিনি। এই পথের নিচের দিক দিয়ে উদ্যান ঘুরে এসেছি। এবার উপরের তোরণ দিয়ে বের হয়ে দেখলাম, একটা ছাউনিতে ঘোড়ায় টানা বাহনের বিশাল সমাবেশ। একে কি ঘোড়ার আস্তাবল বলব, নাকি বাসস্ট্যান্ডের মতো হর্সস্ট্যান্ড, বুঝতে পারলাম না। নামে কী আসে যায়! এটা আসলেই ঘোড়াগাড়ির আখড়া। নামে কিছু আসে যায় না বলেই বোধ হয় প্রায় হাজার বছর আগে মুসলিম শাসনামলে দেয়া মদিনা নামটি পরবর্তী শাসকদের কেউই এখন পর্যন্ত বদলাবার কথা ভাবেনি।

মূল সড়কে উঠে ডান দিকের বিস্তৃত উদ্যানের পাশ দিয়ে খানিকটা হেঁটে গেলেই বাঁয়ে নগর চত্বর। মাল্টার কয়েকজন কৃতী পুরুষের ভাস্কর্যে সাজানো স্কোয়ার ঘিরে বেশ কিছু রেস্টুরেন্ট এবং স্ট্রিটফুডের অস্থায়ী দোকান। অনুমানে বুঝলাম, টার্কিশ রেস্তোরাঁয় হালাল ডোনার কাবাব খেতে গেলে বেশ কিছুটা হাঁটতে হবে। অতএব সাহস করে কাছে-কূলে একটা অভিজাত রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। দুপুর বেলা ক্ষুধার্ত পর্যটকের ভিড়ে ভেতরে ঠাঁই নাই ঠাঁই অবস্থা। দু'জনের একটা খালি টেবিল দেখে বসে পড়তে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পরিবেশনকারিণীদের একজন বলল, সরি। এই অংশটা রিজার্ভড। তোমরা ইচ্ছে করলে বাইরে বসতে পারো।

বাইরে দেয়ালের পাশ ঘেঁষে দীর্ঘ সারিতে চেয়ার-টেবিল পাতা। রোদে ঝলমল দিনে বাইরে বসে খেতে কোনো সমস্যা নেই। টেবিলে বসে পানীয়ের অর্ডার দেবার পর এশিয়ান চেহারার ছেলেটির আবার সেই একই প্রশ্ন, তবে এবার আরো সরাসরি– ইউ আর ফ্রম হুইচ পার্ট অব ইন্ডিয়া স্যার? বললাম, আমরা ইন্ডিয়ান নই, খাঁটি বাংলাদেশি। বাংলাদেশের নাম শুনেছ? বলল, নিশ্চয়ই। আমি হায়দ্রাবাদের ছেলে। মেন্যুতে প্রোসকিউটো কার্ডো উইথ ফ্রেস্ক পাম অ্যান্ড সাওয়ার ডো টোস্ট লেখা দীর্ঘ

নামের খাবার টেবিলে এলে দেখা গেল বেশ বড়সড় টোস্টের উপর হুইপ্‌ড চিজ, ডিম পোচ, অ্যালামন্ড রোস্ট, শুকনো ক্রানবেরি, রুকোলো পাতা এবং মধুর সমন্বয়ে একটা অভিনব খাবার। মাল্টায় পাঁচ দিনের সফরে মেরিস বুটিক রেস্টুরেন্টের এই লাঞ্চ ছিল একই সাথে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন ও সুস্বাদু। মাছ-মাংস ছাড়াই রীতিমতো স্বাস্থ্যসম্মত মধ্যাহ্নভোজ।

পরিবেশনকারী মেয়েটা বিল নিয়ে এলে তাকে বললাম, আমরা রাবাত যেতে চাই। কীভাবে যাওয়াটা সুবিধাজনক হবে? আমার মনে হলো কথাটা সে ঠিক বুঝতে পারেনি। কথায় কথায় জানলাম, সে নেপাল থেকে কিছুদিন আগেই এসেছে। এখনো সবকিছু চিনে উঠতে পারেনি। হায়দ্রাবাদের ছেলেটাকে ডেকে আনলে সে বলল, তোমরা তো রাবাতেই আছ। তবে পুরো শহর ঘুরে দেখতে চাইলে সোজা গিয়ে ডান দিকে মোড় নাও। তারপর সামনে হাঁটতে থাকো।

বুঝলাম, শুধু দুর্গ দেয়ালের ভেতরের অংশটাই শহর মদিনা। বাইরে পুরোটাই রাবাত, যার অর্থ উপশহর। কী আশ্চর্য! মূল শহর মদিনার আয়তন ১ বর্গ কিলোমিটারের কম। অথচ উপশহর রাবাতের আয়তন ২৬ বর্গকিলোমিটার। মদিনার শ' তিনেক বাসিন্দার বিপরীতে রাবাতের জনসংখ্যা ১২ হাজারের মতো। 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো'র মতো এখানে শহরের চেয়ে উপশহর অনেক বড়। সামান্য একটু হেঁটে ডাইনে ঘুরে যাবার আগে আমরা ভাস্কর্য-শোভিত আন্তন আগিয়াস গার্ডেনের একটা বেঞ্চে বসে পাখিদের ওড়াউড়ি দেখছিলাম। একটা কবুতর ঘুরেফিরেই উড়ে এসে একটা প্রস্তর ভাস্কর্যের মাথায় বসছে। কয়েক পা এগিয়ে বেদিতে মূর্তিমানের নাম-পরিচয় দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ! কবুতরটা দীর্ঘক্ষণ যার মাথায় বসে বিরক্তি ঘটাচ্ছে, তিনি কোনো রাজা-গজা বা রাজনীতিবিদ নন। তিনিই মাল্টার খ্যাতিমান ভাস্কর আন্তন আগিয়াস। মাল্টার বিভিন্ন জায়গায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং মাল্টার স্বাধীনতা যুদ্ধের অসংখ্য স্মারক ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন তিনি। এ ছাড়া সাধারণ মানুষের জীবন, শ্রমজীবীদের মুখাবয়ব এবং ইতিহাসের নিঃশব্দ নায়কদের মুখচ্ছবি মূর্ত করে তুলেছেন আন্তন।

মজার বিষয়, আন্তন আগিয়াস গার্ডেনে নিজের প্রস্তর মূর্তিটি তার নিজ হাতে তৈরি। আমাদের দেশে ভাস্কর্য গড়ার সময় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা বা সঙ্গীতবিশারদের নাম বিবেচনাতেই আসবে না। অন্যদিকে মহান কোনো দেশপ্রেমিক নেতা-নেত্রী বা মুক্তিযুদ্ধের মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার স্মরক ভাস্কর্য নির্মিত হলেও এক দল এসব ভাঙার জন্য সদা একপায়ে খাড়া।

আন্তন আগিয়াস গার্ডেন থেকে বেরিয়ে আমরা রাবাতের মূল পর্যটক আকর্ষণের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। রাবাতের রাস্তাঘাট সংকীর্ণ হলেও মদিনার মতো একেবারে চাপাগলিতে পরিপূর্ণ নয়। তবে মাল্টার প্রায় সকল ভবনের মতো রাবাতের বাড়িঘর, দালান-কোঠাসহ সকল ভবনের বহিরাবরণের রঙ বিভিন্ন শেডের বাদামি। পথের ডানদিকে এসব বাদামি বাড়ির একটিতে চার রঙের চারটি ঝুল বারান্দায় চোখ আটকে গেল। নীরব মদিনার তুলনায় উপশহর কিছুটা সরব। মাঝে মাঝেই নীরবতা ভেঙে

রাবাতের ভবনে সুদৃশ্য ব্যলকনি

এক দল তরুণ তরুণী হৈ হৈ করতে করতে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দু'পাশের স্যুভেনির শপ, মাল্টিজ খাবারের দোকান, ছোট্ট উপাসনালয় এবং বাঁ পাশের উদ্যানে একটা বড় ভাস্কর্য বাঁয়ে রেখে মিনিট দশেক হেঁটে আমরা পৌঁছে যাই মদিনা-রাবাত জোড়া শহরের দ্বিতীয় সেইন্ট পল গির্জার সামনে।

শহরের ছায়াঘেরা অলিগলির প্রান্তে সেইন্ট পলস চার্চ এবং তার নিচে থাকা রহস্যময় গুহা সেইন্ট পলস গ্রোটো বা মাল্টার খ্রিস্টীয় ইতিহাসের এক অনন্য সাক্ষী। এই গির্জা শুধু ধর্মীয় গুরুত্ব বহন করে না। বরং ইতিহাস, কিংবদন্তি ও লোকবিশ্বাসের সংমিশ্রণ। রোমের পথে যাত্রা করা এক জাহাজের আরোহী সেইন্ট পল ৬০ খ্রিস্টাব্দে জাহাজডুবির পর মাল্টার কূলে এসে উঠে পড়েছিলেন। বাইবেলের অ্যাক্টস অব অ্যাপোটেল অনুসারে, এই দুর্ঘটনার পর তিন মাস ধরে তিনি মাল্টায় থেকে খ্রিস্ট ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। জনশ্রুতি, রাবাতের এই সেইন্ট পলস গ্রোটো নামের গুহায় বসবাস করেছেন তিনি। পরবর্তী সময়ে তার স্মৃতিতে গুহার উপরে গড়ে ওঠে এই উপাসনালয়। বর্তমান গির্জাটি নির্মিত হয় ১৬ শতকের শেষভাগে। এর পর দু'শ' বছরে কিছু অংশ পুনর্নির্মাণ ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বারোক স্থাপত্যধারায় নির্মিত মার্বেল অলঙ্করণ, ধর্মীয় চিত্রকর্ম এবং কাঠের জটিল খোদাই কারুকাজ এর অভ্যন্তর ভাগ অসাধারণ মুগ্ধতার অনুভব ছড়িয়ে দেয়। গির্জার প্রধান বেদির এক পাশে রয়েছে সেইন্ট পলের একটি মূর্তি। তুলনামূলক ছোট এই চার্চে ছড়িয়ে আছে এক ধরনের নীরব সৌন্দর্য।

মেরিস রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার

চার্চের নিচের সেইন্ট পলস গ্রোটো গুহায় নামতে হবে সর্পিল পাথরের সিঁড়ি বেয়ে। ভেতওে ঢুকলেই এক ধরনের আধ্যাত্মিক নিস্তব্ধতা অনুভব করা যায়। মাটি ও পাথরের গন্ধ, মোমবাতির মৃদু আলো আর গুহার ঠান্ডা দেয়াল মিলিয়ে মনে হয়, সময় এখানে থেমে আছে। অনেক তীর্থযাত্রীর বিশ্বাস, গুহাটির পাথর রোগ সারাতে সহায়তা করে। সেই কারণে ধমী□র্য় তস্করেরা অতীতে এখানকার পাথরের টুকরো চুরি করে তাবিজ হিসেবে বিক্রি করেছে। গুহার ভেতরে রয়েছে ১৮ শতকে নির্মিত সেইন্ট পলের একটি মূর্তি। চার্চের সঙ্গে যুক্ত জাদুঘরে রয়েছে ধর্মীয় শিল্পকর্ম, পুরোনো বই-পুস্তক, মঠের কক্ষ এবং ক্যাটাকম্ব। সেইন্ট পলস গ্রোটোর আশপাশে রয়েছে রোমান যুগের ক্যাটাকম্ব এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন আশ্রয়স্থল। সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে না পারায় আমরা পৌঁছাবার আগেই বন্ধ হয়ে গেছে জাদুঘরের দরজা।

রাবাতের সেইন্ট পলস চার্চ ও গ্রোটো মাল্টার যে কোনো ভ্রমণের জন্য এটি এক অবিচ্ছেদ্য গন্তব্য। প্রায় দুই হাজার বছর আগে সেইন্ট পল যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আজ সেই গুহার ভেতর হেঁটে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, পল হয়তো এখানেও ছিলেন। হয়তো এখানেই তার ছায়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের সামনে যিনি হাঁটছিলেন সেই অদ্ভুত বয়োবৃদ্ধ মানুষটি হঠাৎ বলে উঠলেন, ঈশ্বর সম্ভবত এখানেই ঘুমান। আমি তার কথার উত্তর না দিয়ে মনে মনে বললাম, তিনি ঘুমিয়ে থাকুন। আমরা বরং উপরে উঠে যাই। অপরিসর সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা খুব প্রীতিকর বলে মনে হয়নি।

সেইন্ট পলস চার্চের ঠিক উল্টো দিকের ছোট একটি চত্বর ঘিরে গোটা কতক কফি শপ, স্থানীয়দের আড্ডার জায়গা বলে মনে হলো। তবে এই চত্বরের মূল আকর্ষণ এর কেন্দ্রে একটি জলাধারের মধ্যে ঘুরতে থাকা গোলক। স্ফিয়ার ফাউন্টেন নামে মার্বেল বলের মতো গোলককে প্রথমে পৃথিবী ভেবে ভুল করেছিলাম। আমি জলাধারের পাশে বসে গোলকটি ছুঁয়ে দেখলাম। না, এটি কোনো ধাতব বা পাথরে তৈরি নয়। আসলে মার্বেল বলটি প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে তৈরি, চার্চের বারোক স্থাপত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নান্দনিক স্থাপনা। পর্যটক আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু স্ফিয়ার ফাউন্টেনে বসে আমি যখন ঘুরতে থাকা গোলকের নির্মাণ শৈলী পরীক্ষা করছি ততক্ষণে আমার ভ্রমণসঙ্গিনী কোথায় যেন হারিয়ে গেছেন। তাকে খুঁজে পাওয়া গেল স্কোয়ারের ডান দিকে একটা স্যুভেনিরের দোকানে। মাল্টার নাম খোদাই করা ছোট ছোট দুই-একটি সংগ্রহ করে জমজমাট দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম নীরব রাস্তায়। রাজধানী ভ্যালেটায় ফিরতে হবে রাবাত বাসস্ট্যান্ড থেকে।

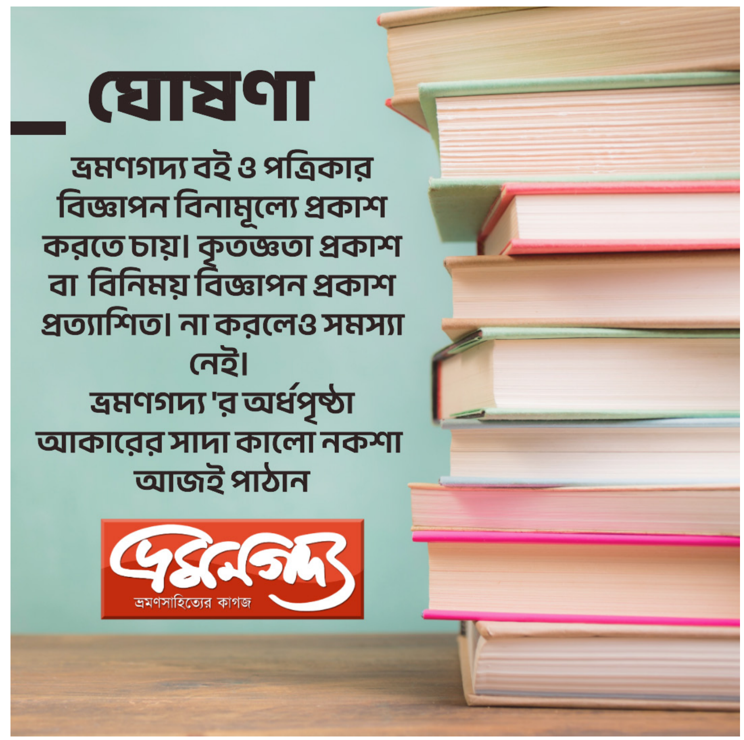

বহুরূপী পাপের শহরে

বিশ্বজিৎ বড়ুয়া

খুব অস্থির লাগছে। কী করা উচিত, ভেবে পাচ্ছি না। চারদিকে অস্থিরতা। দেশ ক্রান্তিকাল পার করছে, আর আমি আছি আরেক দোটানায়। ৪ মাস ধরে প্ল্যান করা একটা বহু প্রতীক্ষিত ট্রিপে যাওয়ার তারিখ আর এক সপ্তাহ পর। যাব কি যাব না, সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। হোটেলে পেমেন্ট করা হয়ে গেছে। আমি ছাড়া বাকি দু'জন সব ফ্লাইট ও ইভেন্টের টিকেট কেটে ফেলেছে। এমনিতেই আছি দোটানায়। তার উপর অফিস থেকে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পাচ্ছি না ট্রাভেল করার জন্য। আবার প্লেনের টিকেটের দাম প্রতিদিন হু হু করে বেড়েই চলেছে।

'জিন্দেগি না মিলেগি দোবারাচ' মুভি দেখেছেন হয়তো। তিন বন্ধু কলেজে থাকার সময় প্ল্যান করেছিল এক সাথে ঘুরতে যাবে। আমাদের কেসও সেই রকম। তাদের বন্ধুত্ব স্কুল থেকে শুরু হলেও আমাদেরটা চাকরি করতে ঢুকে। তাই বলে মায়াবন্ধ ও টানের কোনো কমতি নেই। তিনজনই যখন দেশে একই ইউনিটে ছিলাম তখন তো সারাদিন এক সাথেই থাকতাম। কলিগরা আমাদের থ্রি ইডিয়টস ডাকত। এখনো একই অরগানাইজেশানে কাজ করলেও আমরা তিনজন তিন দেশে। তিনজনের টাইম জোন আলাদা হওয়া সত্ত্বেও নিয়ম করে কথা বলি, আবার ঝগড়াঝাঁটিও করি। মূলত ঝগড়া হয় রিগ্যান আর রুবাইয়ার। বয়সে অল্প একটু বড় বলে আমাকে তখন রেফারির ভূমিকা নিতে হয়। রুবাইয়া এখন ইউক্রেন মিশনে, রিগ্যান তুরস্ক মিশন থেকে সম্প্রতি সাউথ সুদানে ট্রান্সফার হয়েছে। আর আমি বাংলাদেশ মিশনে।

দেশে থাকতে আমরা এক সাথে অনেক ট্যুর দিয়েছি। কিন্তু এই ইউরোপের ট্যুর প্ল্যানটা আমাদের অনেক দিনের। মূল উদ্দেশ্য ডাচদের রাজধানী অ্যামস্টারডাম দেখা। তারপর স্পেনের বুনিওলে লা টমাটিনোচ ফেস্টিভ্যাল, আর জার্মানির মিউনিখে অ্যাডেলের কনসার্ট। বিপত্তি বাধল আমার ভিসায়। নেদারল্যান্ডস আমাকে মাত্র ১০ দিনের ভিসা দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত আমাকে লা টমাটিনো আর অ্যাডেলের কনসার্ট বাদ দিয়ে নতুন পরিকল্পনা সাজাতে হলো। না হয় আমি লেভারকুসেন, জুরিখ আর প্যারিসে আমার ভাই-বোনদের সাথে দেখা করার সময় করতে পারব না।

অবশেষে মিলল সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স। টিকেটও কেটে ফেললাম। ঢাকা থেকে প্রথমে যাব অ্যামস্টারডাম আর ফিরব প্যারিস থেকে। শেষ মুহূর্তে টিকেট কেনায় দামও পড়ল অনেক বেশি। বাংলাদেশ থেকে ইউরোপে সবচাইতে কম খরচে আসা-যাওয়া করা যায় ইটালির রোম বা মিলান শহর থেকে। তাই আমি প্রাথমিক পরিকল্পনা করেছিলাম প্রথমে নেদারল্যান্ডস যাব। ফেরার সময় ইটালির রোম থেকে দেশে ফিরব। এখন ভিসার মেয়াদ কম হওয়ায় ট্যু প্ল্যান কাটছাঁট করে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল, প্রথমে নেদারল্যান্ডস শেষ করে জার্মানির লেভারকুসেনে যাব। সেখান থেকে ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে যাব বোনের কাছে। তারপর প্যারিস ছুঁয়ে ঢাকায় ফেরা।

ভিসা ও টিকেট বাংলাদেশ থেকে সেনজেনে ট্যুরিস্ট ভিসা প্রসেস করার জন্য নেদারল্যান্ডস আর সুইডেনেই তুলনামূলক সহজ। কম কাগজপত্র লাগে, ইন্টারভিউ লাগে না তাই অ্যাপয়েন্টমেন্টের ঝামেলা নেই। অফিসের ঘঙঈ, আইডি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, গত তিন বছরের ট্যাক্স রিটার্ন কপি আর সার্টিফিকেট, এনআইডি কপি, একটা ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স, কনফার্ম হোটেল বুকিং, প্লেনের টিকেট বুকিং, কেন যেতে চান উল্লেখ করে একটা কভার লেটার আর ট্রাভেল আইটেনেরারি লাগবে। যেসব ডকুমেন্টের মেইন কপি দিচ্ছি না, সেসব নোটারি করে দিতে হচ্ছে। ভিসা ফি ভিসা সেন্টারে ক্যাশ টাকায় নেয়। ভিসাসহ পাসপোর্ট ফেরত পেলাম ৮ দিন পর। ভিসা দিয়েছে দেড় মাসের, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম স্টে মাত্র ১০ দিন দিয়েছে। মানে আমি ১০ দিনের বেশি ওখানে থাকতে পারব না।

আমার সব প্ল্যান ভন্ডুল হয়ে গেল। রুবাইয়া ইউক্রেন থেকে আসবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে বের হওয়া বা ঢোকা অনেক ঝক্কির। ইউক্রেন ওয়ার জোন বলে কোনো প্লেন

ক্যানেল ভর্তি এমন ছোট বড় বোট

চলে না। ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ থেকে সে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ শহরে আসবে তিনবার ট্রেন চেঞ্জ করে। তবে তার ইউএন ডিপ্লোম্যাট পাসপোর্ট থাকায় ইউক্রেনের বর্ডার ক্রস করা কিছুটা সহজ। কিন্তু যাদের ন্যাশনাল পাসপোর্ট থাকে, সেটা যে দেশেরই হোক না কেন, ইউক্রেন বর্ডার পার হওয়া রীতিমতো দুঃস্বপ্ন।

ওয়ারশ থেকে রুবাইয়া অ্যামস্টারডামে পৌঁছাবে ২৪ আগস্ট বিকেলে। আমাদের তিনজনের মধ্যে সে-ই সবার আগে টিকেট কেটেছে এবং অ্যামস্টারডামে আমাদের হোস্টেল বুক করে পেমেন্ট করে দিয়েছে। আমি আর রিগ্যান তার তারিখ মিলিয়ে টিকেট কেটেছি। রিগ্যানেরও সাউথ সুদানের রাজধানী জুবা থেকে অ্যামস্টারডাম আসতে তিনটা ফ্লাইট চেঞ্জ করতে হবে। সে এসে পৌঁছাবে ২৪ তারিখ সকাল ৯টায়। সে আমাকে অনুরোধ করল এমন ফ্লাইট নিতে, যাতে আমিও একই সময়ে অ্যামস্টারডাম পৌঁছাই। আমার ফ্লাইট অপশন তিনটা– টার্কিশ, কাতার আর এমিরেটস। টার্কিশ আর এমিরেটসের ফ্লাইট সকালে অ্যামস্টারডামে পৌঁছে যাবে; ভাড়াও কাছাকাছি।

কাতার এয়ার আমার খুব পছন্দের; সময় মিলছে না। এমিরেটসে আমার আগের বেশ কিছু মাইলস জমা হয়ে আছে, যা রিডিম করা সম্ভব। কিছু মাইলস জমলেই টিকেট নিতে পারব বা বিজনেস ক্লাসে সিট আপগ্রেড করতে পারব। এমিরেটসেই নিলাম টিকেট। এমিরেটসে টিকেট করার আরও কারণ হচ্ছে, দুবাই থেকে অ্যামস্টারডাম আর প্যারিস থেকে দুবাই দুটো ফ্লাইটই এয়ারবাস এ ৩৮০, যা পৃথিবীর সবচাইতে বড় যাত্রীবাহী ডাবলডেকার। দ্বিতীয়ত, এমিরেটস স্কাইওয়ার্ডস সদস্য হওয়ার দরুন

ইকোনমি ক্লাসে ২৫ কেজির জায়গায় ৪০ কেজি লাগেজ নেয়ার সুবিধা। তৃতীয়ত, বর্তমানে অফার চলছে বোনাস স্কাইওয়ার্ডস মাইলসের।

বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন ঢাকা থেকে ২৩ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টায় আমার ফ্লাইট। দুবাইয়ে ট্রানজিট ৪ ঘণ্টার। আরেকটা ফ্লাইট ধরে আমি অ্যামস্টারডাম পৌঁছাব সকাল ৯টা ২০ মিনিটে। ঢাকা এয়ারপোর্টেও ইমিগ্রেশন কাউন্টারে গিয়ে পাসপোর্ট আর বোর্ডিং কার্ড দিলাম। অফিসার খুব বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'আবার শেনজেন ভিসা... আজকে আমার কপালটাই খারাপ।' অফিসারের বিরক্তির কারণ আছে। শেনজেন ভিসার লেখাগুলো খুব ছোট। সেটা পড়ার জন্য বিশেষ ধরনের ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগে। আর অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। উনি কাউন্টার থেকে বেরিয়ে আমাকে নিয়ে আরকটা কাউন্টারে গেলেন। দুই মিনিট অপেক্ষা করার পর শেনজেন ভিসার এক্সপার্ট ইমিগ্রেশন পুলিশ অফিসার এলেন চোখেমুখে রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে। উনারও নাকি আজকে অনেক শেনজেন ভিসা চেক করতে হয়েছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভিসা চেক করতে করতে আমাকে অফিসার দুইটা প্রশ্ন করলেন– কোথায় যাচ্ছি; আমি কোথায় কাজ করি। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শুনে উনি ম্যাগনিফাইং গ্লাস খুলে আমার দিকে তাকালেন। উনার চেহারা আর হাবভাব চেঞ্জ হয়ে গেল। প্রায় ধমকের সুরে বললেন, ভাই, আগে বলবেন না? এর পর আমাকে প্রায় কোলে করেই আরেক পাশে তাদের বড় কর্তার ডেস্কে নিয়ে গিয়ে সোফায় বসালেন। সেখানকার ইনচার্জ অফিসার জোর করে আমাকে কফি খাইয়ে কিছুক্ষণ খোশ গল্প করলেন।

আমরা যারা সাধারণ প্যাসেঞ্জার; ইমিগ্রেশনে অনেকেরই তিক্ত ও বিব্রতকর অভিজ্ঞতা আছে। আর বেশির ভাগের তিক্ত অভিজ্ঞতা না হলেও এ ধরনের খাতির বোধ করি খুব কম লোকের ক্ষেত্রেই হয়। আমাকে খাতির-যত্ন করার একটা বিশেষ কারণ আছে। আমি যে অরগানাইজেশনে কাজ করি সেটা কাজ করে অভিবাসন নিয়ে। তাই ইমিগ্রেশন পুলিশদের নিয়মিত ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার ম্যানেজমেন্টের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং দেয়া হয় আমাদের অফিস থেকে। শেনজেন ভিসা কীভাবে চেক করতে হয়, সেটাও সেই ট্রেনিংয়ের একটা অংশ। ট্রেনিংয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আছে; ইমিগ্রেশন কাউন্টারে প্যাসেঞ্জারদের প্রশ্ন। প্রশ্ন কীভাবে করলে প্যাসেঞ্জার বিব্রতবোধ করবেন না। আবার অফিসারেরও তথ্য যাচাই-বাছাইয়ে কী প্রশ্ন করা উচিত-অনুচিত এইসব। এই ইমিগ্রেশন অফিসার আর তাদের বড় কর্তা এক মাস আগে আমাদের অফিস থেকে সেই ট্রেনিং পেয়েছেন। হোটেল সারিনায় ট্রেনিংয়ের সময় আমার কলিগরা তাদের খুব যত্ন-আত্তি করেছিল। খাওয়া-দাওয়া খুব ভালো ছিল। এ নিয়ে দু'জনেই বেশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন। আমার ভিসা, পাসপোর্ট চেক হওয়ার পর দু'জনেই এসে আমাকে আবার ইমিগ্রেশন গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

শিফোল এয়ারপোর্ট ভায়া দুবাই এমিরেটসের কমার্শিয়াল ফ্লিটে এয়ারক্রাফট আছে মূলত দু'রকম। এয়ারবাস এ-৩৮০ ও বোয়িং-৭৭৭। ঢাকার রানওয়ে আরেকটু লম্বা হলে এ-৩৮০ ঢাকায়ও আসত। রানওয়েই যে একমাত্র ইস্যু, তা মনে হয় না।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচাইতে বড় এয়ারক্রাফট আন্তনভ এএন-২২৫ মিরিয়াও ঢাকায় এসেছিল একাধিকবার। আমাদের দুর্ভাগ্য, দানবাকৃতির এই এয়ারক্রাফট রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুতেই ধ্বংস হয়ে গেছে। এমিরেটসের আসনগুলো তুলনামূলক আরামদায়ক ও স্পেসিয়াস। এদের এন্টারটেইনমেন্ট ফিচারও উন্নততর। আমার ধারণা, পৃথিবীর সব দেশ থেকেই এমিরেটসের এয়ারহোস্টেজ রিক্রুট করা হয়। আরবি, ইংরেজি ও স্থানীয় ভাষায় ওরা ফ্লাইট অ্যানাউন্সমেন্ট করে। ঢাকার ফ্লাইটেও বাংলায় অ্যানাউন্সমেন্ট হলো। সবচেয়ে ভালো লেগেছে প্রাণোচ্ছ্বাস আর উষ্ণ আতিথেয়তা। ছোটখাটো দুষ্টুমিও করে যাচ্ছে। ডিনারে সার্ভ করা হলো মাটন রাইস, ডেজার্ট আর হোয়াইট ওয়াইন।

স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ১০টায় ল্যান্ড করলাম দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। এটি পৃথিবীর তৃতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর। নামার আগে আকাশ থেকেই এক নজর দেখলাম দুবাই শহরের রাতের চাকচিক্য। ল্যান্ড করার পর দেখলাম দুবাই এয়ারপোর্টের রমরমা অবস্থা। যদিও আর্টিফিসিয়াল, তারপরও খারাপ লাগল না। সিকিউরিটি চেকিং শেষে আমি একটা বাসে টার্মিনাল-৩ এ চলে গেলাম। এখানে এক টার্মিনাল থেকে আরেক টার্মিনালে যাওয়ার জন্য মনোরেলও আছে। সেখানে লাউঞ্জ কি'র কল্যাণে মারহাবা লাউঞ্জে ঢুকে বিশ্রাম করার জন্য আশ্রয় নিলাম একটা স্লিপিং সোফায়। জার্নি করার সময় আমার একদম ঘুম হয় না। সে প্লেন জার্নি হোক, আর রিকশা জার্নি। মারহাবা লাউঞ্জে খুব মজার একটা ল্যাম্ব চপ্ধসঢ়;ন করে। আমি এর ডাইহার্ট ফ্যান। তার সাথে রেড ওয়াইনযোগে পেট পূজা চমৎকারই হয়!

জানা গেল, রিগ্যান ইজিপ্ট ট্রানজিট শেষ করে এখন ইস্তাম্বুলের পথে। আর রুবাইয়া এখনো ইউক্রেনের ট্রেনে। ভোর ৫:২০-এ আমার পরের ফ্লাইট ছাড়ল। স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় ল্যান্ড করলাম অ্যামস্টারডামের শিফোল এয়ারপোর্টের রানওয়েতে। আকাশ বেশ মেঘলা, বৃষ্টি হচ্ছে। প্লেনে বসেই মোবাইল ফোনে চেক করে দেখলাম রিগ্যানের টার্কিশ এয়ারলাইন্সও ল্যান্ড করেছে আমার পরপরই। ট্রাভেল করার সময় আমি একটা গ্লোবাল সিমকার্ড ব্যবহার করি। এই সিমকার্ড বাংলাদেশসহ পৃথিবীর ১২৪টা দেশে ব্যবহার করা যায়। রোমিংয়ের কোনো ঝামেলাই নেই। যেই দেশেই ল্যান্ড করবেন, সাথে সাথে নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট সব অটো অ্যাক্টিভ হয়ে যায়।

ইমিগ্রেশনে গিয়ে দেখি অনেক ভিড়। লাইনে দাঁড়িয়ে যাই। ইইউ পাসপোর্ট হোল্ডার, ডিপ্লোম্যাট আর অন্য দেশের পাসপোর্ট হোল্ডার– সবার জন্য আলাদা কাউন্টার। রিগ্যান তার ইউএন পাসপোর্ট নিয়ে ডিপ্লোম্যাট কাউন্টার দিয়ে দুই মিনিটে ইমিগ্রেশন পার হয়ে গেল। আর আমার কাউন্টার পর্যন্ত যেতে লাগল প্রায় ২০ মিনিট। কোন কোন দেশে যাব, এ ছাড়া ইমিগ্রেশন অফিসার আমাকে আর কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। রিগ্যান আগে গিয়ে আমাদের দু'জনের লাগেজ কালেক্ট করে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমার লাগেজ তুলতে তার খুব কষ্ট হয়েছে। এই লাগেজে আমি কি পাথর এনেছি নাকি এত ওজন কেন? আমার দুটি চেকইন লাগেজ আসলে ভর্তি ছিল ২৮

ক্যানেলে ভাসমান হাউস

কেজি বিভিন্ন রকমের শুঁটকি আর ১০ কেজি হরেক রকম বার্মিজ আচারে। ভাই-বোন-ভাগ্নিদের জন্য এনেছি। রুবাইয়া আর রিগ্যানের জন্যও আছে। রিগান অবশ্য তার ভাগেরটা নিয়ে যাবে কোপেনহেগেনে বোনের বাসায়। আর রুবাইয়া নিয়ে যাবে ইউক্রেনে। নিজেকে এখন মনে হচ্ছে শুঁটকি স্মাগলার। চট্টগ্রামের পাইকারি আড়ত থেকে ইউরোপের ৫টা দেশে শুঁটকি পাচার করছি যেন। নেদারল্যান্ডসে চেকইন ব্যাগে শুঁটকি বহন করতে সমস্যা নেই, যদি সেটা গন্ধ না ছড়ায়। আর শুকনো আচার আনতেও কোনো সমস্যা নেই। তবে তৈলাক্ত আচার হলে বহন করা মানা।

রুবাইয়াকে ফোন দিলাম; সে ইউক্রেন বর্ডার ক্রস করে ট্রেন চেঞ্জ করে এখন পোল্যান্ডের ওয়ারশর কাছাকাছি। অ্যামস্টারডামের শিফোল ইউরোপের অন্যতম ব্যস্ত ও আধুনিক এয়ারপোর্ট। এয়ারপোর্টের ভেতর থেকেই শহরের সেন্ট্রাল স্টেশনে যাওয়ার মেট্রো ট্রেন আছে। সময় লাগে ১৫/২০ মিনিট, খরচ ৫ ইউরোর মতো। সেন্ট্রাল স্টেশন থেকে আমাদের হোস্টেলে যেতে আবার ট্রামে চড়তে হবে। লম্বা জার্নি করে খুব টায়ার্ড লাগছিলভ তা ছাড়া দু'জনের সাথেই ভারী লাগেজ। তাই মেট্রো, ট্রাম, বা বাসের চিন্তা বাদ দিয়ে উবার নিয়ে চলে যাব কিনা, ভাবছি। আসল কথা হচ্ছে, ভোজনরসিক বলে আমাদের দু'জনেরই স্বাস্থ্য নাদুসনুদুস। আর দু'জনেই অসম্ভব আরামপ্রিয়। একটু বেশি খরচ হয়ে যাবে জেনেও উবার ডাকতে আমাদের বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না। গাড়ি এসেছে; টেসলার মডেল-এস। ২৩ ইউরো ভাড়ায় ২০ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম আমাদের হোস্টেলে।

সাইকেলের রাজত্বে: অ্যামস্টারডাম শহরে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হিসেবে সবচাইতে বেশি চোখে পড়েছে ট্রাম আর খুবই অল্প কিছু বাস। উবার আর ট্যাক্সিও আছে। তবে সাইকেলের ব্যবহার চোখে পড়ার মতো। ছোট-বড় সবাই সাইকেলে অভ্যস্ত। আমাদের হোস্টেলের সামনেও অনেক সাইকেল পার্ক করা। হোস্টেলের গেস্টদের জন্য প্রতি ঘণ্টা ৫০ সেন্ট ভাড়া দেয়া হয়। সারা দিনের জন্য নিলে ১২ ইউরো দিতে হয়। অ্যামস্টারডামকে সাইকেলের রাজধানীও বলা হয়। শহরজুড়েই উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হিসেবে অত্যাধুনিক ট্রেন, মেট্রো, ট্রাম, বাস, ফেরি– সবই আছে। কিন্তু সবাই হয় সাইকেলে, না হয় হেঁটে চলাফেরা করছে।

'আই অ্যামস্টারডাম' সিটি কার্ড: বেশির ভাগ আধুনিক ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন শহরের মতো এই শহরেও ট্যুরিস্টদের জন্য বিশেষ আইসি কার্ড পাওয়া যায়। এই কার্ড দিয়ে আপনি ৭০টা মিউজিয়াম আর গ্যালারিতে ফ্রি অ্যাক্সেস পাবেন। সব পাবলিক ট্রান্সপোর্টে আনলিমিটেড ফ্রি অ্যাক্সেস পাবেন। একটা ফ্রি ক্যানেল ক্রুজ পাবেন। আবার চাইলে সারা দিনের জন্য একটা সাইকেলও নিতে পারবেন। ১ দিনের জন্য নিলে ৬৫ ইউরো, ৫ দিনের জন্য নিলে ১৩৫ ইউরো। ২/৩/৪ দিনের জন্যও পাওয়া যায়। এই কার্ডটা নিলে অনেক খরচ কমে যায়।

মৌমাছির ডেরায়: আমাদের হোস্টেলের নাম 'দ্য বি হোস্টেল'; মানে মৌমাছির হোস্টেল। আদতেও তাই। প্রতি ফ্লোরে ৩টা রুম; প্রতি রুমে ৬টা বাংক বেড। মানে নিচে একটা, উপরে আরেকটা। আরেকদিকে কমন ওয়াশরুম, শাওয়ার রুম আর বেসিন। তবে এই বাংক বেডগুলোর প্রাইভেসি ভালো। উডেন বোর্ডের তৈরি এই

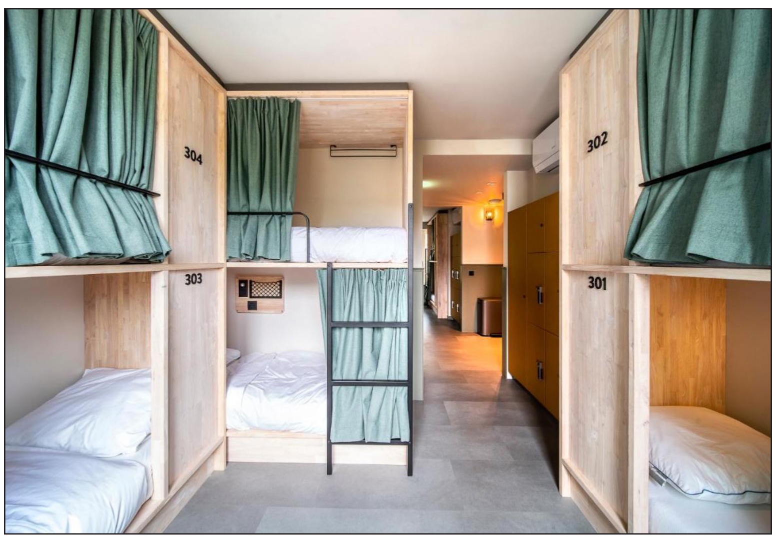

মৌমাছির ডেরা

খুপরিগুলোর দুয়ার বন্ধ করলে আপনি অন্য সবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারবেন, অনেকটা ক্যাপসুল ডর্ম-এর মতো। আরেক পাশে সবার জন্য প্রাইভেট লকার। প্রতি বেড, প্রতি রাত ৬০ ডলার আমাদের ফুল পেমেন্ট 'মহান হৃদয়ের অধিকারী' রুবাইয়া আগেই করে দিয়েছে।

অ্যামস্টারডামের একটা বিশেষ দিক চোখে পড়েছে। এরা তাদের বিল্ডিংয়ের বাইরের পুরোনো লুক বা স্ট্রাকচারে কোনো রকম চেঞ্জ কওে না। বাইরে থেকে দেখে মনে হবে, কয়েকশ' বছরের পুরোনো বাড়ি। কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই পাবেন অত্যাধুনিক সব ফ্যাসিলিটি, এমনকি দরজাগুলোও ডিজিটাল। লিফটের ব্যবহার কমই দেখলাম। সিঁড়িগুলো অনেক সরু আর প্যাঁচানো। আমাদের লাগেজ নিয়ে উপরে উঠতে জান বেরিয়ে গিয়েছিল। হোস্টেলের চেকইন টাইম দুপুর ১টায়। লাগেজ হোস্টেলের স্টোরে রেখে ফ্রেশ হয়ে ব্রেকফাস্ট শেষে হোস্টেলের লাউঞ্জে কিছুক্ষণ রেস্ট নিলাম। তারপর আশপাশে একটু ঘোরাঘুরি করে চলে গেলাম এয়ারপোর্টে। রিগ্যানের ভার্সিটির এক সিনিয়র আপুর সাথে দেখা করতে হবে। উনি এয়ারপোর্টে আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। আপু অনেক দিন ধরে এখানে আছেন। দুপুর ২টায় অফিসের কাজে বার্লিন যাচ্ছেন।

আমরা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করলাম। আপু অনেক মূল্যবান টিপস ও ইনফরমেশন দিলেন নেদারল্যান্ডস নিয়ে। এখানকার চিজ খুব বিখ্যাত। এমনকি চিজ মিউজিয়ামও আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টিপস ছিল– ব্যাগ সাবধানে রাখতে হবে। পিক পকেট হয় অনেক। এখানে এসে পিক পকেট নিয়ে সাবধানে থাকতে হবে– মন থেকে মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ইউরোপের কিছু বড় শহরে পিক পকেট আর স্ক্যাম হয় অনেক, যার মধ্যে প্যারিস অন্যতম। আপুর ফ্লাইট টাইম এগিয়ে আসায় বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ঘুরেফিরে দেখছিলাম ছিমছাম এয়ারপোর্টের ভেতরে বাইরে। ওয়ারশ এয়ারপোর্ট থেকে রুবাইয়ার ফ্লাইট ছাড়বে আর কিছক্ষণ পর। এসে পৌঁছাবে এক ঘণ্টা পর।

বহুরূপী পাপের শহর: এয়ারপোর্টের বাইরের দিকে এসে দেখি আবালবৃদ্ধবণিতা ভুস ভুস করে সিগারেট খাচ্ছে। বাইরে বেশ ঠান্ডা, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ওয়েদার আমাকেও খুব ইনসিস্ট করছে একটা সিগারেট খেতে। ট্যুরে এসে বাসা বা জীবনের নিয়মকানুন ভাঙার মজাই আলাদা। আর নেদারল্যান্ডসে নিয়মকানুনে কিছু ব্যাপারে খুবই উদার। নেদারল্যান্ডস যাচ্ছি শুনে আমার এক বন্ধু বলেছিল– এখানে নাকি হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতি ছাড়া সব বৈধ। এ কথা সে কেন বলেছিল, টের পেলাম স্মোকিং জোনের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে। এ তো শুধু সিগারেটের গন্ধ না। ভালো করে খেয়াল করে দেখি, অনেকের হাতেই ক্যানাবিস। ক্যানাবিস সেবনকে এখানে অপরাধ হিসেবে ধরা হয় না। রীতিমতো কালচারের অংশের মতো। ক্যানাবিস ক্যাফেও দেখেছি অনেক। ক্যানাবিসের চকলেট, চা, বিস্কুট এমনকি ক্যানাবিস নুডুলস, মেইন কোর্স আইটেমও বিক্রি হচ্ছে দেদার। পতিতাবৃত্তিও এখানে বৈধ। স্ট্রিপ ক্লাব, সেক্স শপ,

অ্যামস্টারডাম শিফোল এয়ারপোর্ট

সেক্স শোর ছড়াছড়ি। কফি শপে বসেই ক্যানাবিস, মারিজুয়ানা সেবনকে এখানে অপরাধ হিসেবে ধরা হয় না।

অ্যামস্টারডামের 'ডি ওয়ালেন' পৃথিবীর সবচাইতে বিখ্যাত/কুখ্যাত 'রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট'। এ কারণে অ্যামস্টারডামকে অন্যতম 'পাপের শহর' বলা হয়। লোকজন পাপের শহর বললেও আমি বলব বহুরূপী শহর। আমার চোখে ক্ষণে ক্ষণে রূপ পাল্টেছে বৈচিত্র্যময় শহরটা। শিল্পের শহরও বলা হয় বহু ভাষা ও সংস্কৃতির মিলনস্থল শহরটিকে। স্থাপত্যশৈলীর অপূর্ব নিদর্শন শহরটা ছোট ছোট খালে ভর্তি। অ্যামস্টারডাম মূলত ছোট-বড় শ'খানেক দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এই দ্বীপগুলো কানেক্ট করার জন্য ক্যানেলগুলোর উপর ছোট-বড় এক হাজারেরও বেশি সেতু। শহরকে 'উত্তর ইউরোপের ভেনিস' বলা হয়। ক্যানেলে বোটে লোকজন ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় সাইজের কিছু বোট দেখলাম, তার মাঝখানে খাবার দাবার আর হরেক রকম ড্রিংকের আয়োজন ঘিওে লোকজন আমোদ-ফুর্তিতে মেতে আছে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লেগেছে ক্যানেল ভর্তি ফ্লোটিং হাউসগুলো। ইস্, এই রকম একটা ফ্লোটিং হাউস যদি আমার থাকত...!

টিউলিপ আর উইন্ডমিলের এই জনপদ বিখ্যাত। এখানেই আছে পৃথিবীর বিখ্যাত ভাসমান ফুলের মার্কেট। শহরের আশপাশে গেলেই দেখা পাবেন দিগন্ত বিস্তৃত রঙিন টিউলিপ গার্ডেন, তার মাঝে উইন্ডমিল। ঢাকাকে যদি মসজিদের শহর বলা হয়, অ্যামস্টারডামকে জাদুঘরের শহর কেন বলা যাবে না? ৭৫টি জাদুঘর ও গ্যালারি দিয়ে

সাজানো শহর। সবই বিশ্বখ্যাত। ভ্যান গগ মিউজিয়াম আর আনা ফ্রাংক মিউজিয়ামে প্রতিদিন এত লোক যায়; অনেক সময় এদের টিকিট এক মাস আগেই শেষ হয় যায়।

অ্যামস্টারডাম নেদারল্যান্ডসের রাজধানী হলেও এ দেশের সব সরকারি, প্রশাসনিক কাজ হয় হেগ শহর থেকে। রুবাইয়া অবশ্য জানে না আমি আর রিগ্যান এয়ারপোর্টে তাকে সারপ্রাইজ দেয়ার জন্য ওঁৎ পেতে আছি। তাই বাইরে এসে প্ল্যাকার্ড হাতে আমাদের দু'জনকে দেখে একটু আবেগাপ্লুত হয়ে যায়। ফের একটা উবার নিয়ে তিনজন চলে যাই মৌমাছির ডেরায়।

ডাচদের রাজধানীতে জাপানি ডিনার: আমরা তিনজনই প্রচন্ড টায়ার্ড ও ক্ষুধার্ত। ঘড়িতে বাজে রাত সাড়ে ৯টা। আমাদেও হোস্টেলের ম্যানেজার জানাল, এখানকার আশপাশের সব রেস্টুরেন্ট রাত ১০টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। শুনে আকাশ থেকে পড়ি। কী বলে! আমি তো ভেবেছিলাম অ্যামস্টারডামে দিন আর রাত সমান। ইনফ্যাক্ট দিনের চাইতে রাতই বেশি লাইভলি আর জমজমাট। ম্যানেজার জানাল, হ্যাঁ, ঠিকই। তা শহরের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়। বিশেষ করে রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট ও তার আশপাশে। তা ছাড়া পুরো অ্যামস্টারডাম রাত ১০টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। ক্ষিদে পেটে ম্যানেজারের সাথে বক বক কওে যাচ্ছি, তখন চোখে পড়ল রাস্তার ওপারের এক জাপানি রেস্টুরেন্টে লোকজনের আনাগোনা। এর তিন মাস আগে জাপান থেকে ঘুরে এসেছি; আমার দু'মাস আগে গিয়েছিল রুবাইয়া। রিগ্যানও জাপানি খাবার খুব পছন্দ করে। অতএব হয়ে যাক ডাচদের দেশে জাপানি ডিনার!

আমাদের আরো একটা জরুরি কাজ আছে। পরদিন আমাদের আরেক শ্রীলঙ্কান বন্ধু/কলিগের (রাইস) জন্মদিন। তাকে তিনজন মিলে ভিডিও কলে উইশ করব। রাইসের পোস্টিং এখন কেনিয়ায়। টাইম জোনে সে এখান থেকে দু'ঘণ্টা এগিয়ে। ওর রাত ১২টা ধরার জন্য আমাদেও এখানকার সময় ঠিক রাত ১০টায় কল করতে হবে। ড্রাংকার্স গ্রুপের কো-অর্ডিনেটর রাইসকে উইশ করব কিন্তু হাত খালি থাকবে, এটা তো হতে পারেনা...। এই রেস্টুরেন্টে জাপানি সাকে পাওয়া যায়। খাবার অর্ডার দিয়েই বললাম দুই বোতল হট সাকে আগে দিয়ে যেতে। তিনজন সাকে হাতে নিয়ে রাইসকে সারপ্রাইজ ভিডিও কল দিয়ে উইশ করলাম। আমরা তিন ইডিয়ট যে এক সাথে হয়েছি, আগে কাউকেই জানাইনি। রাইসকে সারপ্রাইজ দিতে গিয়ে আমরা পেলাম আরেকটা সারপ্রাইজ গুড নিউজ। সে কেনিয়া থেকে জর্ডানে ট্রান্সফার হয়েছে প্যালেস্টাইনের গাজা রেসপন্স-এর গুরুত্বপূর্ণ পদে। প্যালেস্টাইনে আমাদের কোনো অফিস নেই। জর্ডানের রাজধানী আম্মান থেকে প্যালেস্টাইনের দাফতরিক কাজ করা হয়। সেই কলেই আমরা ডিসাইড করে ফেলি, আমাদের থ্রি ইডিয়টস-এর পরবর্তী গন্তব্য হবে জর্ডান ও মিসর; হোস্টেড বাই রাইস।

রেস্তোরাঁয় অর্ডার দেয়া সুশি প্ল্যাটার, সাশিমি, সুকিয়াকি, ড্যাংগো, তাকোয়াকি চলে এসেছে। প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত আমরা, খাবারগুলোও সুস্বাদু। তাই এ রাত শুধু ভুরিভোজনের। সুকিয়াকি, সাশিমি আর একটা রামেন আবার অর্ডার করা হলো। অর্ডারের সাইজ

শহরবাসীর প্রিয়বাহন সাইকেল

দেখে নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছেন, আমরা কী পরিমাণ খেতে পছন্দ করি। রুবাইয়াও আমাদের পাল্লায় পড়ে খাওয়া শিখে ফেলেছে। একবার এক কলিগের বাসার ছাদে আমরা বারবিকিউ পার্টি করেছিলাম। সেখানে ২৪ জনের মধ্যে 'চিকেন ইটিং কম্পিটিশন' হয়েছিল। সবাইকে অবাক করে সেই ২৪ জন খাদকের মধ্যে থার্ড হয়েছিল রুবাইয়া।

নৈশাহার শেষ করে আজকে রাতের পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করে ফেলি। আশপাশে ঘুরঘুর করতে করতে আমরা এগিয়ে যাব এই পাপের শহরের রেড লাইট ডিস্ট্রিক্টে। অ্যামস্টারডামের রেড লাইট ডিস্ট্রিক্টের ইতিহাস কয়েকশ' বছরের পুরোনো। ১৪ ও ১৫ শতাব্দীর দিকে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির (ঠেঙঈ) মাধ্যমে ডাচরা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবসা সম্প্রসারিত করে এবং অ্যামস্টারডাম পরিণত হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরীতে। সেই সময় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা নাবিকরা এখানে আসতেন। তাদের বিনোদনের চাহিদা মেটাতে ধীরে ধীরে বিভিন্ন পানশালা, পতিতালয় ও বিনোদন কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৮ শতাব্দীতে অ্যামস্টারডামে যৌন ব্যবসা বৈধ করা হলে রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট আরও বড় ও বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ১৯৯০-এর দশকে এই এলাকা পর্যটকদের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখন এখানে শুধু যৌনকর্ম নয়। বরং শিল্প, ইতিহাস ও সংস্কৃতির মিশ্রণও দেখা যায়। কড়া পুলিশি ব্যবস্থা ও ইমারজেন্সি মেডিক্যাল সার্ভিস রয়েছে পর্যটক এবং যৌনকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য। পুরো এলাকা ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি দিয়ে মনিটর করা হয়। আমাদের সামনেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকা এক লোককে মুহূর্তের মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে গেল হাসপাতালে।

অ্যামস্টারডামে তিনটি রেড লাইট ডিস্ট্রিক্ট আছে। আমরা এসেছি সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত 'ডি ওয়ালেন'-এ। সন্ধ্যার পর থেকে জমতে শুরু করে এই এলাকা। রাত বাড়ার সাথে সাথে এখানকার অলিগলিতে নামে মানুষের ঢল। এখন এই রাত পৌনে ১২টার সময়ও লোকে লোকারণ্য। এখানে খাল, ছোট ছোট ব্রিজের পাশাপাশি অনেক ক্যাফে, পাব, সেক্স শপ, পিপ শোর পাশাপাশি লাল আলোয় আলোকিত বেশ কিছু সরু গলিতে আছে সারি সারি 'উইন্ডো ব্রোথেল'। প্রতিটি চেম্বার আলাদা। সেই লাল আলোর ঝলমলে চেম্বারের লম্বা কাচের জানালায় দাঁড়িয়ে ভেতর থেকে স্বল্পবসনা রমণীরা কৌতূহলী চোখে পর্যটকদের দিকে তাকিয়ে, কেউবা হাসি ছড়িয়ে, হাত নাড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। চোখের ভাষায় কথা বলছে।

আমার হাতের মোবাইল ফোনটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেলি। ছবি তোলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিছু জানালায় ভারী পর্দা টেনে দেয়া, কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। আবার কোনোটায় নেভানো। কিছু চেম্বারে লাল আলোর পরিবর্তে নীল আলো জ্বলছে। ডি ওয়ালেনে নারী যৌনকর্মীরা তাদের চেম্বার আর জানালা লাল বাতি দিয়ে আলোকিত করে। ট্রান্সজেন্ডার যৌনকর্মীরা নীল বাতি ব্যবহার করে। রাত যত গভীর হচ্ছে, পরিবেশ তত বর্ণিল হয়ে উঠছে। চারদিকে ক্যানাবিসের ছড়াছড়ি। মারিজুয়ানা ও ক্যানাবিস সফ্ট ড্রাগ হিসেবে গণ্য ও ব্যক্তিগত সেবনকে অপরাধ হিসেবে ধরা হয় না। শুধু লাইসেন্সধারী

সরু, প্যাঁচানো সিঁড়ির ফাঁদে আমরা তিনজন

অ্যামস্টারডামের বিখ্যাত ক্যাফে 'Cafe de Sluyswacht'

নির্দিষ্ট ক্যাফে আর দোকানে কিছু শর্ত মেনে এসব বিক্রি হয় আর খাওয়াও যায়। একটা ক্যানাবিস ক্যাফেতে উঁকি দিলাম। লোকে লোকারণ্য, ধোঁয়ায় অন্ধকার। মজার ব্যাপার, ক্যানাবিস ক্যাফের ভেতর আবার অ্যালকোহল ড্রিংক নিষিদ্ধ।

রেড লাইট ডিস্টিক্টের অলিগলিতে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পৌঁছে গেলাম ঝখঅওঘঞঙউ নামে এক আইরিশ পাবে। এখানকার আইরিশ পাবগুলোর বেশ সুনাম। খুব জমজমাট। সেখানে একটা লং আইল্যান্ড আইস টি অর্ডার করি। কয়েকটা বিয়ার নিয়ে টেবিলে বসি। বিয়ারে চুমুক দিতে দিতে দেখলাম বারটেন্ডার কত যত্ন নিয়ে আমাদের জন্য লং আইল্যান্ড আইস টি বানাচ্ছে। পাব ভর্তি অনেক লোক। একটার পর একটা গান বেজে যাচ্ছে। গানের তালে তালে সবাই নাচছে আর গানে গলা মেলাচ্ছে। আমরা নাচানাচিতে না নামলেও সবার সাথে গানে গলা মেলালাম। আশপাশে কেউ আধ মাতাল, কেউ পুরোই মাতাল। কিন্তু কেউ হুড়োহুড়ি করছে না; বিব্রতকর কোনো মাতলামি করছে না। দিল খোলা পরিবেশ। ঘণ্টাখানেক পাবে কাটিয়ে চলে এলাম এখানকার বিখ্যাত 'স্ট্রুপওয়াফেলস'-এর জন্য 'ভ্যান ওয়ান্ডারেন'। রিভিউ পড়েছি, এটা নাকি খুব বিখ্যাত। আমার কাছে খুব আহামরি লাগল না। আমাদের দেশের 'ওয়াফেল-আপ' এর ওয়াফেলসের মতোই। রাত পৌনে ৪টা। আমাদের আবাস

মৌমাছির ডেরায় হেঁটে ফিরতে হলে প্রায় তিন কিলোমিটার হাঁটতে হবে। হেঁটেই ফিরব ভাবছিলাম, কিন্তু আকস্মিক ঝুম বৃষ্টি। উবারে ১৮ ইউরো খসিয়ে হোস্টেলে ফিরে হট শাওয়ার নিয়ে পূত-পবিত্র হয়ে যে যার খুপরিতে ঢুকে পড়লাম।

সকালের অ্যামস্টারডাম ও ব্রেকফাস্ট: আজকের দিন শুরু হচ্ছে এখানকার বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট লাগোম-এর ব্রেকফাস্ট দিয়ে। মৌমাছির ডেরা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে শুরু করি লাগোমের নিশানায়। সকাল বেলায় ট্রামের টিংটিং আর সাইকেলের টুংটাং আওয়াজ ভালোই লাগছে। একটা রেসিডেন্সিয়াল এলাকার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ল ছোট ছোট তাক ভর্তি বই। এখান থেকে বই নিয়ে আপনি পড়া শেষে আবার ফেরত দিতে পারেন। চাইলে আপনার বইও রেখে যেতে পারবেন। এক মধ্যবয়স্ক কাপল রোদে দাঁড়িয়ে বই উল্টেপাল্টে দেখছে। এই আইডিয়াটা আমি আরো অনেক দেশে দেখেছি। সম্প্রতি আমাদের দেশেও ধানমন্ডি লেকের পার্কে এই মিনি লাইব্রেরি ব্যাপারটা শুরু করে হৈচৈ ফেলে দিয়েছে আমাদের বন্ধু 'রূপা'।

অ্যামস্টারডামের পথে পথে অসংখ্য ফুলের টব। সেখানে ফুটে আছে নানা রঙের ফুল। যে ব্রিজের মাঝখানে এখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেখানেও কয়েকটা টব, তার মাঝখানে একটা পুরোনো সাইকেলকেও ফুলের টবে রূপান্তর করা হয়েছে। পথে পড়ল অ্যামস্টারডামের বিখ্যাত ক্যাফে ঈধভব ফব ঝষঁুংধিপযঃ. এর মূল ভবনটা নির্মিত হয়েছিল ১৬৯৫ সালে স্লুইস কন্ট্রোল রুম হিসেবে। এখান থেকে স্থানীয় খালের পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হতো। ২০ শতকের মাঝামাঝি পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আধুনিকায়নের ফলে এটা পরিত্যক্ত হয়। পরে ইট ও কাঠের তৈরি অপূর্ব স্থাপত্যশৈলীর পুরোনো ভবনটি ক্যাফেতে রূপান্তর করা হয়। ঐতিহাসিক এই স্থাপনাটি এখন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলা যায়। এখানে নিয়মিত আর্ট এক্সিবিশন, সাহিত্য আড্ডা, গানবাজনার আয়োজন হয়ে থাকে। ক্যানেলের কোলে বসে গরম গরম কফি বা অ্যামস্টারডামের বিখ্যাত বিয়ার উপভোগ করার জন্য আদর্শ জায়গা এটা।

বলাবাহুল্য, বিশ্ববিখ্যাত হাইনিকেন বিয়ার ফ্যাক্টরি এই শহরেই। লাগোমে পৌঁছে দেখি ভেতরে-বাইরে কোনো টেবিল খালি নেই এবং ওয়েটিংয়ের সবাই লাইন ধওে দাঁড়িয়ে আছে। এক ডজন ক্ষুধার্ত ট্যুরিস্টের পেছনে আমরাও দাঁড়িয়ে যাই। মিনিট দশেক অপেক্ষার পর একটা টেবিল পাই। আগের রাতে আমি অনেক বিয়ার খেয়েছি, আর ভাগাভাগি করে এক পিচার লং আইল্যান্ড আইস টি। তাই মেন্যু থেকে বেছে নিলাম হ্যাংওভার ব্রেকফাস্ট আর জিঞ্জার অরেঞ্জ। রুবাইয়া আর রিগ্যান নিয়েছে প্যানকেক অব দা ডে, ব্লুবেরি ফ্রেঞ্চ টোস্ট, সাথে ওয়াটারমেলন স্মুদি আর জিঞ্জার অরেঞ্জ।

অ্যামস্টারডামে ছিলাম ৪ দিন। বিখ্যাত কয়েকটা মিউজিয়ামে ঘুরেছি। ইচ্ছেমতো খাওয়া-দাওয়া করেছি। আর এই বহুরূপী শহরের পথে পথে হেঁটে উপভোগ করেছি তার রূপ। যে রূপ অপরূপ, যা বলে শেষ করার নয়।

এক খণ্ড ঝাড়খণ্ড

মাসরুর-উর-রহমান আবীর

আছি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের এক্কেবারে ভেতরের বিলাসবহুল কক্ষে। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা। শুনতে আশ্চর্য শোনালেও ঘটনা সত্যি। ভারতে এসেছি ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব বার্নস ইন্ডিয়া নামে সংগঠনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশ নিতে। সম্মেলনের ভেন্যু রাঁচি শহর। আর তাই প্রথমবারের মতো আমাদের ঝাড়খণ্ডে আগমন। এ রকম আন্তর্জাতিক সম্মেলন পর্যটনের আকর্ষণ আছে এ রকম শহরগুলোতে হয়ে থাকে, আর অংশগ্রহণকারীদের ‘রথ দেখা কলা বেচা’ দুই-ই কপালে জোটে।

এক সময় রাঁচি ছিল বিহার রাজ্যের অংশ। ২০০০ সালে বিহারের দক্ষিণ দিকের অংশবিশেষ নিয়ে তৈরি হয় নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ড। তখন থেকেই ঝাড়খণ্ডের রাজধানী শহর রাঁচি। রাঁচির বিখ্যাত ক্রিকেট জেএসসিএ স্টেডিয়ামের ভেতরে কান্ট্রি ক্রিকেট ক্লাব রিসোর্টে আমাদের কনফারেন্সের আয়োজন, আর তাই সেখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা।

স্টেডিয়ামের অন্দরমহলে ঢুকে আমরা তো অবাক! ড্রয়িং-ডাইনিং রুম আর বিশাল বড় বেডরুম মিলিয়ে আস্ত একটা স্যুট দেওয়া হয়েছে আমাকে। অবাক হই, তবে মুগ্ধ হই তার চেয়েও বেশি। রুম থেকে বের হয়ে কয়েক পা হেঁটেই স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে হাজির হওয়ার বিরল অভিজ্ঞতার হাতছানি আমাকে মুগ্ধ করে। সামনে উজ্জ্বল সবুজ ঘাসের চাদরে ঢাকা বিপুলায়তন ডিম্বাকৃতি ক্রিকেট স্টেডিয়াম; মাঠের ঠিক ওপাশেই এমএস ধোনি প্যাভিলিয়ন।

২.

মাঠে গিয়ে ক্রিকেট খেলেছি খুব কম। কিন্তু টিভির সামনে কিংবা পেপার বা ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে ক্রিকেটে কেটেছে অনেকটা সময়। ক্রিকেট সম্পর্কিত খুঁটিনাটি ইতিহাস নিয়ে আগ্রহ আমার চরম পর্যায়ের। এই কান্ট্রি ক্রিকেট ক্লাবের করিডোর ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় দু'পাশের দেওয়ালের ছবি দেখে মনে হয়, আমি ক্রিকেট দুনিয়ার ইতিহাসের ভেতর ঢুকে গেছি। আগেই জানতাম, জেএসসিএ স্টেডিয়াম মহেন্দ্র সিং ধোনির নিজের স্টেডিয়াম। এখানে ধোনির জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলোর বড় বড় ছবি রয়েছে। থাকাই স্বাভাবিক। আছে ভারতীয় ও বিশ্ব ক্রিকেটের বিভিন্ন গৌরবময় মুহূর্তের দারুণ সব ছবি। আমি বাচ্চাদের নিয়ে হেঁটে হেঁটে নানান ছবির জাদুকরী মুহূর্তের বর্ণনা দিতে থাকি। ওরা ক্রিকেটারদের স্বাক্ষর করা ব্যাট দেখে খুশি হয়। সব বিশ্বকাপের ট্রফি হাতে অধিনায়ক কিংবা দলগুলোর ছবি দেখে নানান

শীতের শেষপ্রান্তে নানান ধারায় বিভক্ত জলপ্রপাত

পাত্রাতু লেকের পাড়ে সারি সারি শিকারা

কথা জানতে চায়। তবে ২০১১ বিশ্বকাপের শেষ বলে হেলিকপ্টার শটে ছক্কা মেরে সেই ভঙ্গিমায় ধোনির স্থির হয়ে থাকা ছবিটা দেখে আমিও স্থির হয়ে যাই। ধোনির স্টেডিয়ামে দাঁড়িয়ে অনুভব করার চেষ্টা করি সেই মুহূর্তে ধোনির অনুভূতি। নাশতা করে বেরিয়ে পড়ি আমরা।

রাঁচি স্বাস্থ্যকর এলাকা হিসেবে পরিচিত। রাজধানী কলকাতা থেকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য মানুষ এখানে আসতেন। আবার মানসিক রোগীদের চিকিৎসার জন্যও রাঁচি বিখ্যাত। সেই ১৯১৮ সালে ব্রিটিশরা রাঁচি ইউরোপিয়ান লুনাটিক অ্যাসাইলাম নামে এক হাসপাতাল স্থাপন করে মূলত ব্রিটিশ রোগীদের জন্য। পরে সেখানে ভারতীয় রোগীদেরও চিকিৎসা শুরু হয়।

আমরা যাচ্ছি রাঁচি শহরের আশপাশেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের খোঁজে। প্রথম লক্ষ্য পাত্রাতু ভ্যালি। রাঁচি থেকে সোজা উত্তর দিকে রওনা দিয়ে শহর থেকে বেরিয়ে পড়ি। রাঁচির সীমানা পার হয়ে রামগড় এলাকায় ঢুকতেই শুরু হয় পাহাড়ি পরিবেশ। বাতাসটা ঠাণ্ডা, আর রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা। চুলের কাঁটা বা হেয়ারপিন তৈরি হয় সোজা একটা ধাতব শলাকাকে ইউ-টার্ন নিয়ে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে। তাই পাহাড়ে ওঠার বাঁকবহুল রাস্তার বাঁককে বলে হেয়ারপিন বেন্ড। আমরা দার্জিলিং কিংবা পোখরায় ওঠার রাস্তার মতো একের পর এক হেয়ারপিন বেন্ড পার হতে থাকি। মনে হয় আমরা কোনো হিল স্টেশনে যাচ্ছি। এক জায়গায় রাস্তার পাশে গাড়ি থামে। এটা পাত্রাতু ভ্যালি ভিউ পয়েন্ট। এই পয়েন্টে দাঁড়িয়ে সামনে ছোট-বড় পাহাড় দেখা যায়। প্রতিটা পাহাড়ের গায়ে লেগে আছে মসৃণ একখানা রাস্তার বাঁক। সব

আঁকাবাঁকা রাস্তায় এক সাথে নজর বুলিয়ে মনে হয় সামনে অলস ভঙ্গিতে এঁকেবেঁকে শুয়ে আছে বিশাল মোটা একটা সাপ। সেই সাপের আশপাশেই ছড়ানো সবুজ উপত্যকার স্নিগ্ধ রূপ।

১৯৬২ সালে রাশিয়া সরকার এখানে একটা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করে দেয়। তারই প্রয়োজনে নলকারি নামে নদীতে বাঁধ দিয়ে তৈরি হয় কৃত্রিম হ্রদ। আমরা পাত্রাতু ড্যামের পাশের পাত্রাতু লেকে হাজির হই। ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে বিশাল লেকের গা ছুঁয়ে। তিরতির করে কাঁপছে লেকের পানি। তার উপর লম্বা ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে সাদা রঙের গাঙচিলের ঝাঁক। স্পিডবোটে চড়ে লেকে ঘোরা যায়। কিংবা সুসজ্জিত শিকারায় চেপে। আমরা একটা শিকারায় চেপে বসি। লেকের পাড়েই আইসক্রিম আর ফালুদার ভ্যান। ভারতে বসে নানা রকম বাদামকুচি আর দুধ দিয়ে বানানো পানীয় পানের সুখকর অভিজ্ঞতা আছে আমার। তাই আবারও স্পেশাল ফালুদা আর সুস্বাদু কাজু শেক চেখে দেখতে একেবারেই ভুল করিনি।

৩.

রাঁচির উত্তর থেকে এসে রাঁচি শহর পার হয়ে চলতে থাকি দক্ষিণমুখী পথে। শহরের আশপাশের সব হাইওয়েই চওড়া, পরিচ্ছন্ন আর নিখুঁত মসৃণ। তাই গাড়ি ছোটে সরকারি নিয়মের মধ্যে থেকে সর্বোচ্চ গতি নিয়ে। রাঁচিকে বলা হয় জলপ্রপাতের শহর। সিটি অব দ্য ওয়াটারফলস। হুন্ড্রু ফলস, দাসাম ফলস, জোনহা ফলস, পঞ্চগড় ফলস, সীতা ফলস, রাজরাপ্পা ফলস– এ রকম অনেক জলপ্রপাত ছড়িয়ে আছে রাঁচির আশপাশে। আর তাই রাঁচিতে এসে একটা জলপ্রপাত অন্তত দেখতেই

দাসাম ফলসের সামনে সপরিবারে

হয়। আমরা যাচ্ছি দাসাম ফলসের দিকে। প্রাচীন মুন্ডারি ভাষায় 'দা' মানে পানি আর 'সং' মানে ঢেলে দেওয়া বা পূর্ণ করা। এ দুই শব্দ মিলেমিশে অপভ্রংশ হয়ে এক সময় হয়ে যায় 'দাসাম'। কারণ এখানে ঐশ্বরিক নির্দেশে পানি ঢেলে এক অপূর্ব অবয়ব তৈরি হয়েছে নিরেট পাথরের বুকজুড়ে।

দূর থেকেই বিপুল পরিমাণ পানি পড়ার তীব্র আনন্দময় শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে সামনে এসে পাথরের বিরাট ক্যানভাসে আঁকা জলরাশির এমন তেজস্বী সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। সে সিঁড়ির একেক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঝরনার একেক রূপ চোখে পড়ে। একেবারে নিচে নেমে পানির তোড়ে মসৃণ হয়ে যাওয়া বিপুলায়তন পাথওে দাঁড়িয়ে চোখে পড়ে আরেক সম্পূর্ণ রূপ। এই দাসাম ফলস কাঞ্চি নামে নদীর পথে ১৪৪ ফুট উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৈরি হয়েছে। বর্ষাকালে দারুণ চওড়া চেহারা নিয়ে নেমে আসে উপর থেকে নিচে। তবে আমাদের যখন শীতের শেষ প্রান্তে সেখানে হাজির হয়েছি, তখন প্রপাত অতটা চওড়া নেই, বরং বেশ কয়েকটা আলাদা ধারা তৈরি হয়েছে। তবু এই মৌসুমেই তীব্র গতির জলপ্রপাত দেখে মুগ্ধ হতে হয়। ঘোর বর্ষায় এলে কেমন লাগবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটাই ভাবছিলাম। তাড়াতাড়ি ভেন্যুতে ফিরে আসি। সন্ধ্যায় শুরু হয় কনফারেন্সের প্রস্তুতি। ব্যস্ত হয়ে পড়ি বিভিন্ন দেশের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জনদের সাথে।

ট্যাগোর হিলে ওঠার সিঁড়ি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভগ্নপ্রায় বাড়ি

৪.

সূয্যিমামা জাগার আগেই আমি জেগে উঠি। বাইরে তখনো অমানিশা। রাঁচির আবহাওয়া খুবই অদ্ভুত। ভরদুপুরে চামড়া জ্বালানো চিড়বিড়ে গরম পড়ে। আবার মধ্যরাতে হাড় কাঁপানো শীত। সকাল হলে আকাশ পুরো ফকফকা। অথচ সেদিন ভোরবেলা সবকিছু কুয়াশার মোটা চাদরে ঢাকা। সোয়া ৬টায় বাইরে আলো থাকার কথা, কিন্তু জানালার বাইরে মৃদু ঘোলাটে আভা ছাড়া কিছুই নেই। রুম থেকে বের হয়ে স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে গিয়ে মাঠ কিংবা ঐ পাশের প্যাভিলিয়ন, কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু আমাকে এই ভোরেই বের হতে হবে। ফিরে আসব কনফারেন্সের কাজকর্ম আর নাশতার আগেই। ভগবান বিষ্ণু ও তার অবতার কৃষ্ণের এক বিশেষ বিমূর্ত রূপ হচ্ছে জগন্নাথ। বরকাগড়ের রাজা ঠাকুর অনিনাথ শাহদেও ১৬৯১ সালে প্রভু জগন্নাথদেবের স্মরণে রাঁচির এক টিলার উপরে মন্দিও প্রতিষ্ঠিত করেন। এই মন্দির ঘিরেই মূলত রাঁচি শহর তৈরি হতে থাকে। পুরীর জগন্নাথ মন্দির খুব বিখ্যাত হলেও রাঁচির এই জগন্নাথ মন্দিরও বেশ খ্যাতনামা। ১৯৯০ সালে ৩০০ বছর বয়সী এই মন্দিরের গর্ভগৃহ ভেঙে পড়লে পুরো মন্দির পুনর্নির্মাণ করা হয়।

আমি গেট থেকে বের হয়ে দুর্দম দুর্মদ দুর্ভেদ্য কুয়াশার মধ্যেই হনহন করে হাঁটা শুরু করি। ম্যাপে দেখেছি, মাত্র দুই কিলোমিটার দূরেই জগন্নাথ মন্দির। ১৫/২০ মিনিট হাঁটার পর দেখি সামনে এক পাথরের টিলা। ধোঁয়া ধোঁয়া অস্পষ্টতার মাঝে উপরে যাওয়ার পথের হদিস বুঝি না। রাস্তায় পথচলতি একজনকে জিজ্ঞেস করায় সে বলে এখান থেকেই পাহাড় বেয়ে উঠে যেতে। তার কথায় পাত্তা না দিয়ে টিলার পাশ

দিয়ে হাঁটতে থাকি। ওপাশেই আছে উপরে ওার সিঁড়ি আর ঢালু রাস্তা। টিলার নিচ থেকেও উপরে কিছু দেখা যায় না। সবকিছুই অদৃশ্য। তবে নিচে উচ্চনাদে ধর্মীয় গান শোনা যায়। ছোট্ট দোকানে সাজানো দেখা যায় ফুল, নারকেল, নকুলদানা, রঙিন কাপড়। মানুষ কতভাবে নৈবেদ্য সাজিয়ে স্রষ্টাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে! সিঁড়ি বেয়ে টিলার চূড়ায় উঠে মন্দির দেখা যায়, তবে তখনও মন্দিরের চূড়া কুজ্ঝটিকার অন্তরালে। আমি একটা বেঞ্চে বসে থাকি প্রায় আধা ঘণ্টা। অবশেষে একটুখানি সূর্যের আলো দেখা গেলে ঢুকে পড়ি মন্দিরের ভেতরে। মন্দিরের সাদা রঙের ধাপে ধাপে ডিজাইনের মাঝে মাঝে গোলাপি নকশার ছোঁয়া। ভেতওে জগন্নাথদেব আর সাথে ভাই বলরাম ও বোন সুভদ্রার মূর্তি। সবাই বড় বড় গোল চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

৫.

বের হয়ে কিছুক্ষণ পর রওনা দিই আরেক দিকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৌদি ছিলেন কাদম্বরী দেবী। তার বড় ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। রবি ঠাকুরের অনেক অনেক রচনার মূল অনুপ্রেরণা ছিলেন কাদম্বরী। রহস্যজনকভাবে আত্মহত্যা করেন কাদম্বরী। সে ঘটনা নিয়ে বিতর্ক কম নেই। এদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে তীব্র প্রভাব ফেলে এই মর্মান্তিক ঘটনা। ধীরে ধীরে দৈনন্দিন সব কাজ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন তিনি। সাহিত্য, চিত্রশিল্প, ব্যবসা সবকিছু ত্যাগ কওে তিনি কলকাতা থেকে রাঁচি চলে যান। একটা পাহাড় কিনে নিয়ে বাড়ি তৈরি করেন। সেই বাড়িতে বাস করতেন আর প্রায় সারাদিন পাহাড়চূড়ার এক ছাউনির নিচে উদাস মুখে বসে

ট্যাগোর হিল থেকে দেখা রাঁচি

থাকতেন। ১৯১০ থেকে দীর্ঘদিন রাঁচিতে নির্জনবাসে থেকে ১৯২৫ সালে এখানেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি।

ট্যাগোর হিলের নিচে পৌঁছে দেখি আশপাশে প্রচুর নির্মাণসামগ্রী। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে খেয়াল করি, সব জায়গায় সংস্কারের ছোঁয়া। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাড়িটা অবহেলা-অনাদরে প্রায় পরিত্যক্ত। পাহাড়ের এক পাশের ঢালে তৈরি করা সাদা দালানের বাইরের লম্বা লম্বা থাম একে সম্ভ্রান্ত আর রাজকীয় চেহারা দিয়েছে। কিন্তু ভেতরের ঘরগুলো ফাঁকা আর অপরিচ্ছন্ন। আবর্জনার কারণে কিছু ঘর থেকে দুর্গন্ধও ভেসে আসে। এখান থেকে বের হয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকি। অনেক সিঁড়ির কোনা ভেঙে পড়েছে। তবু প্রায় সাড়ে ৩০০ সিঁড়ির ধাপ পার হয়ে উঠে চূড়ার নকশাদার পুরোনো ছাউনিকেও বাঁশের মাচার মাঝে দেখি। সেখানেও সংস্কার চলছে।

পাহাড়ের উপর থেকে চারদিকে রাঁচি শহরের প্যানারমিক ভিউ পাওয়া যায়। বিভিন্ন দিকে রাঁচি শহরের সত্যিকারের বিস্তৃতি দেখে আবার নিচের দিকে নামতে থাকি। পথে আবারও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িটা চোখে পড়ে। থিয়েটার, নাটক, সংগীত, আঁকাআঁকি আর ব্যবসা নিয়ে বিপুল জমজমাট জীবন কাটানো একজন প্রতিভাদীপ্ত স্বপ্নদ্রষ্টা স্ত্রী-বিহনে কী সীমাহীন বৈরাগ্যে এখানে আশ্রয় নেন! প্রায় ১৫ বছর ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে একাকী বসবাস করে এক সময় নিভৃতেই পরলোকগমন করেন!

কালিম্পঙয়ের সেই সন্ধ্যা

মাহমুদ হাফিজ

কালিম্পঙ বাসস্ট্যান্ডে যখন পৌঁছি, ছোট্ট পাহাড়ি শহরে তখন সবে সন্ধ্যা। সুদর্শন তরুণ সুমো চালক রিনি গুরুং গাড়ির ছাদে রশিতে বাঁধা লটবহরের শক্ত গিঁট খোলায় মগ্ন। একেকটি লাগেজের বাঁধন আলগা করছে আর নিচে অন্য ড্রাইভারের বাড়ানো হাতের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে। রিনি গুরুংকে সাফ জানিয়ে দিয়েছি– আমি লাগেজ ধরতে পারব না; আমার 'ফ্রোজেন শোল্ডার'।

নেপালি বংশোদ্ভূত গুরুং জাতিগোষ্ঠির অল্পবয়সী চালক রিনি 'ফ্রোজেন শোল্ডার' বা এর ব্যথার হদিস না জানলেও বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বুঝেছে– নিক্ষিপ্ত ভারী লাগেজ ধরে মাটিতে নামানো আমার কম্মো নয়। কাজেই বাসস্টপের পরিচিত ড্রাইভার ডেকে হেল্প নিচ্ছে। কোমরে গামছা পেঁচিয়ে ছাদে হামা মেরে একটা করে লাগেজ নামাচ্ছে আর একবার করে আমার দিকে পিট পিট করে তাকিয়ে ভাড়া চুকানোর তাগাদা দিচ্ছে, যাতে সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় শহর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারে। ১৫ কিলোমিটার পাহাড় উজিয়ে আলগারায় নিজের ঘরে ফিরতে হবে তাকে।

দু'দশ রুপি বাড়িয়ে দেয়া আর তার মাধ্যমে হোটেল নেয়ার কথা বলে আমি কালক্ষেপণ করতে চাচ্ছি। সাতজনের যে ভ্রমণদলকে নিয়ে ভরসন্ধ্যায় কালিম্পঙে নেমেছি, তাদের কাউকে ধারেকাছে দেখছি না। গাড়ি থামতেই তারা জোড় বেঁধে উধাও। পর্যটকভরা এ শহরে রাতে থাকার ব্যবস্থা করা ঝক্কি বলে আমার সিক্সথ সেন্স জানান দিচ্ছে। কাজেই গুরুংকে গুডবাই-এর বদলে গাইড বানিয়ে এ রাতে আন জানপহচান কালিম্পঙে হোটেল নিশ্চিত করে নেয়া মন্দ না।

পর্যটকপ্রিয় পাহাড়ি শহর রাত জাগে না। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে সর্পিল রাস্তায় রাত-বিরাতে পর্যটকবাহী গাড়ি চলে না বললেই চলে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় এখানকার হোটেল-হোমস্টে, বোর্ডিংগুলো বুক হয়ে যায়। আগাম বন্দোবস্ত না করে দুর্গম গ্রাম খোলাখাম থেকে হুট করে এসে পড়ায় থাকা নিয়ে মাথায় টেনশন নিতে হচ্ছে এখন। তার উপর ভ্রমণদলের পাঁচজনই কন্যা-জায়া-জননী। বোহেমিয়ান হিসেবে আমাদের 'যাহা রাত তাহা কাৎ' কেতায় বাসস্টপের বেঞ্চে রাত গুজরান চলে। মা-মেয়েদের গড়িয়ে নেয়ার জরুরতে আরামপ্রদ সরাইয়ের বিকল্প নেই। গাড়ি থামার পর সহযাত্রীগণের উধাও হওয়া উদ্বেগে আরও বাড়তি চাপ। থ্যাংক গড, রিনি গুরুং আসার পথে দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এ জনপদের লোভাতুর দ্রষ্টব্য-লাভা ও রিশপ। কালিম্পঙে দেখব রবীন্দ্রস্মৃতিজড়িত গৌরীপুর কটেজ, ঔপনিবেশিক স্মৃতির মরগ্যান হাউজ আর বৌদ্ধ টেম্পলখ্যাত ভিউপয়েন্ট ডেলোপার্ক। উদ্বেগময় বিহঙ্গমনে সেগুলোই প্রশান্তি মাত্র! সাতজনের কম করে ১৪টির শেষ লাগেজটি নিক্ষেপ করে লাফ দিয়ে নিচে নামে রিনি। আসার পথে গাড়িতে আমাদের সস্তার হোটেল সুবন্দোবস্তের তথ্য দিয়েছিল। আমি রিনি গুরুংকে বলি, চলো, তোমার পরিচিত হোটেলে থাকার বন্দোবস্ত দেখে আসি।

কি ইন্ডিয়া কি ইন্ডিয়ানা– সর্বত্র ভ্রমণের একই রেওয়াজ। নগর গ্রামের হোটেল-হোমস্টে সবই পর্যটকবাহী ড্রাইভারদেও চিরচেনা। মাল-সামান পরিচিত ড্রাইভারের জিম্মায় রেখে রিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের আধো অন্ধকার গলিতে উধাও হয়ে যায়। বাসস্টপ ছাড়া এখানকার গলিগুলোতে আলো-আঁধারির খেলা। মানুষের নিত্য দরকারি ও যানমুখী দোকান-কাউন্টার বাদে অন্য পসারের ঝাঁপ একের পর এক নামছে। সন্ধ্যার পরই লোকজন ঘরে ফেরার তাড়ায়। আমাদের চালক বয়সে তরুণ হলেও এলেমদার। সুমোয় দেশ-বিদেশের ভ্রমণিয়াদের বহন করতে করতে মানুষের মাইন্ড রিড করতে শিখে গেছে। গলিপথে চলতে চলতে নীরবতা ভাঙে সে। শুদ্ধ বাংলায় বলে, 'পাহাড়ি দেহাত-শহরগুলো এমনই স্যার। সন্ধ্যার পরই নির্জন। আলো নিভে যেতে খুব বেশি রাত লাগে না।'

আমি ঘুরে বেড়ানো মানুষ। গুরুংয়ের কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। তার পিছু এগিয়ে যাই। শহরের মেলা গ্রাউন্ড ও ত্রিকোণ পার্কের দেয়াল ঘেঁষে ঘুরিয়ে টুরিয়ে সে ডক্টর অংডেন রোডে পুরোনো এক তেতলা ভবনের রিসেপশনে এনে আমাকে দাঁড় করায়। করিডোরে ঢোকার মুখে দেখতে পাই 'থাকার সুবন্দোবস্ত' সাইনবোর্ড।

গৌরিপুর হাউজ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিনিবাস

ভেতরে পা দিয়ে বুঝতে পারি মধ্যবয়স পেরুনো মালিক নিজেই সাতপুরুষের ব্যবসা সামলাচ্ছেন। ভদ্রলোকের মাথার কেশদাম উধাও; তেল চকচকে টাকে আলোর বিচ্ছুরণ। মেদবহুল পেট জানান দিচ্ছে, ভোজনপ্রিয় লোকটি হোটেল নামের গদিঘরে বসে ষাটোর্ধ্ব জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। ত্রিকোণ পার্ক বা মেলা মাঠের খোলা হাওয়ায় দু'দণ্ড সময় হণ্টন বাবদ বণ্টন করেননি জীবনসূচি থেকে। খনার আমলের কবিরাজি টোটকা বা প্রযুক্তি যুগের ইয়োগা, ওয়ার্কআউট ও ন্যাচারাল মেডিসিনের অনলাইন কারবারিদের স্বাস্থ্য বটিকা এখনও এঁর নাগালের বাইরে। যা হোক, এ মুহূর্তে আমার কাজ হোটেল মালিকের চরিত্রচিত্রণ নয়, থাকার বন্দোবস্ত করা।

অবোধগম্য ভাষায় রিনির সঙ্গে কথাবার্তায় বুঝি, এই লোক এ অঞ্চলে নেপাল থেকে আসা গুরুঙ জাতিগোষ্ঠীর, আর রিনি গুরুংয়ের জাতভাই। বাইরের বোর্ড চটকদার রঙে 'থাকার সুবন্দোবস্ত আছে' বাক্যবন্ধের বন্দোবস্তের নমুনা ভেতরে ঢুকেই আঁচ করা যায়। তবু সস্তার তিন অবস্থাটা যাচাই করতে আমি কক্ষ দেখতে আগ্রহী হই। 'তিনতলায় দুটো রুম খালি আছে' বলে চাবিগুচ্ছের সঠিক চাবিটি খুঁজতে খুঁজতে সিঁড়িতে উড্ডীন হন ওজনদার ভুঁড়েল। তাকে অনুসরণের ইঙ্গিত দেন। দেখি, সাধারণ মানের খাট, চৌকি ও শয্যাসজ্জিত কক্ষগুলো বড়ই। হাই কমোডহীন বাথরুমে প্লাস্টিকের ট্যাপের সামনে আধভরা বালতি। পানির দাগের ধকলে ট্যাপ ও বালতির আসল রঙ উধাও হয়েছে বহুকাল। কয় মাস পরপর বালিশ-বিছানার কভার বদল হয়, সে হদিস টেকো মালিকও বলতে পারবেন বলে মনে হয় না। ভুঁড়েল মালিক ভরসন্ধ্যায় সাতজনের দল পেয়ে গদগদ কণ্ঠে বলেন, "এখানে

জলের সমস্যা পাবেন না দাদা। বালতির জলে রাতটা চালিয়ে নিতে হবে। সকালে 'চানের' আগে আমাদের ছেলেরা নতুন জলে বালতি ভরে দেবে।"

'এত জলে পড়িনি'– ঝট করে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে অস্ফুট ধ্বনি। ভুঁড়েল জিজ্ঞেস করেন, 'কিছু বললেন?' উত্তর না দিয়ে 'চলুন নিচে যাই' বলে আমি আগে আগে নামতে থাকি। ঘর দুটোয় চাবি মেরে ভুঁড়েল মালিক নাগাল পাওয়ার আগেই নিচে বসা রিনি গুরুংকে বলি, 'চলো স্ট্যান্ডে যাই।' ফিরে দেখি আমার ছয় সহযাত্রী প্রকট হয়েছেন। যে দ্রুততা ও আকস্মিকতায় তারা উধাও হয়েছিলেন, সমান বেগেই আবার মওজুদ। কেউ দায়িত্ব না দিলেও ভ্রমণকালে মানুষের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া চালাতে চালাতে নানা জায়গা থেকে এক হওয়া ভ্রমণদলের অলিখিত টিম লিডার হয়ে উঠেছি। সহযাত্রীগণও কম যান না। যেন যুদ্ধ ময়দানে অপরাধ করে ফেলার পর সেনাপতির সামনে দাঁড়িয়ে কৈফিয়ত দিচ্ছেন এমন কেতায়, 'ওজরখাহী' পেশ করতে শুরু করেছেন।

জানা যাচ্ছে, ভ্রামণিক কামরুল হাসান পাশের গলিতে ডলার ভাঙানোর ব্যর্থ কসরত করেছেন; পরে বেরিয়েছিলেন হোটেল ঢুঁড়তে। সাতসকালে মাথায় আসা নতুন কবিতার লাইন আওড়াতে আওড়াতে জেগে ওঠা মানুষ তিনি; তার বিশ্রামের সময় অতিক্রমমান। ডুয়ার্সের বিনীতা সরকার বাংলাদেশের নাহিদ সুলতানাকে নিয়ে পরিচিত স্থানীয় একজনকে নিয়ে গলির সোনার দোকান থেকে ডলার বিনিময় করে ফেলেছে। ভ্রামণিক বিনীতা পেশায় শিক্ষক। কথা বলে লোকজনকে কনভিন্স করতে পারা তার স্বাভাবিক দক্ষতা। ভ্রমণে স্বল্পাভিজ্ঞ নাহিদ সুলতানা বিনীতার সঙ্গে অলিখিত জোট কওে ডলার সমস্যা সমাধান করেছে। শিলচরের মিতা পুরকায়স্থ কলেজপড়ুয়া কন্যা বিশ্বরূপাসহ আমার গৃহবন্ধু জলি ফেরদৌসীকে নিয়ে ছুটেছিল বাসস্ট্যান্ডের প্রসাধন কক্ষে। লম্বা লাইন থাকায় সময় লেগেছে। ন্যাওড়াভ্যালির দুর্গম গ্রাম কোলাখাম থেকে লাভা, রিশপ, আলগারাহ হয়ে কালিম্পঙ আসতে পাহাড়ি পথের ঝাঁকুনিতে এখন ক্লান্ত সবাই। ক্ষুৎপিপাসায়ও কাতর। আগে চাই

মরগ্যান হাউজ কালিম্পঙ

মরগ্যান হাউজের সামনে আমার দলের তিন পরিব্রাজক

থাকার যোগাড়যন্ত্র। সবার উধাও হওয়ার সমস্বর কৈফিয়তে মন্তব্য না করে বলি, "এখন হোটেল ঠিক করাই আমাদের মূল কাজ। রিনি গুরুংয়ের 'বন্দোবস্ত' ফেল মেরেছে।"

আকাশআকাঙ্ক্ষী নতুন-পুরোনো ভবনগুলোর মাঝে এক চিলতে সমতল মাঠে গড়ে উঠেছে বাস-ট্যাক্সি স্ট্যান্ড। গাড়ি থামার পর গন্তব্য জানা পর্যটক ও ঘরফেরতা স্থানীয়রা নিরুদ্বেগে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেন। হোটেল না পাওয়া পর্যন্ত আমরা স্ট্যান্ডেরই মুসাফির। সামনে আলো ছড়াচ্ছে আকাশমুখী ভবনগুলোর নিয়ন সাইন। পোখরেল, জানকী, ক্ল্যাসিক, পঞ্চবটি হোটেলের সাইনগুলো উজ্জ্বলতর। তিনজনকে লাগেজ পাহারায় রেখে বাকিরা চার হোটেলের নিয়ন সাইনের নিশানা ধরে ছুটি চারদিকে। আমার ভাগে পড়ে হোটেল জানকী। বিধি বাম। 'বাংলাদেশ' শুনেই জানকী জানিয়ে দিলেন, ভিনদেশি অতিথিতে তাদের অরুচি। ভ্রমণদলে তাদের স্বদেশি ভাই-ভগিনীগণ আছে জেনেও গলে না জমাটবাঁধা জানকীর জান।

আমাদের কালিম্পঙকাল এই রাতটির জন্যই। সিকিম-দার্জিলিঙ যাওয়ার পথে কালিম্পঙে 'স্টপবাই' করে যাচ্ছি। ভ্রমণ ঠিকুজিতে কালিম্পঙের জন্য বরাদ্দ দুই দিন এক রাত। দিনমান ধওে আসার বেলায় জেলার কিছু দেখনকেন্দ্র দেখা শেষ। রাত শেষে আগামী দিনটি পুরোটা হাতে। পড়ন্ত অপরাহ্ণে পরের গন্তব্য সিকিমের গ্যাংটক রওয়ানা দিলেই চলে। রাত গুজরানে সাতজনের জন্য কম করে চারটি কক্ষ চাই। চারদিকে ধাবিত বাকি তিনজনও ফিরে হোটেল না পাওয়ার খবর দেন। এ পর্যায়ে প্রতীতি জন্মে– শহরের এই শীতরাত আমাদের উষ্ণতায় স্বাগত জানাচ্ছে না। একই হোটেলে চারটি কক্ষ মেলানো দুরাশা। প্রত্যাশার বক্সগুলোয় একের পর এক টিকের বদলে ক্রস চিহ্ন পড়তে থাকে। 'পাওয়ামাত্রই বুক'– এই থামরুলে হোটেলের খোঁজে আবার বেরিয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ বাদে ভ্রামণিক কামরুল হাসান প্রথম সুসংবাদটি আনেন। সিঙ্গেল রুম বুক করে তিনি সানন্দে ফেরেন। হোটেলের নাম 'পঞ্চবটি'। চাকা লাগানো মেজেন্টা রঙের লাগেজটি টেনে ঘড়ুর-ঘড়ুর শব্দ তুলে মুহূর্তেই গলির মধ্যে উধাও হয়ে যান। ঘর্ষণমুখরতা আমার কানে বাজে ভিন্নরূপে। মনে হয়, তিনি এ রাতে ঘোড়া দাবড়ে পঞ্চবটি বনের দিকে ছুটে চলেছেন! দ্বিতীয় সুখবর আনে নাহিদ আর বিনীতা। তারাও একটি কক্ষ পেয়ে বুক করে ফেলেছে। এবার চাকাওয়ালা লাগেজের ঘড়ুর-ঘড়ুর শব্দ দ্বিগুণ হয়ে কানে বাজে। হোটেলজয়ীরা দিগ্বিজয়ীর বেশে সমুখপানে ধাবিত হন। পশ্চাতে তাকানোর ফুরসৎ পান না, বলা চলে।

রইলো বাকি চার। এখন দুটি কক্ষ হলেই আমাদের চলে। মুশকিল আসান হিসেবে উদিত হয় মিতা। লেখক ও ব্যবসায়ী মিতা স্বামীর অবর্তমানে ব্যবসা সামলাতে গিয়ে দুনিয়ারি রপ্ত করেছে পুরোদস্তুর। জীবনযাপনের প্রয়োজনে নিখিল বঙ্গ-ভারতে প্রায় সব ধরনের সেবাদাতার সঙ্গে নিবিড় নেটওয়ার্ক শিলচরনিবাসী নীরালম্বী মিতার। এই অসমীয় মা-মেয়ের সঙ্গে কয়েক দিন আমরা মিয়া-বিবি ভ্রমণ করে বুঝেছি, থাকা, যাতায়াত, খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত বা মুশকিল আসানে মিতা সর্বদা যোগাযোগপ্রিয়। তার কমিউনিকেশন-জাল থেকে দূরালাপনে হলেও পরামর্শ নিতে বা ভ্রমণকালে স্টাফদের দূরনির্দেশ দিতে ফোনালাপে শশব্যস্ত সে। মিতাই খবর দেয়, থাকার বন্দোবস্ত হয়ে গেছে। কালিম্পঙে হোটেল বুক করতে মিতা হয়তো ফোনে ধরছে বাংলাদেশ বা বাঙ্গালুরুর কোনো পরিচিতজনকে।

রাত গভীরতার দিকে না গড়াতেই আমাদের লাগেজের চাকাগুলো সক্রিয় হয়। হোটেল পোখরেলের দিকে যেতে ঘড়ুর-ঘড়ুর শব্দ তোলে। পোখরেলে দুটি কক্ষ খালি। ম্যানেজারের শর্ত : 'জলের সঙ্কট। সকালের আগে বাথরুমে জল আসবে না।' আমরা তাতেই সই। বিজলারি পানির বোতল কিনে চালিয়ে নেয়া যাবে ভেবে জলহীন হোটেল কক্ষ চড়া দামে ভাড়া নিতে কালবিলম্ব করি না। হোটেল বিছড়িয়ে ভালো লেসন হয়েছে। জীবন কখনো এমন হালতে ছেড়ে দেয়, যখন অপশনের আলোগুলো একে একে দ্রুত নিভতে থাকে। নিজের অটল অবস্থান টলে

যেদিকে তাকাই পাহাড়পুঞ্জের হাতছানি

যায়। কম্প্রোমাইজ শত হাত মেলে স্বাগত জানায়। আজ সন্ধ্যা রাতের হোটেল সন্ধান থেকে এ শিক্ষাও নেয়া গেল– নিজের খতরনাক হালত মানুষের সাধারণ সৌজন্যবোধেও আলবত আছর করে। আত্মমগ্নতায় আমাদের লাগেজের চাকাগুলো তখন ঘড়ুর-ঘড়ুর শব্দ তুলে সামনে আগুয়ান, পিছনে ফেরে না।

বোতলের পানিতে ফ্রেশ হয়ে পূর্বকথামতো রাত সাড়ে ৯টার পর কালিম্পঙ কিচেনে হাজির হই। উদ্দেশ্য, একসঙ্গে নৈশাহার আর দুপুরে কোলাখাম থেকে রওয়ানা হওয়ার পর যা যা ঘটল তার জাবর। কালিম্পঙ কিচেন কেন? রেস্তোরাঁটি হন্টনবর্তী দূরত্বে, আর আমাদের থাকার হোটেলগুলোর কেন্দ্রে। সবার জন্যই সমান পথ। স্ট্যান্ডের আশপাশে 'পঞ্চবটি'র মতো মিথমথিত নামে ভাত, মাছ, ডাল, তরকারির স্থানীয় রেস্তোরাঁ আকছার। 'কালিম্পঙ কিচেন' নিশিজাগরণেচ্ছু। পর্যটকদেও প্রয়োজনের নিরিখে বহু রাত অব্দি খোলা। পরিবেশ, পরিবেশন ও পরিবেশকদের বেশভূষা কলোনিয়াল হ্যাঙওভারগন্ধী হলেও খাবারের মেন্যু ফিউশনীয়। কাজেই দিনমানের ক্লান্তি ও নানা ভোগান্তি সামলানো পরিব্রাজকদের কেউ যদি ইংরেজ কেতার পরোটার সঙ্গে ডাল মাখনি, চিকেন বারবিকিউ আর শেষপাতে সনাতনী ম্যাংগো চাটনি মেলে ধরে, তখন আর কার না ভালো লাগে!

পছন্দমতো খাবার অর্ডার করে গদিওলা চেয়ারে আরাম করে বসি। খাবার আসার ফাঁকে দিনের ভ্রমণালাপ জমানো যায়। মজমা জমানোর মন নিয়ে সবাই পা-টা মেলে, নড়েচড়ে বসে। আমার মনে হচ্ছে, এসে পড়েছি মিথাশ্রিত সাম্রাজ্য কলোনাইজারদের গড়া পাহাড়ঘেরা স্বপ্নরাজ্যে। আমাদের গায়ে এসে লাগছে কলোনিয়াল হ্যাঙওভারগন্ধী বাতাসদ 'ঔপনিবেশিক ঝুলনমায়া'র মায়াবী গন্ধ।

নায়াগ্রা ফলস দেখে মুগ্ধ

লিজি রহমান

পাহাড়ের মতো জলপ্রপাতও আমাকে খুব টানে। তা সে বাগানের ছোট ফোয়ারা, বৃষ্টিধারা, নদীর স্রোত, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ কিংবা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া সরু ঝরনাধারা বা বিশাল জলপ্রপাত, যেটাই হোক না কেন। নিউইয়র্ক সিটিতে আমার বাসা থেকে বাফেলো যেতে মাত্র ৮/৯ ঘণ্টা লাগে। তাই আমি সুযোগ পেলেই সেখানে নায়াগ্রা ফলস দেখতে চলে যাই। কখনো শুধু নায়াগ্রা ফলসই দেখতে যাই। আবার কখনো বা টরন্টো যাওয়া-আসার পথে নায়াগ্রাকে একটু উঁকি মেরে দেখা। নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখে আমার কখনোই ক্লান্তি লাগে না। এর উঁচু পাড়ে রেলিং ধরে হাজার হাজার পর্যটকের সাথে আমিও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকি। ভীম গর্জনে অনেক উঁচু থেকে জলের অবিশ্রান্ত পতন দেখতে দেখতে আমি যেন হারিয়ে যাই। জলের এই পতনের যেমন কোনো শেষ নেই, তেমনি বিরতিও নেই। পড়ছে তো

পড়ছেই। ফলসের কাছাকাছি গেলে জলের ছিটে এসে গায়ে লাগে। যেন ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছে। আর রোদ উঠলে আকাশে বিশাল রঙধনু দেখা যায়।

নায়াগ্রা নামটি এসেছে নেটিভ আমেরিকানদের ইরোকুয়াস গোত্র থেকে। ওরা নাম দিয়েছিল ‘অনগিয়াহরা’, অর্থাৎ বিশাল জলরাশি। পরে এটি ইংরেজি উচ্চারণে হয়ে গিয়েছে ‘নায়াগ্রা’। নায়াগ্রা ফলসটি পড়েছে আমেরিকা ও ক্যানাডা– এই দু’দেশের সীমানায়। তবে নায়াগ্রার উৎপত্তি আমেরিকাতেই। তাই আমেরিকা থেকে এর শোভা পুরোপুরি দেখা যায় না। নায়াগ্রা ফলসের দৃশ্য ক্যানাডা থেকেই বেশি ভালো দেখা যায়। আমেরিকার বিশাল চারটি লেক– লেক মিশিগান, লেক হুরন, লেক সুপিরিয়র এবং লেক ইরির জল এসে মিশেছে নায়াগ্রা নদীতে। তারপর অনেক খানা-খন্দক, পাহাড়, উপত্যকা পেরিয়ে নায়াগ্রা নদীর জল ঝাঁপিয়ে পড়ছে অনেক নিচে; সুবিশাল গহ্বরে। প্রতি মুহূর্তে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দিয়ে ৭৫,০০০ গ্যালন জল পড়লেও সেই জল কিন্তু কোথাও জমা হচ্ছে না। সেই জলের ধারা গিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কানাডার লেক অন্টারিওতে।

নায়াগ্রা নদীটি আমেরিকার সীমানায় লুনা আইল্যান্ড এবং গোট আইল্যান্ডে এসে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। প্রায় ২০ তলা বাড়ির সমান উচ্চতা থেকে লাফ দিয়ে ফলসের নিচে যে বিশাল গহ্বরে প্রবল বেগে নায়াগ্রা নদীর জল এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার গভীরতাও অনেকটা এই জলপ্রপাতের সমান। ১৮৪ ফুট গভীর এই গহ্বর। জলের ঝাপটা সেখানে সারাক্ষণই ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকে বলে এর নাম দেয়া হয়েছে ‘দ্যা মেইড অব দি মিস্ট পুল’। আর এই পুলে ট্যুরিস্টদের নিয়ে আমেরিকা ও

ফুলের ঘড়ির সামনে
বন্ধুদের সাথে

কানাডার সাইড থেকে

কানাডার পতাকাবাহী কিছু খোলা লঞ্চ ঘুরছে। সেগুলোকে বলা হয় ‘মেইড অব দি মিস্ট বোট’। আধা ঘণ্টা অন্তর লঞ্চগুলো ছাড়ে, আর জলপ্রপাতের যতটা কাছাকাছি সম্ভব গিয়ে ঘুরে আসে। তবে সেটাতে চড়লে জলের প্রবল ঝাপটায় কোনো কিছুই দেখা যায় না। সেই সাথে বাতাসের তোড় আর ঢেউয়ের দুলুনিতে জলপ্রপাতের খুব বেশি কাছে যাওয়া যায় না।

আমি অনেকবার নায়াগ্রা ফলসে গেলেও মাত্র দু’বার এই বোটে উঠেছি। দূর থেকে দেখে বোঝা যায় না, নিচে জলের কী প্রবল তোড়! জলপ্রপাতের কাছাকাছি যতটুকু যাওয়া যায়, তাতেই জলের ভীম গর্জনে কানে তালা লেগে যায়। সেই সাথে আছে মুষলধারে বৃষ্টির চেয়েও প্রবল বেগে জলের ঝাপটা। সবাইকে ভারী রেইনকোট ও লাইফ জ্যাকেট পরে লঞ্চে উঠতে হয়। প্রথমবার কাগজের নৌকোর মতো লঞ্চের দুলুনি আর জলপ্রপাতের প্রবল তোড়ে আমি আমার ছেলে ছোট্ট আসিফকে দু’হাতে আঁকড়ে ধরে ভয়ে সারাক্ষণ আর্তচিৎকার করছিলাম আর ভাবছিলাম, কতক্ষণে এই ভয়াবহ যাত্রা শেষ হবে! কতক্ষণে লঞ্চ গিয়ে ভিড়বে জেটিতে! এরও অনেক বছর পর আবার একবার সাহস করে মেইড অব দি মিস্ট বোটে চড়েছিলাম। এবারও আমার অভিজ্ঞতার কোনো পরিবর্তন হয়নি। এর পর নাকে খৎ দিয়েছি– আর নয়, এই শেষ। তাই এখন নায়াগ্রাতে গেলেও দূর থেকে নায়াগ্রার শোভা দেখে চলে আসি।

নায়াগ্রা নদীর তীরে
পাহাড়ের ওপরে

তিনটি আলাদা ফলস নিয়ে নায়াগ্রা ফলস গড়ে উঠেছে। আমেরিকার সীমানায় আছে 'ব্রাইডাল ভেইল ফলস' ও 'আমেরিকান ফলস'। আর কানাডার সীমানায় পড়েছে 'কেনেডিয়ান ফলস'। ঘোড়ার ক্ষুরের আকৃতি বলে এটাকে 'হর্স শু ফলস'ও বলা হয়। আমেরিকান সাইডে আরেকটি আকর্ষণ হলো 'কেভ অব দি উইন্ড'। এটি একটি প্রকৃতি প্রদত্ত গুহা। এলিভেটর বা লিফট দিয়ে অনেক নিচে নেমে সুড়ঙ্গপথে হেঁটে এই ব্রাইডাল ভেইল ফলসে যেতে হয়। এর ডেকে দাঁড়ালে সামনে জলপ্রপাতের স্বচ্ছ ধারা দেখে মনে হয় খ্রিস্টান নববধূদের সাদা স্বচ্ছ ঘোমটা। ব্রাইডাল ভেইল ফলসের পেছনেই আছে সেই বিখ্যাত 'কেভ অব দি উইন্ড' বা বাতাসের গুহা। বাতাসের প্রবল তোড়ের কারণেই এই নাম। ওখানে গেলে মনে হয় বিরতিহীন ঝড়-তুফানের মধ্যে এসে পড়েছি। এ ছাড়া লুনা দ্বীপে জলপ্রপাতের ধার ঘেঁষে সারি সারি কাঠের পাটাতন দিয়ে সিঁড়ি বানানো হয়েছে। এই সিঁড়ি দিয়েও ব্রাইডাল ভেইল ফলসের পেছনে যাওয়া যায়। জলপ্রপাতের যেখানেই যাই না, সেখানেই প্রচণ্ড জলের ঝাপটা। ভারী রেইনকোট না পরলে ভিজে একসা হতে হয়। এ জন্য নায়াগ্রা ফলসের আশপাশ এলাকায় সব সময় একটু বেশি ঠাণ্ডা লেগে থাকে। তাই ওখানে যেতে হলে সাথে বাড়তি গরম কাপড় না নিলে শীতে কাঁপতে কাঁপতে জলপ্রপাতের শোভা আর উপভোগ করা যায় না। ফলসটা ভালোভাবে দেখার জন্য যেমন বোটে ফলসের নিচে যাওয়া যায়, তেমনি হেলিকপ্টাওে চড়ে ফলসের ওপর দিয়েও ঘোরা যায়, যদিও আমি হেলিকপ্টারে চড়ে ঘুরিনি। এ ছাড়া রাতে আমেরিকা ও কানাডা, দু'দেশ থেকেই জলপ্রপাতের ওপর লেজার বিম দিয়ে আলোকসম্পাত করা হয়। সে এক নয়ন-মনোহর, মায়াবী দৃশ্য!

প্রতি বছর ২০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আসে নায়াগ্রা ফলসের শোভা দেখতে। তাই ট্যুরিস্টদেও মনোরঞ্জনে নায়াগ্রার দুই দিকেই নানা ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আমেরিকান সাইডে আছে নায়াগ্রা ফোর্ট, অ্যাকুয়ারিয়াম, রেইনবো ব্রিজ, আমেরিকার প্রাচীনতম পার্কসহ আরো অনেক আকর্ষণ। আমেরিকার সাইডে নায়াগ্রা নদীর ওপর বানানো হয়েছে রংধনু আকৃতির একটি ব্রিজ, যার নাম 'রেইনবো ব্রিজ'। ওখানে উঠে শূন্য থেকে জলপ্রপাতের অনেকখানিই দেখতে পেলাম, তবে দূরে এবং উঁচুতে বলে জলপ্রপাতের গর্জন বা জলের ঝাপটা খুব একটা টের পেলাম না। নায়াগ্রা ফলসের দু'পারেই গড়ে উঠেছে প্রচুর হোটেল-মোটেল। এ ছাড়াও আছে ক্যাসিনো ও স্যুভেনিরের দোকান, পার্ক, ছোটদের জন্য ফানফেয়ার। অনেক নবদম্পতি নায়াগ্রা ফলসে আসেন তাদের হানিমুন করতে।

কানাডার সীমানায় ফলসের সাথে বিশাল এলাকাজুড়ে আছে একটি মনোরম উদ্যান, কুইন ভিক্টোরিয়া পার্ক। তবে নায়াগ্রা ফলসের শোভা কানাডার সাইড থেকে দেখতেই বেশি ভালো লাগে। তাই ওখানেই আমার বেশি যাওয়া হয়। একবার আমরা কয়েক বন্ধু মিলে কানাডার সাইডে কয়েক দিন কাটালাম। সেবার আমরা নায়াগ্রা নদীতীরে অনেক বেড়ালাম। তখন আবার অন্যরকম অভিজ্ঞতা। দেখলাম, নায়াগ্রা নদীর পাড় ঘেঁষে কত সুন্দর আয়োজনই না করে রেখেছে! পাহাড়ের ঢালে আছে একটি বিশালাকার ঘড়ি। এই ঘড়িতে কোনো নম্বর লেখা নেই, লেখা আছে নায়াগ্রা পার্কস। সবুজ ঘাসের বুকে লাল ফুল দিয়ে তীরের আকৃতি দিয়ে তার উপর হলুদ ফুল দিয়ে একেকটি অক্ষর লেখা।

নায়েগ্রা

রেইনবো ব্রিজ থেকে

প্রতি বছর এই ঘড়ির ফুলগাছগুলো বদলে ভিন্ন রঙে-ঢঙে করা হয়। পাহাড়ের নিচে গুহার ভেতরে ছোট্ট একটি মিউজিয়াম আছে। সেখানে সেসব ফটো বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। আমেরিকায় আসার পর প্রথম দিকে সুযোগ পেলেই আমরা ভ্যাকেশন করতে বাফেলোতে চলে যেতাম। আমেরিকার দিক থেকে নায়াগ্রা ফলসের সৌন্দর্য পুরোপুরি দেখা না গেলেও যতটুকু দেখা যায় সেটুকু দেখেই মুগ্ধ হতাম। পরে ওপারে, অর্থাৎ কানাডা থেকে দেখার পর বুঝলাম, নায়াগ্রার সৌন্দর্য কাকে বলে! আমার ছোট বোন সিসি টরন্টোতে সেটেল করার পর প্রতি বছর আমার কানাডায় দু'তিনবার যাওয়া হয়। বাফেলো হয়ে নায়াগ্রার পাশ দিয়েই যেতে হয় বলে আমরা কানাডার সীমানায় ঢুকেই নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখতে চলে যাই। বিশাল জলরাশি দেখে আমার চোখ-মন দুই-ই জুড়িয়ে যায়। এ ছাড়া দেশ থেকে কেউ বেড়াতে এলে তাদের নিয়ে নায়াগ্রায় ঘুরতে যাওয়া তো আছেই। এভাবে আমার বহুবার নায়াগ্রা দর্শন হয়েছে। কিন্তু এত অসংখ্যবার দেখার পরও নায়াগ্রা আমার কাছে আজও পুরোনো হয়নি। যখনই যাই, নতুন লাগে।

শরৎ কুঠি

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

"প্রয়োজন হইলে, কখন কোন্ স্থানে রামকে পাওয়া যাইবে, ভোলা তাহা জানিত। সে ছুটিয়া গিয়া বাগানের উত্তর-ধারের পিয়ারাতলায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রাম একটা ডালের উপর বসিয়া পা ঝুলাইয়া পিয়ারা চিবাইতেছিল, ভোলা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, দেখবে এস দাঠাকুর, ভগা তোমার কাত্তিককে মেরেচে।

রাম চিবানো বন্ধ করিয়া বলিল, যাঃ-।

সত্যি দাঠাকুর। মা হুকুম দিয়ে ধরিয়েচে, এখনো উঠনে পড়ে আছে; দেখবে চল।

রাম ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িল, এবং ঝড়ের বেগে ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, এই ত আমার গণেশ! বৌদি, তুমি হুকুম দিয়ে আমার গণেশকে ধরালে! বলিয়াই মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া কাটা-ছাগলের মত সে পা ছুঁড়িতে

তোরণে মহেশের কথা 'আল্লা যত খুশি সাজা দিও'.....

লাগিল। শোকটা যে তাহার কিরূপ সত্য, কিরূপ দুর্দম, সে বিষয়ে দিগম্বরীরও বোধ করি সংশয় রহিল না।"

জামাইবাবু, চলুন এবার ভেতরে যাওয়া যাক। বুলা, আমার শ্যালকের ডাকে সম্বিৎ ফিরল। আমি তখনও বাঁ দিকের পুকুরটার দিকে তাকিয়ে। চোখের সামনে ভেসে উঠেছে রামের সুমতির সেই রামের ভালোবাসার কার্তিক গণেশের, গণেশ মাছটা ধরার মর্মান্তিক দৃশ্যটা। এ বিষয়ে শরৎ বাবুর একটা টিপ্পনীর কথাও মনে পড়ছে। তিনি গল্পটি সম্বন্ধে লিখেছিলেন– "পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে পথের দাবীর কাছে রামের সুমতির স্থান নীচে। আমি একটা গৃহস্থ চিত্র লিখিব স্থির করিয়া রামের সুমতির মতো একটা নমুনা লিখি। এই রকম হিন্দু গৃহস্থ পরিবারে যত রকমের সম্বন্ধ আছে সব রকম সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া এক-একটা গল্প লিখিয়া এই বইখানা সম্পূর্ণ করিব। এটা শুধু মেয়েদের জন্যই হইবে। [প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে লেখা, ১২ মে (ডাকমোহর) ১৯১৩, শরৎ সমগ্র, ৫ম-খণ্ড, রিফ্লেক্ট]

ডানদিকের গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম কথাশিল্পী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামতাবেড়ের শরৎ স্মৃতিতে। কর্মসূত্রে হোক বা ব্যক্তিগত কারণ, বাসা ছিল তাঁর অনেক ও নানান জায়গায় ছড়িয়ে। জন্মের পর দেবানন্দপুর, ভাগলপুর, রেঙ্গুন, বার্মা বা শিবপুরের ভাড়া বাড়ি। কিন্তু নিজের বাড়ি বলতে এটাই ছিল তাঁর বাড়ি, যেখানের প্রতিটি কোণায় রয়েছে তাঁর স্পর্শ, তাঁর আবেগের মুহূর্ত এবং তাঁর সব হৃদয়স্পর্শী লেখা। চারদিক গাছগাছালি, পুকুর, ধানি জমি নিয়ে রয়েছে তাঁর এই

বাড়িটা। দোতলা বারান্দা-ঘেরা ৪০ ইঞ্চি চুন-সুরকি, পোড়া ইটের দেয়ালের বাড়ি, কাঠের থাম, পাথর ও মার্বেলের মেঝে। এখানে থাকতেন তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবী ও তাঁর দাদা স্বামী ভেদানন্দ, বেলুড় মঠের মহারাজ।

'আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি কখনো মাপ ক'রো না।' মনে পড়ে গেল মহেশের কথা। গেটের গায়েই লেখা রয়েছে গফুরের সেই উক্তি।

এই শরৎ স্মৃতিতে আসার বহু দিনের ইচ্ছে আজ পূরণ হলো। সকাল সকাল বেরিয়ে পড়েছি কলকাতার রাসবিহারী থেকে একটা গাড়ি ভাড়া করে। খরচ পড়ল ২৯০০ টাকা। প্রায় ৬৩ কিলোমিটার পথ ১৬ নম্বর ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরে হাওড়ার দেউলটি গ্রামের সামতাবেড়ে পৌঁছে গেলাম ঘণ্টা দেড়েকের একটু বেশি সময় নিয়ে। এখানে ট্রেনেও আসা যায়। হাওড়া স্টেশন থেকে দেউলটির ট্রেন ধরে দেউলটি এবং সেখানে নেমে একটা রিকশা কিংবা ভ্যানে শরৎচন্দ্রের এই বাড়িতে পৌঁছা যাবে; ভাড়া ২০/২৫ টাকার মতো।

গেটের ভেতর ঢুকতেই সামনে দেখি যত্ন করে রাখা একটা বহু পুরোনো গাছের গুঁড়ি। আমাদের বলা হলো, এটি হচ্ছে সেই পেয়ারা গাছের গুঁড়ি, যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে 'রামের সুমতি'র রামের সেই সব কীর্তিকলাপ, যা আজও সজীব হয়ে রয়েছে মনে। এই সেই কুঠি, যেখানে কালজয়ী কথাসাহিত্যিক তাঁর জীবনের শেষ ১২টা বছর ১৯২৬ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কাটিয়েছেন। শরৎ বাবুর দিদি আনিলা দেবীর শ্বশুরবাড়ি পাশের গ্রাম গোবিন্দপুরে আসতেন এবং সেই আসা-যাওয়ার মাঝেই এই জায়গাটি পছন্দ হয়ে যাওয়ায় ১৯২৩ সালে জমিটি কিনে ফেলেন। জমির দাম দিয়েছিলেন ১১০০ টাকা এবং বার্মিজ স্টাইলের দোতলা বাড়িটি তৈরি করতে তখনকার দিনে খরচ পড়েছিল ১১,০০০ টাকা। এর নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯২৫ সালে। পাশেই বয়ে চলে রূপনারায়ণ নদী। বলা হলো, সেই সময় নদীটি প্রায় বাড়ির গা ঘেঁষে বইত; এখন বেশ খানিকটা দূরে সরে গেছে। যেহেতু তাঁর শেষ জীবনটা এখানেই কাটিয়েছিলেন, তাই হয়তো এটাকে বলা হয় শরৎ বাবুর বার্ধক্যের বারাণসী। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণে বাড়িতে প্রবেশ করতেই বেশ প্রসন্ন বোধ হচ্ছে। ২০০১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ভবনকে হিস্টোরিক্যাল হেরিটেজ সাইট-এর স্বীকৃতি দেয়। অবশ্য বাড়িটি তত্ত্বাবধানে আছেন তাঁরই ছোট ভাইয়ের নাতি শ্রী জয় চট্টোপাধ্যায়, যিনি কলকাতাবাসী।

সামনেই লম্বা লাল বারান্দা। বারান্দার ডান দিকে রয়েছে খাঁচার মতো একটি বাঁশের ঘর, যাতে থাকত শরৎ বাবুর পোষা ময়ূর। এখন সরকারি নিয়মের কারণে আজ তা শুধুই স্মৃতি। সামনেই একটা ঘর, যেখানে বসে তিনি লেখালেখি করতেন। ঘরের জানালা দিয়ে অদূর দিয়ে বয়ে যাওয়া রূপনারায়ণ নদী দেখা যেত। এখন অবশ্য

বাড়ির পিছনের পুকুরঘাট, পাশ দিয়ে প্রবাহিত হতো রূপনারায়ণ নদী

বারান্দায় দাঁড়ালে মরৎচন্দ্র সৃষ্ট বহু চরিত্রের কথা মনে ভেসে ওঠে

নদীটি অনেকখানি দূরে সরে গেছে। এই ঘরে রয়েছে তাঁর ব্যবহৃত লাঠি; সামনের একটি চেয়ারে রাখা আছে তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর মৃত্যুকালীন ছবি।

লেখক এখানে সৃষ্টি করেছিলেন একের পর এক কালজয়ী সব সাহিত্য: অভাগীর স্বর্গ, রামের সুমতি, পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ে, পথের দাবী ইত্যাদি। ১৯২৭-এর ১৫ জানুয়ারি 'পথের দাবী' উপন্যাসটি তখনকার ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিল এবং বলা হয়েছিল: The most powerful of sedition in almost every page of the book. শিহরণ জাগে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এই জায়গাতেই তিনি লিখেছিলেন সেই সমস্ত উপন্যাস।

মনে পড়ে গেল, 'পথের দাবী'র কিছু সংলাপ ভারতী ও অপূর্বর মধ্যে -ঞ্চ ডাক্তার বাবুর সম্বন্ধে আপনার ভারী কৌতূহল। এ কথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন না কেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু জানা যায় তিনি জানেন, যা কিছু পারা যায় তিনি পারেন। কে তাঁর সব্যসাচী নাম রেখেছিল আমরা কেউ জানিনে, কিন্তু তাঁর অসাধ্য তাঁর অজ্ঞাত সংসারে কিছু নেই। এই বলিয়া সে নিজের মনে চলিতেই লাগিল, কিন্তু তাহারি পিছনে সহসা থমকাইয়া দাঁড়াইয়া অপূর্বর মুখ দিয়া গভীর নিঃশ্বাস পড়িল। অকস্মাৎ এই কথাটা তাহার বুকের মধ্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল যে, এই হতভাগ্য পরাধীন দেশে এত বড়ো একটা প্রাণের কোনো মূল্য নাই, যে কোনো লোকের হাতে যে কোনো মুহূর্তে তাহা কুকুর-শিয়ালের মতই বিনষ্ট হইতে পারে। সমস্ত জগৎবিধানে এত বড় নিষ্ঠুর অবিচার আর কি আছে? ভগবান মঙ্গলময় এই যদি সত্য, এ তবে কাহার ও কোন পাপের দণ্ড?

আরেকটি সংলাপ ভারতী ও সব্যসাচীর মধ্যে– 'ভারতী প্রশ্ন করিল, আচ্ছা, কে আপনাকে সব্যসাচী নাম দিলে ডাক্তারবাবু? এ ত আপনার আসল নাম নয়। ডাক্তার হাসিতে লাগিলেন। কহিলেন, আসল যাই হোক, নকল নামটি দিয়েছিলেন আমাদের পাঠশালার পণ্ডিত মশাই। তাঁর মস্ত উঁচু একটা আমি গাছ ছিল, কেবল আমিই ঢিল মেরে তার আম পাড়তে পারতাম। একবার ছাদ থেকে লাফাতে গিয়ে ডানহাতটা আমার মচকে গেল। ডাক্তার এসে ব্যান্ডেজ বেঁধে গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন।

ভারতী বলিল, বড্ড দুষ্টু ছিলেন ত। ডাক্তার বলিলেন, হ্যাঁ, দুর্নাম একটু ছিল বটে। যাইহোক পরের দিন থেকেই আবার তেমনি আম পাড়ায় লেগে গেলাম, কিন্তু পণ্ডিত মশাই কি করে খবর পেয়ে সেদিন হাতেনাতে একেবারে ধরে ফেললেন। অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বললেন, ঘাট হয়েছে বাবা সব্যসাচী, আমের আশা আর করিনে। ডানটা ভেঙেছে, বাঁ হাত চলছে, বাঁ-টা ভাঙলে পা দুটো চলবে। বাবা আর কষ্ট করো না, যে কটা কাঁচা আম বাকি আছে লোক দিয়ে পাড়িয়ে দিচ্ছি। ভারতী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, পণ্ডিত মশায়ের অনেক দুঃখের দেওয়া নাম।'

বলে রাখি, বাইরে যে পেয়ারাগাছের গুঁড়িটা রাখা আছে, যার সঙ্গে রামের সুমতির বহু গল্পের স্মৃতি জড়িয়ে, ২০১৪ সালে অত্যধিক জল ছাড়ার কারণে তা স্মৃতি হয়ে যায়। পাশে রয়েছে আরেকটি ঘর যেখানে একটি প্রশস্ত বিছানা, তাঁর ব্যবহৃত গড়গড়া, ১০০ বছরেরও পুরোনো ঘড়ি; একদিন দম দিলে যা সাত দিন চলে, একটি চেয়ার, তাঁর ব্যবহৃত একটি বেলজিয়ান গ্লাসের আয়না। এই সেই ঘর, যেখানে আসতেন কিংবদন্তি স্বাধীনতা সংগ্রামীরা– বাঘা যতীন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রাসবিহারী বসু ও অন্যান্য বিশাল ব্যক্তিত্ব। জলপথে এসে এখানেই বসত তাঁদের মিটিং লণ্ঠনের মিটি মিটি আলোয়। এই ঘরের আলমারিতে সজ্জিত তলস্তয়, ডিকেন্সের মতো তাঁর প্রিয় লেখকদের সারি সারি বই, যা শরৎ বাবু নিয়মিত পড়তেন।

আমরা জানতে পারি মিহির আচার্য সম্পাদিত 'শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র' পৃষ্ঠা ৯৮ থেকে– "সামতাবেড়ে তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারের তালিকায় চোখে পড়ে ডিকেন্স আর তলস্তয়ের সমস্ত রচনা সংগ্রহ। তাছাড়া ডড়সবহ রহ ধষষ ধমবং ধহফ রহ ধষষ পরৎপঁসংঃধহপবং সিরিজের সাতখানি বইয়ের সংগ্রহ, এই বইগুলো তাঁর 'নারীর মূল্য' গ্রন্থের প্রেরণা। এখানে রক্ষিত প্রতিটি গ্রন্থই শরৎচন্দ্রের মতো মনোযোগী পাঠকের পরিচয় বহন করে।"

এগিয়ে চলি পাশের তৃতীয় কক্ষটিতে– গরিব-দুস্থদের শরৎ বাবু বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথ চিকিৎসা করতেন। গ্রামের মানুষের শ্রদ্ধেয় দাঠাকুরের সেই ওষুধের বাক্সটিও এখানে রয়েছে। তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তারই নিদর্শনস্বরূপ একটি চরকাও আছে এই ঘরে। পাশেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের দেওয়া রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দুটি, যা আজও পূজিত হয়। এই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দুটি

দেশবন্ধুর বাড়ির বিগ্রহ; তিনি যখন গ্রেফতার হন তখন দিয়ে গিয়েছিলেন শরৎ বাবুকে।

চলুন, এবার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় যাওয়া যাক। গা ছম ছম কি শুধু ভূতের ভয়েই হয়? বোধ হয় এক অজানা ভালো লাগা, রোমাঞ্চ থেকেও হয়, যা এই লাল বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেশ অনুভব করতে পারছি। আজ যা বর্তমান, কাল ছিল অতীত, আগামীকাল হবে ভবিষ্যৎ। এক সময় যে মানুষগুলো হেঁটে-চলে বেড়াত এখানে, তাঁরা আজ শায়িত বেদিতে।

নদীর দিকে মুখ করা দোতলায় তাঁর এই লেখার ঘরকে স্পর্শ করলাম। এই বিছানায় বসে প্রায় পাঁচিল ঘেঁষে বয়ে যাওয়া রূপনারায়ণ নদী দেখতেন। এখানেই দিনের উজ্জ্বলতায় কিংবা রাতের অন্ধকারের স্তব্ধতায় যাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এসেছিল কত না হৃদয়স্পর্শী লেখা! সেই চেয়ার-টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে মন কেমন যেন আনমনা হয়ে যাচ্ছে বারবার! মনে হচ্ছে, আজও তিনি লিখছেন সেই কালো গরিব মেয়েটির কথা কিংবা ঐ অভাগীর স্বপ্নের কথা। এখানেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর শেষ লেখা স্বদেশীর প্রেক্ষাপটে 'বিপ্রদাস'। শোবার ঘরে টানটান করা বিছানা, সযত্নে গোছানো বালিশ। সেগুন কাঠের দুটি আলমারি রয়েছে ঘরে। রয়েছে তাঁর ব্যবহৃত একটি লণ্ঠন ও জলচৌকি, যার ওপর রেখে শরৎ বাবু লেখালেখি করতেন।

বাইরে বেরিয়ে এলাম। লাল বারান্দার ওপর ঠিক রূপনারায়ণ নদীর দিকে মুখ করা ফেন্সিংয়ের সঙ্গে লাগানো একটি রাইটিং প্যাড আছে, যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখতেন তিনি। বাড়ির ঠিক পেছনেই রয়েছে ধানের গোলা, যেখানে ধান কিনে রাখা হতো তার পাশেই ছিল রান্নাঘর যা আজ আর নেই। ২০১৪'র বন্যায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। এক মুহূর্তে ভেসে উঠল– আমিনা বুঝি তার বাবার জন্য ভাত রাঁধছে। মনে হলো– 'ক্রোধ তাহার (বাপের) দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল।... রোগা বাপ খাক আর না খাক, বুড়ো মেয়ে চারবার পাঁচবার করে ভাত গিলবি। এবার থেকে চাল আমি কুলুপ বন্ধ করে বাইরে যাবো।'

বাড়ির বাঁ দিকে রয়েছে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা তিনটি সমাধি। পাশাপাশি দুটি সমাধি; একটি শরৎ বাবুর আর তাঁর দাদা স্বামী ভেদানন্দের। শরৎ বাবুর সমাধির ঠিক নিচেই তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর সমাধি। ঘুরতে ঘুরতে বাড়ির সামনে উপস্থিত হতেই দেখা যায় সামনেই বাগানের মধ্যিখানে রয়েছে শ্বেতপাথরের শরৎ বাবুর আবক্ষ মূর্তি। বাড়ির পেছনে বাঁশঝাড়ে কান পাতলে আজও শোনা যায় পার্বতী-দেবদাসের ফিসফিসানি। কী রকম একটা অদ্ভুত অনুভূতির জোয়ার বয়ে চলেছে মনের মধ্যে– এই সেই ঔপন্যাসিক; এই সেই কথাসাহিত্যিক, যিনি ইহলোক ছেড়ে চলে গেছেন ৮৪ বছর আগে। অথচ আজও বেস্ট সেলিং সাহিত্যিক। স্ত্রী জাতির কথা তাঁর মতো করে আজও কেউ উপস্থাপন করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। এমনকি যাঁর গল্প-উপন্যাস সব থেকে বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। প্রকাশকরা

ভাস্কর্য

আজও ক্লান্ত হন না তাঁর লেখার রিপ্রিন্ট করতে। তিনি সবচেয়ে বেশি অনূদিত, অভিযোজিত এবং সবচেয়ে বেশি অনুকরণীয় লেখক।

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে O N V Kurup লিখছেন, '...Sarat Chandra's name is cherished as dearly as the names of eminent Malayalam novelists. His name has been a household word.' Dr Mirajkar জানাচ্ছেন, 'The translations of Sarat Chandra created a stir amongst the readers and writers all over Maharashtra. He has become a known literary personality in Maharashtra in the rank of any popular Marathi writers including H. N. Apte, V.S. Khandekar, N.S. Phadke and G.T. Madkholkar.' Jainendra Kumar মনে করেন, 'Who considers that his contribution towards the creation and preservation of cultural India is second, perhaps, only to that of Gandhi, asks a rhetorical question summing up Sarat Chandra's position and presumably the role of translation and inter-literary relationship: 'Sarat

Chandra was a writer in Bengali; but where is that Indian language in which he did not become the most popular when he reached it?'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাস নিয়ে ৫০টিরও বেশি সিনেমা হয়েছে বিভিন্ন ভাষায়। দেবদাস হয়েছে ১৬টি ভাষায়; পরিণীতা হয়েছে তিনবার হিন্দিতে; বড়দিদি, মেজদিদি, বিন্দুর ছেলে, দত্তা, পথের দাবী, নিষ্কৃতি, পণ্ডিত মশাই, আলো ছায়া ইত্যাদি গল্প নিয়ে ছবি তৈরি হয়েছে। আজও তাঁর সাহিত্য আমাদের সমাজে একই রকম প্রাসঙ্গিক। একই তীব্রতায় আবেদন করতে পারে পাঠক ও দর্শকের কাছে। তিনি খুব সিরিয়াস লেখক ছিলেন না বলে আলোচনা আছে। কিন্তু তাঁর রসবোধের চরিত্রটাও যে ফেলে দেয়ার মতো নয়, তা বলাই বাহুল্য।

একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। কবিশেখর কালিদাস রায় প্রতিষ্ঠিত 'রসচক্র' সাহিত্য সংস্থার সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে। শরৎচন্দ্র সেই সম্মেলনে আমন্ত্রিত। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে নবীন কবিদের উদ্দেশে বললেন, 'তোমরা যারা কবিতা লেখো, তারা কবিতা লেখা ছেড়ে দাও।' সবাই তো অবাক! শরৎচন্দ্রের মতো একজন বিখ্যাত লেখক এ রকম কথা বলছেন কেন? পরক্ষণেই শরৎচন্দ্র বললেন, 'যে বিষয়েই কবিতা লিখতে যাও না কেন, দেখবে রবিঠাকুর আগেই সব লিখে রেখেছেন। তাই আমি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে হতাশ হয়ে গল্প লেখা শুরু করলাম। নইলে আমিও শুরু করেছিলাম কবিতা লেখা দিয়েই।'

আমি অভিভূত। শব্দ নেই আমার বুদ্ধিতে প্রকাশ করার এই মুহূর্তের অনুভূতির। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এলাম ফেরত পথে।

আমিরাত ভ্রমণে বিভ্রাট

সেলিম সোলায়মান

'......... উতারো!'

মানে কী? আমি কি দুধ, নাকি পানি যে উতরাবো? এটাই মনে হয়েছিল প্রথমে। কপাল ভালো, পরক্ষণেই মনে পড়েছিল, এ তো বাংলা উতরানো না। এ হলো গিয়ে হিন্দি উতরানো। সমস্যা হচ্ছে কি, যে উতরাতে বললেন, কালো আবায়ায় শরীর আর গোলাপি রংয়ের করোনা মাস্কে মুখ ঢাকা ইমিগ্রেশন কাউন্টারে বসে থাকা দীর্ঘদেহী আমিরাতি কন্যা, তা তো ঠাওর করতে পারছি না। বেখেয়ালে, উতরানোর আগে কন্যা কোন শব্দ বা শব্দসমূহ বলেছেন, তা শুনতে পাইনি। এতে অবস্থা কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার কাছাকাছি হলেও এরই মধ্যে মনের ভেতর থেকে কোনো এক দুষ্ট কিশোর নাকি তরুণ বলছে, এটা কি কাপড় খোলার কোনো জায়গা হলো যে বলছ– 'কাপ্রা উতারো'?

ইমিগ্রেশন কাউন্টারের ওপাশে উনি আমার ভিসার কাগজ আর পাসপোর্ট দেখায় ব্যস্ত থাকলেও একটু

আগে দেয়া তার নির্দেশ সঠিকভাবে পালিত না হওয়ায় চোখ তুলে এদিকে তাকিয়ে কিছুটা বিরক্ত হয়েই বললেন তিনি ফের– 'চশমা উতারো।'

ওহ হো। তাই তো, তাই তো। নাক বরাবর হাত ৩/4 দূরেই তো দেখতে পাচ্ছ ডিজিটাল এক পর্দা! সেটিতে কী যেন একটা এপাশ-ওপাশ নড়াচড়া করে কোনো কূল-কিনারা পাচ্ছে না, মনে হচ্ছে। চকিতেই বুঝলাম, সেই ডিজিটাল পর্দা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার ভূতো চেহারা স্ক্যানিং করার চেষ্টায় আছে! চোখে চশমা থাকায় ডিজিটাল বাবার সমস্যা হচ্ছে। দ্রুত তাই দ্বিতীয়বারের মতো নাজিল হওয়া হুকুম মান্য করে চশমা খুলে দাঁড়াতেই নিমিষে পর্দার উপরে একটা সবুজ টিক চিহ্ন ভেসে উঠতেই ইমিগ্রেশন কন্যার সাথে নিজেও বুঝতে পারলাম, আমি আসলে আমিই। অন্য কেউ নই।

এরই মধ্যে ইমিগ্রেশনের আমিরাতি কন্যা, আমার পাসপোর্ট-ভিসার কাগজের সাথে মুফতে একটা সিমকার্ডের প্যাকেট রেখে আমার দিকে ঠেলে দিয়ে মাস্কের ভেতর থেকে বললেন শুধু 'ওকে'। করোনা মাস্কে মুখ ঢাকা থাকায় যদিও নিশ্চিত নই, মাস্কের পেছনে আছে যে মুখ, সে কি আসলেই কোনো তরুণীর? নাকি বয়স্কার? অতএব কল্পনাই ভরসা। আর কল্পনা যখন করতেই হচ্ছে, তাহলে ঐ মাস্কের পেছনে এক পরমা সুন্দরী তরুণী বসে আছেন, এমন ভাবতে তো আর পয়সা খরচ হবে না। অতএব সমস্যা কী?

সে যাক, কন্যার মুখের 'ওকে' শব্দটি কর্ণগোচর হতেই বড় আহ্লাদিত হয়ে হাসিমুখে ধন্যবাদ বলে ইমিগ্রেশন বক্সের পাশের নির্ধারিত সরু রাস্তা, যেটি আপাতত কোমরসমান উঁচু স্বয়ংক্রিয় দরজা দিয়ে আটকানো, এগোলাম সেদিকে। এতক্ষণ তার উপরে লাল আলো জ্বললেও এখন জ্বলছে সেখানে সবুজ বাতি। যার মানে, পার হতে পারছি আমি ফের দুবাই এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশন বৈতরণী। কিন্তু যে-ই না পার হলাম সেই দরজা, সাথে সাথে ফের কানে বেজে উঠল ঐ 'চশমা উতারো' শব্দদ্বয়। থাকুক ঐ মাস্কের পেছনে কোনো অ্যারাবিয়ান শিরি বা লায়লা, কিচ্ছু যায় আসে না তাতে। এ কেমন কথা হলো? বাঙালির পাসপোর্ট হাতে পেলেই তাকে অশিক্ষিত ভাবতে হবে কেন? আমাকে তুমি তো ইংরেজিতে বলতে পারতে– টেক অফ ইওর স্পেকট্যাক্‌ল্‌স্‌। বুঝলাম, বাঙালিকে তোমাদের প্লিজ বলতে বাধে। তা না হয় না-ই বলতে। সকল বাঙালিকেই কি তোমাদের অশিক্ষিত, মিসকিন মনে হয়?

নাহ, আসলে প্রথম পুরো কথা না শুনতে পেয়ে আমি যেমন ছিলাম, দ্বিতীয়বার পুরোটা শুনেও ঐ রকমই থাকা উচিত ছিল। করেছিলাম যেমন এক যুগ আগে এই দুবাই এয়ারপোর্টে এবং বাধ্য করেছিলাম ইমিগ্রেশনের সেই লোককে ইংরেজি বলতে। যাচ্ছিলাম সেবার ইউরোপে এমিরেটস এয়ারলাইন্সে; পেশাগত কারণে। সে কারণেই অফিসের নিয়মমাফিক পেয়েছিলাম বিজনেস ক্লাসের টিকেট। একে তো আমার টিকেট ছিল একটু উচ্চ তরিকার, তদুপরি সে সময় ঐ পেশাগত কারণে ঘন ঘন সেই এয়ারলাইন্স ব্যবহার করায় আমি হয়ে গিয়েছিলাম তাদের গোল্ড মেম্বার। ফলে এয়ারলাইন্স বাধ্য হয়ে সেবার আমার কানেক্টিং ফ্লাইট ধরার মাঝের ৮/৯ ঘণ্টার জন্য এয়ারপোর্টের বাইরের একটা হোটেলের ব্যবস্থা করেছিল।

ঢাকায় প্লেনে উঠে বসার পর সুন্দরী এমিরেটস বিমানবালার দেয়া একটা কার্ড পেয়ে জেনেছিলাম, বিজনেস ক্লাসের যাত্রীদের মধ্যে যারা বিশেষত গোল্ড মেম্বার, তাদেরকে ঐ হোটেলে যাওয়ার জন্য ইমিগ্রেশন ঝক্কিতে পড়তে হবে না। আলাদা গেটের ব্যবস্থা আছে এমিরেটসের তাদের জন্য। সেই কথা বিশ্বাস করে দুবাই নেমে বুক ফুলিয়ে তাই দাঁড়িয়েছিলাম সেই ভিআইপি লাইনে। কিন্তু যেই না পেরুতে গেলাম সেই গেট, তখনই তারা বলেছিল, যতই আমার বিজনেস ক্লাস টিকেট থাকুক আর যতই হই না কেন তাদের গোল্ড মেম্বার, এই গেট আমার জন্য প্রযোজ্য নয়। যেতে হবে আমাকে স্বাভাবিক ইমিগ্রেশনেই। ওখানে টিকেট আর আমার পরবর্তী ফ্লাইটের বোর্ডিং কার্ড দেখালেই হোটেলে যাবার ছাড়পত্র পাব।

শুনে মেজাজ বেধড়ক রকমের খিঁচড়ে গেলেও বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়েছিলাম ইমিগ্রেশনের লম্বা লাইনে। প্রায় আধা ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অবশেষে যখন পাসপোর্ট, টিকেট আর বোর্ডিং কার্ড দিয়েছিলাম কাউন্টারে বসে থাকা দশাসই চেহারার এক আমিরাতিকে, সে তখন কাউন্টারের উপরে রাখা একটা যন্ত্র হাতের ইশারায় দেখিয়ে বলেছিল, 'চক বাড়া' যার কিছুই অর্থ বুঝিনি। তাই ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। তাতে দ্বিতীয়বারও বলেছিল সে ঐ 'চক বাড়া'। তাতেও আমি হদিস করতে পারছিলাম না যখন, কী বলছে; সে তখন বেশ বিরক্তির সাথে তৃতীয়বারের মতো ঐ শব্দদ্বয় উচ্চারণ করতেই বলেছিলাম, ক্যান ইউ প্লিজ স্পিক ইন ইংলিশ? তখন সে ইংরেজিতে বলেছিল, আমি বাঙালি হওয়ার পরও বাংলা বুঝি না কেন? উত্তর দিয়েছিলাম, নাহ; তুমি তো আসলে বাংলা বলতেই পারছ না। অতএব আমি তা বুঝি কী করে? তার চেয়ে জনাব তুমি ইংরেজি বল। তাতে তোমার-আমার দু'জনের জন্যই ব্যাপারটা সহজ হয়।

সেদিনকার আমার এহেন বচনে কিছুটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সেই আমিরাতি ইমিগ্রেশন কাক্কু বেশ ঘেমে-নেয়ে ইংরেজিতে বলেছিল, সামনের যন্ত্রে চোখ রেখে আমাকে চোখ বড় করে তাকাতে হবে। তাতেই ঘটনাটির মীমাংসা হয়েছিল সেদিন। একটু আগে ঘটে যাওয়া প্রায় একই ঘটনার পর নিজে ইমিগ্রেশন পার হয়ে আমার সঙ্গীদেও ইমিগ্রেশন শেষ করার অপেক্ষায় সেখানকার করিডোরে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, ১০ বছর আগে এই বাঙালকে অশিক্ষিত মনে করায় সেই আমিরাতির অশুদ্ধ উচ্চারণের বাংলা বলাটাই যখন মেনে নিইনি; আজ ইমিগ্রেশন মহিলা আমার সাথে যে হিন্দি বলল, তা মেনে নিলাম কেন?

এ কথা মনে হতেই মনে পড়ল, আরে, দুবাইয়ের ইমিগ্রেশন তো পরের কথা, আজ কাকভোরেই তো পড়েছিলাম নিজের এয়ারপোর্ট ঢাকায় আরেক ইমিগ্রেশন যন্ত্রণায়। হ্যাঁ, বলছি সে কথা। তার আগে একটু উপক্রমণিকা হয়ে যাক। কথা

হচ্ছে, এ যাবৎকালে আমি যত ভ্রমণ করেছি, তার ৯০ শতাংশই হয়েছে কলা বেচতে গিয়ে রথ দেখার স্টাইলে। এমনকি এইবারও যে এলাম দুবাই, তাও ব্যতিক্রম নয়। দুবাইয়ে এসেছি এবার দেশের অন্যতম বৃহত্তম ঔষধ কোম্পানি বিকন ফার্মাসিউটিক্যালসের ২৫ জনের একটি দলকে ট্রেনিং করানোর জন্য, সেই দলের সাথে। তো আজ ফ্লাইট যেহেতু ছিল সকাল সাড়ে ৮টায়, তাই ৫টার দিকে বোর্ডিং কণ্ডে উপরোক্ত কোম্পানির মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান আনিস ভাইসহ ইমিগ্রেশন লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম ঢাকায়। যদিও উনার এবং আমার দু'জনেরই পাসপোর্ট তথাকথিত ডিজিটাল মানে ই-পাসপোর্ট। আর এয়ারপোর্টের ইমিগ্রেশনে ঐ ধরনের পাসপোর্টধারীর জন্য স্বয়ংক্রিয় আলাদা কাউন্টার আছে। কিন্তু ঐগুলো বসানোর পর যেহেতু সেগুলোর এখনো ঘুম ভাঙেনি, তাই বাধ্য হয়ে আমাদের গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল সাবেকি কায়দার ইমিগ্রেশন লাইনেই।

লাইনে আমার আগে আনিস ভাই থাকায় আগে উনার ডাক পড়তেই উনি ইমিগ্রেশন কাউন্টারে গিয়ে পাসপোর্ট হস্তান্তর করার পর যা যা ঘটছিল সবই দেখতে পাচ্ছিলাম। দেখলাম, পাসপোর্ট হাতে নিয়ে ইমিগ্রেশন কর্তা তার সামনে থাকা কম্পিউটারে দু'তিনবার খুটখাট শব্দ করে বেশ গম্ভীরভাবে ধীরে-সুস্থে জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন নানান প্রশ্ন। ঠাণ্ডা মেজাজের নিপাট ভদ্রলোক আনিস ভাই তার স্বভাবসুলভ হাসিমুখে দিতে থাকলেন ওসবের উত্তর। এতে আমারই কিনা মেজাজ হয়ে গেল গরম। কারণ যেসব প্রশ্ন করা হচ্ছে আনিস ভাইকে, তার সবই তো আছে সার্ভারে। যেহেতু তার পাসপোর্ট এক্কেবারে হাল আমলের তথাকথিত ডিজিটাল অর্থাৎ ই-পাসপোর্ট। তারপরও কেন তাকে তার বাবার নাম, গ্রামের নাম, স্ত্রীর নাম এসব বলতে হচ্ছে বারবার? এসবের কোনো মানে আছে?

ভাবছিলাম এমন যখন, তখনই সেই কাউন্টারের উল্টা দিকের কাউন্টার ফাঁকা হতেই নিজে গিয়ে দাঁড়ালাম ওখানে। তখন সামনাসামনি থেকেই দেখতে পাচ্ছিলাম আনিস ভাইয়ের মুখ। উত্তেজনাহীন, হাসিমুখে উনি একই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বারবার। এভাবেই প্রায় মিনিট ১৫ ধরে ইমিগ্রেশন জেরা শেষে হাসিমুখে যখন আনিস ভাই পার হতে পারলেন নিজ দেশের ইমিগ্রেশন বৈতরণী, তখন কিনা আমি পড়লাম বিশাল যন্ত্রণায়। তবে আমাকে যে কাউন্টারে দাঁড়াতে হয়েছিল, সেখানকার ইমিগ্রেশন কর্তা নিছক ভদ্রলোক। বেশ কিছুক্ষণ উনি কম্পিউটারে খুটখাট করে এক সময় বললেন, 'ধ্যাত! হ্যাং হয়ে গেছে কম্পিউটার। আপনি একটু ঐ কাউন্টারে যান।' বলেই একটু আগে আনিস ভাই যে গোমড়ামুখোর মারাত্মক সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন, সেদিকে ইঙ্গিত করলেন। তাতেই বুঝেছিলাম, পড়েছি এবার মোগলের হাতে। তদুপরি আমার কাউন্টারের কর্তা সাংকেতিকভাবে ঐ গোমড়ামুখোকে কিছু একটা বলতেই, নিশ্চিত হয়েছিলাম পড়তে যাচ্ছি কোনো না কোনো হাঙ্গামায়।

এই কাউন্টারে এসে দাঁড়ানোর বেশ কিছুক্ষণ পর সেই গোমড়ামুখো আনিস ভাইয়ের মতো আমাকেও শুরু করলেন সেই একই প্রশ্ন, যার সবই আছে পাসপোর্টে লেখা।

আনিস ভাইয়ের মতো হাসিমুখে না হলেও বেশ শান্তভাবে একে একে তার উত্তর দেবার পর ৫/৬ মিনিট খুটখাট করে গোমড়ামুখো বেশ সন্দেহযুক্ত স্বরে জানালেন যে আমাকে ইমিগ্রেশন পার করা তার কর্ম নয়। যেতে হবে আমাকে তাদের বড় অফিসারের কাছে, পেছনের কাউন্টারে। বুঝতে পারছিলাম না যে কী অপরাধ আমার! ফলে অনিশ্চিত পায়ে ঐ কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছি যখন, তখন প্রথম যে কাউন্টারে দাঁড়িয়েছিলাম সেই ভদ্রলোক আমার হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে বললেন, 'দেখেন, সিস্টেমে সমস্যা হচ্ছে। যার কারণে আমরা আপনাকে ক্লিয়ার করতে পারছি না। তবে ঐ সমস্যার সমাধান ঐ স্যারের হাতে। আমার এই কাগজটা নিয়ে ওখানে গিয়ে সাথে সাথেই দেবেন। তাতে উনি আপনার ইমিগ্রেশন ক্লিয়ার করার ব্যবস্থা করবেন।'

উনাকে ধন্যবাদ দিয়ে সেই কাউন্টারে গিয়ে দেখি, ওখানে আপাদমস্তক কালো বোরকায় মোড়া এক মহিলা যাত্রীর জেরা চলছে। এ ছাড়াও ওখানে ঐ রকম জেরার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন আরো জনাপাঁচেক লোক। অর্থাৎ ঐ পাঁচজনের জেরা শেষে হবে আমার জেরা। তারপরও ঐ ভদ্রলোকের কথামতো চিরকুটটি জেরাকারীর দিকে এগিয়ে দিতেই উনি আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে বললেন, 'এটা আমার কাজ না। অপেক্ষা করেন, স্যার আসুক। এটা ঠিক করতে ওয়াকিটকি লাগবে। আমার কাছে তা নাই। স্যার এলে উনাকে দেবেন।'

কী আর করা! থাকলাম অপেক্ষায়। দেখতে থাকলাম বাকিদের জেরা। তবে সেসব জেরা বিস্তারিত লিখতে গেলে হয়ে যাবে এক বিরাট কাহিনী। থাকুক তা অন্য কোনো সময়ের জন্য। ৩০/৪০ মিনিট অপেক্ষায় আছি, কিন্তু সেই ওয়াকিটকিওয়ালা কর্মকর্তার দেখা নাই। এর মধ্যে আমাদের দলের বাকি ২৫ জনের অনেকেরই ইমিগ্রেশন হয়ে গেছে। ভাবছি, আমি একাই কি আটকে গেলাম? ঠিক তখনই দেখি হন্তদন্ত হয়ে বিকনের এই টিমের বস ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পল্লব ভাই এসেছেন; সাথে আছেন এই ভ্রমণ সুসম্পন্ন করার সার্বিক দায়িত্ব যার কাঁধে সেই তাজরিন তাজরি। আমাকে দেখেই হৈ চৈ করে পল্লব ভাই জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার, ঘটনা কী? আপনি এখানে কেন? আনিস ভাই তো লাউঞ্জ থেকে আপনাকে ফোন করে না পেয়ে আমাকে ফোন করেছেন। যান যান।'

বললাম, আমার ঘটনা কী জানি না। তবে এটা জানি, এখন আমি লাউঞ্জে যেতে পারছি না। ইমিগ্রেশন ছাড়পত্র মিলছে না। তা আপনার ঘটনা কী? এত দেরি কেন? 'আর বলবেন না স্যার। এই তাজরির ভিসার কাগজে তার বাবার নাম যেভাবে লেখা আছে, তার সাথে নাকি পাসপোর্টে যেভাবে লেখা আছে তা মিলছে না। তাই তাকে বোর্ডিং কার্ড দিচ্ছিল না এয়ারলাইন্স। সমস্যা কিছু না। এই যেমন ধরেন পাসপোর্টে ওর বাবার নাম আছে এইচ এম হাসানুজ্জামান। ভিসায় ও তা-ই আছে। কিন্তু পাসপোর্টে এইচ এবং এম একটু ফাঁক করে লেখা আছে। আর ভিসায় কোনো ফাঁক না দিয়ে লেখা আছে। এ কারণে ফ্লাইটের বোর্ডিং কার্ডই নাকি ইস্যু করবে না।

বলেন তো স্যার, কেমন বিরক্ত লাগে! যাক, আমি গিয়ে তাদের বললাম, এ কারণে যদি আমিরাতের ইমিগ্রেশন তাকে আটকায় তবে সে চলে আসবে। তার তো রিটার্ন টিকিট আছে। এ নিয়ে আপনারা ঝামেলা করছেন কেন? এসব বলে এ ব্যাপারে সব দায়িত্ব আমার ও কোম্পানির বলে মুচলেকা দেয়ার পর ওর বোর্ডিং কার্ড দিল।'

উনার কথার জবাবে বললাম, আপনি হলেন সকল কাজের কাজী, বিপ্লব ভাই। এবার যান আপনারা, ইমিগ্রেশন পার হন। আমি অপেক্ষায় থাকি। কপাল ভালো, উনারা দু'জন চলে যাবার মিনিট পাঁচেক পর এলেন সেই ওয়াকিটকি অফিসার। হাতে ধরা চিরকুট তার হাতে দিতেই কম্পিউটাওে দ্রুত খুটখাট করে প্রথম জিজ্ঞেস করলেন, আমার নামে চৌধুরী আছে কিনা। বললাম, না। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আমার পিতার নাম ইব্রাহিম কিনা? আবারো 'না' বলতেই উনি ওয়াকিটকিতে অন্যপাশের কাউকে কিছু একটা বলে পাসপোর্ট হাতে তুলে দিয়ে বললেন, দেখেন তো অবস্থা! কী যে ভজঘট লাগাইয়া রাখছে সার্ভারে! ঠিক আছে এখন যান আপনার ঐ কাউন্টারে। এবার হয়ে যাবে ক্লিয়ার।

অতঃপর হয়েছিলও তাই। এরই মধ্যে ঘড়ির কাঁটায় পার হয়েছিল পৌনে দুই ঘণ্টা। তো সে তুলনায় দুবাই এয়ারপোর্টে তো আর তেমন সময় লাগেনি। অতএব হিন্দি কথা বলার অপরাধ তাদের মাফ করা যায়। এমন ভাবছি যখন, তখনই বিপ্লব ভাই আর তাজরি ইমিগ্রেশন শেষ করে আমার দেখা পেতেই বিপ্লব ভাই স্বভাবসুলভ হৈ চৈ ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখেন তো স্যার, এখানে তো এরা কিছুই বলল না তাজরির ভিসা নিয়ে। ওর সমস্যা হবে বলে আমি ছিলাম ওর পিছনে পিছনে। লাইনে আমাদের থেকে অনেক সামনেই ছিল নাশিতা। কিন্তু নাশিতাকে কেন জানি এরা ইমিগ্রেশন কাউন্টার থেকে একটা অফিসে নিয়ে গেল। কী যে হয় বুঝতে পারছি না! কী করি বলেন তো?'

উনার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই দেখি লম্বা করিডোরের অন্য মাথা থেকে হাসিমুখে আমাদের দিকেই আসছেন মিস নাশিতা।

হো চি মিন-এর দেশে

স্বপন ভট্টাচার্য

নোই-বা ইন্টারন্যাশানাল বিমানবন্দর থেকে হ্যানয় শহরে যাবার পথটি নানা রঙের জবায় সাজানো বলে চেনা চেনাই লাগে। ভিয়েতনামের কারেন্সি হলো 'ডং'। আমার ভ্রমণকাল ২০১৯-এর নভেম্বরে প্রতি ডলারে এই মুদ্রার বিনিময়মূল্য ছিল ২৩০০০-এর অধিক। কেন বেশি, সে ভাবনা অর্থনীতিবিদরা ভাবুন। কিন্তু আমাকে গাইড যখন অবলীলাক্রমে ৩ মিলিয়ন ডং হাতে রাখতে বলল, 'ফর দি টাইম বিইং', তখন কিন্তু নিজেকে যথার্থ মিলিয়নেয়ার ভাবতে মন্দ লাগে না।

হ্যানয়ে বা সায়গনে যে কোনো ক্রসিংয়ে রাস্তা পারাপারের জন্য দাঁড়ালে লাল আলোয় থমকে থাকা স্কুটার,বাইক আর মোপেডের যে প্রায় আদিগন্ত বিস্তৃত সমাবেশ আপনি দেখতে পাবেন, তাতে বাজি রেখে বলতে পারি, এত দ্বিচক্রযান আপনি এক লপ্তে কখনও দেখেননি। ৯ কোটি মানুষের দেশ ভিয়েতনামে ৬

কোটি স্কুটার, ওরা বলে 'হন্ডা'। বোঝা যায়, বহুজাতিকটির প্রভাব কতটা গভীর। দিন ১৫'র সফরে স্কুটারে কী না পরিবাহিত হতে দেখেছি! টিভি, ফ্রিজ, আসবাব, চলমান দোকানঘর, এমনকি নৌকো পর্যন্ত। ওরা বলে, আমরা ভিয়েতনামিরা সেটাই কিনি যা আমাদের স্কুটারে আঁটে। যা আঁটে না তা আমরা কিনি না! তো এই স্কুটার অধ্যুষিত রাজপথ পারাপার করা সংগ্রাম বিশেষ। আপনাকে নেমে পড়তে হবে ওই বন্যার মতো স্রোতের মধ্যে, যেমন হংসছানা নেমে পড়ে সাহস করে জলাশয়ে। আপনি আড়াআড়ি হেঁটে চলুন রাস্তার এই ফুটপাত থেকে অপর ফুটপাতে। স্কুটার আপনার জন্য থামবে না, কিন্তু সুচারু নিয়ন্ত্রণে আপনাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। আপনি সরলরেখায়, তারা বক্রে।

মাস্ক ভিয়েতনামে জীবনযাত্রার অঙ্গ কোভিডের অনেক আগে থেকেই। দেখেছি, পথ-চলতি প্রায় সব মানুষেরই মুখে মাস্ক। হঠাৎ মনে হতে পাওে, প্রচণ্ড দূষণের দেশে ঢুকে পড়েছেন। আসলে তা নয়। মাস্ক এখানে অভ্যেস। ভিয়েতনামে ভ্রমণকালে যেটা আপনার নজর এড়াবে না, তা হলো এদের বসতবাড়ি। দুনিয়ায় আর কোথাও এত সরু সরু বাড়ি নির্মিত হয় কিনা, কে জানে! জ্যাকি বলল, আমরা দুনিয়ার সব চাইতে রোগা লোকদের দেশ। তাই আমাদের বাড়িও রোগা। আসলে জমি এখানে বিক্রি হয় ৪ মিটার বাই ২০ মিটার মাপে। অর্থাৎ মাত্র ৪ মিটার প্রশস্ত সিংহদুয়ার পেরিয়ে আপনি যখন ২০ মিটার দীর্ঘ গুহার মতো অন্দরমহলে প্রবেশ করছেন, আপনার মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়, নগরপালক সামনের দেখনদারিকে বর্জন করতে চেয়েছেন ক্রমবর্ধমান নগরায়নের চাপ সামলানোর দাবি মেনে নিতে।

নজর বা কানে যা এড়ায় না তা হলো সচ্ছলতার সঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদের একটা সমাপতন তৈরি হয়ে গেছে এ দেশে। সায়গন থেকে চু চি টানেল যাবার পথে চকমিলানো বসতবাড়ি দেখিয়ে জ্যাকি বললে, পার্টি মেম্বারের বাড়ি। ১৯৭৬-এ দক্ষিণের আত্মসমর্পণের পর সে দেশে সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে বিশেষত দক্ষিণের আমেরিকা পোষিত ধনাঢ্য নাগরিকরা দেশান্তরী হন। চীনারা, যারা রি-ইউনিফিকেশনের বিরোধী ছিল এবং বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ কায়েম রাখতে পেরেছিল ততদিন পর্যন্ত, তারাও দলে দলে দেশ ছাড়ে। ১৯৯৪-তে মুক্ত স্যোশ্যালিস্ট অর্থনীতির পত্তনে ব্যক্তিমালিকানা আইনসিদ্ধ হয়। পলাতক দেশত্যাগীদের সম্পত্তির হাতবদল ঘটে। বাড়িগুলোয় আজ হয়ত বসবাস করেন এককালের ভিয়েত কং গেরিলা যোদ্ধা, আজকের পার্টি মেম্বার। সমাজতান্ত্রিক মুক্ত অর্থনীতি, ভিয়েতনামি ভাষায় 'দোই মোই' প্রধানত যুবা বয়সীদের মধ্যে এই দেশে চোখে পড়বার মতো পরিবর্তন এনেছে, সন্দেহ নেই। নগরায়নের ছাপ পড়েছে সর্বত্র। জিডিপির মাপে কৃষিক্ষেত্রের অংশীদারিত্ব কমছে; বাড়ছে শিল্পায়ন। স্বাক্ষরতার হার ৯১ শতাংশ। নারী জীবৎকাল ৮১ বছরের মতো।

দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পূর্ণভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত এবং স্কুলের হেডমাস্টার, কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ইউনিভার্সিটির প্রধান এবং হাসপাতালের ডিরেক্টর অবশ্যই

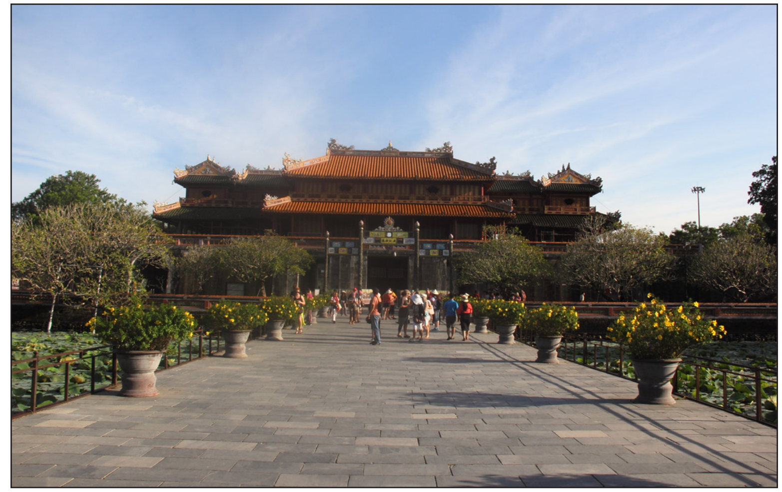

ভিয়েতনামের আদি রাজধানী হিউ-২

পার্টি মেম্বার। স্কুল শিক্ষার নানা স্তর এবং সব ক'টিই সরকার পোষিত। ৬ থেকে ১১ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা আবশ্যিক। মেকং ডেল্টাতেও দেখেছি জলে ভাসমান বোট স্কুল। উচ্চশিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ এবং পয়সাওয়ালাদের জন্য প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এখানেও দোকান খুলেছে। এমনকি হার্ভার্ডের ক্যাম্পাসও আছে এখানে। মেধাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীরা সহজ শর্তে ঋণ পেতে পারে। বিশেষত নারীশিক্ষায় দেখবার মতো উন্নতি ঘটিয়েছে ভিয়েতনাম। দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ১০১০ সালে স্থাপিত হ্যানয়ের 'টেম্পল অব লিটারেচার' দেখা হলো একদিন। কনফুসিয়াসের দর্শন শেখানো হতো ম্যান্ডারিন ভাষায়। ম্যান্ডারিন চর্চায় নারীদের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। ম্যান্ডারিন কথাটাই বিদ্বানের সমার্থক এখানে। শিক্ষায় যে কোনো বিধিনিষেধ আরোপের কাজটা সমাজপতিরা কোনো না কোনো সুসমাচার দিয়ে প্রশমিত করে এসেছেন দেশে দেশে কালে কালে।

ভিয়েতনামে শিক্ষা নারীদের সুগর্ভা হবার অন্তরায় বলে মনে করা হতো। নারীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম গড়ে ওঠে এই সেদিন; ১৯৪৫ সালে। তবে ভিয়েতনামে ম্যান্ডারিনদের স্থান খুব উঁচুতে। দেশের লাল বর্ণের জাতীয় পতাকার বুকে সোনালি তারার পাঁচটি বাহু যথাক্রমে স্কলার, সোলজার, ওয়ার্কার, ফার্মার ও ট্রেডারের প্রতীক। আমাদের বাঙালি মানসিকতার খুব মিল পাই বণিক সম্পর্কে এদের দৃষ্টিভঙ্গিতে। বণিককে এরা বাম হাতের একটি ফুল কোনোক্রমে দিয়ে কাজ সেরেছে। তার কারণ বোধ হয় চীন, জাপান, ফ্রান্সের বণিকরা; যাদের সঙ্গে হাজার বছরের বৈরিতা ছিল সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষদের উপর কি অমানুষিক অত্যাচার ফরাসিরা চালাত, তার নমুনা কিছু কিছু রাখা আছে হ্যানয়-এর 'হোয়া লো' জেলখানায়। যুদ্ধের সময় আমেরিকান প্রিজনার অব ওয়ারদের এখানেই বন্দি রাখত ভিয়েতকং

বাহিনী। বন্দিরাই করুণ মজায় নাম দিয়েছিল 'হ্যানয় হিল্টন'। সেটাকে মান্যতা দিয়ে জন ম্যাকেইনদের জন্য জেলের ভেতর ভিয়েতকং সেনারা বানাল 'লিটল লাস ভেগাস', যেটা বস্তুতপক্ষে একটু গায়ে-গতরে খেটে খাওয়ার জায়গা।

কোন কথা থেকে কোন কথায়! বলছিলাম শিক্ষকের সম্মানের কথা। ২০ নভেম্বর পালিত হতে দেখলাম শিক্ষক দিবস। তার হপ্তাখানেক আগে থেকেই দেখি স্কুল-কলেজের আশপাশে ফুলসম্ভার নিয়ে সেজে উঠেছে রাস্তার অস্থায়ী দোকান। ছাত্র-ছাত্রী ফুল দেবে শিক্ষকদেও, আর তার জন্য সবচেয়ে সুন্দর তোড়াগুলো বানিয়ে দেবে যারা তারাও ছাত্র, তবে একটু উঁচু ক্লাসের। শুধু স্কুল-কলেজে নয়, পরিবারেও পালিত হয় শিক্ষক দিবস। পরিবারের কেউ যদি শিক্ষকতার সাথে যুক্ত থাকেন, তবে তিনিও উপহার পান স্বজন বা দূরের আত্মীয়-অনাত্মীয়দের কাছ থেকে। জ্যাকি একগাল হেসে বলল সেদিন, সে তার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কাকাকে ৯০ ডলার পাঠাতে পেরেছে। শুনে অবাক হলাম। একটু ঈর্ষাও কি হলো না?

হিউ (Hue) ভিয়েতনামের আদি রাজধানী। সুন্দর গোছানো শহরটির প্রতিটি বাড়িতেই স্মরণপ্রদীপ। ১৮৮৫-তে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছিল হিউ-তে। ১৯৬৪ সালে আমেরিকানদের সঙ্গে আরো ১০ হাজার। ঐটুকু শহরে এত মৃত্যু, তবু প্রাণ অমলিন। মৃত্যুকে মানুষ এখানে জীবনের অঙ্গ হিসেবেই জানে। সেখানে বাজারে ঢুকে আমি অবাক। রিজার্ভ ব্যাংকের চত্বরের মতো থোকা থোকা টাকার বান্ডিল নিয়ে বসেছে লেনদেনকারীরা। তারপর বুঝলাম, হায় কপাল! এ তো নকল টাকা! বিক্রি হচ্ছে দেবতা বা পূর্বপুরুষদের নিবেদনের জন্য। বিশ্বাস এই যে, পূর্বপুরুষকে নকল টাকার নিবেদন আসল হয়ে ফেরত আসবে জীবনে। হিউতে আছে আদি রাজপ্রাসাদ, যা দখল নিয়েছিল ভিয়েতকং গেরিলারা দক্ষিণের

সায়গন

সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে 'টেট অফেন্সিভ'-এর অঙ্গ হিসেবে। টেট হলো চৈনিক উৎসবের দিন।

১৯৬৮'র ৩০ জানুয়ারি অর্থাৎ টেট উৎসবের দিন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বার কৌশল নেয় গেরিলারা। হিউয়ের রাজপ্রাসাদ বি-৫২ বোমায় গুঁড়িয়ে দিয়েও আমেরিকান সেনাবাহিনী প্রাসাদটি দখলমুক্ত করতে পারেনি। তাদের জেনারেল এই প্রথমবার মহৎ উপলব্ধির কথা প্রকাশ করে দেশবাসীকে জানান, অন্তত আরো দুই লাখ সেনা ছাড়া ভিয়েতকং গেরিলাদের যুদ্ধে হারানো অসম্ভব। বলা হয়, 'টেট অফেন্সিভ' হলো ভিয়েতনাম যুদ্ধের সেই পচা শামুক, যাতে পা কেটে তাদেও অ্যাম্পুটেশন হয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে রাজপ্রাসাদ রেস্টোরেশনের কাজ চলছে। মূল ফটক, একটি সুন্দর ইনডোর থিয়েটার এবং রাজার হারেমটি ইতোমধ্যে পুনর্গঠিত।

হিউ শহরের বুক চিরে বয়ে চলেছে সং-হুওয়ং নদী, অনুবাদে সুগন্ধি নদী। ধূপকাঠি, সে তিনি বৌদ্ধ হোন না হোন; ভিয়েতনামি জীবনের অঙ্গাঙ্গী উপকরণ। হিউ থেকে এককালে সারা দেশে এবং দেশের বাইরেও ধূপ রপ্তানি হতো এই নদী বেয়ে। ড্রাগন বোটে ঘণ্টা দুয়েকের সফরে ঘুওে আসা যায় থিয়েন মু প্যাগোডা। মৈত্রেয় তথাগতর এই আরাধনাক্ষেত্র দক্ষিণ ভিয়েতনামের বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উত্থানের অভিকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল তখন, যখন ভিক্ষু থি-কুয়াং-ডুক এখান থেকে একখানা অস্টিন গাড়ি নিয়ে ১৯৬৩'র ১১ জুন পৌঁছে যান সায়গন শহরে এবং খোলা রাজপথে অসংখ্য অনুগামী ও রাজসেনাদের চোখের সামনে নিজেকে জ্বালিয়ে দেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধে সেও এক মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া দিন।

ভিয়েত কথাটার অর্থই হলো 'উত্তর'। দেশের অধিবাসীদের মধ্যে ৮০ শতাংশ এই ভিয়েত উপজাতিভুক্ত, যাদের পূর্বপুরুষ এককালে সীমান্তের ওপারের চীন দেশের অধিবাসী ছিল। ভিয়েতনামে ভ্রমণকালে বার বার উপলব্ধি করেছি, চীনকে এরা আদপেই বন্ধু বলে মনে করে না। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে তারা বার বার চৈনিক আগ্রাসনের মুখোমুখি হয়েছে। রি-ইউনিফিকেশনের যুদ্ধে চীন ভিয়েতনামের পাশেই ছিল। সম্পর্ক খারাপ হয় তখন যখন কম্বোডিয়াতে চীনের সমর্থনপুষ্ট পল পট সরকারের পতন ঘটাতে সে দেশে ঢুকে পড়ে ভিয়েতনামি সেনাবাহিনী। ভিয়েত ছাড়া আরও ৫৬ রকমের উপজাতির বাস দেশে। শহরাঞ্চলে ভ্রমণকালে এসব অনুমান করাও মুশকিল। দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর জন্য হ্যানয়ের এথনিক সংগ্রহশালাটি দেখে নিতে পারেন। মুখ্য উপজাতিগুলোর স্বকীয়তায় বিন্দুমাত্র জল না মিশিয়ে গড়ে তোলা এত জীবন্ত এটি, মনে হবে তাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে এলাম। উপজাতি জীবনের আঁচ পেতে হলে যেতে হবে গ্রামাঞ্চলে; যেতে হবে পাহাড়ে। উত্তরের সাপা হলো সব থেকে জনপ্রিয় পাহাড়ি গন্তব্য।

একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পক্ষে ৪৫ বছর সময় বোধ হয় সব ক্ষত সারিয়ে উঠে গতির তুফান তোলার জন্য যথেষ্ট নয়। কাছেই সিঙ্গাপুর, কাছেই ব্যাঙ্কক– কথায়

ভিয়েতনামের আদি রাজধানী হিউ-১

কথায় ভিয়েতনামি যুবক বলে আমরা ওদের থেকে ১০০ বছর পিছিয়ে আছি। কী হয়ে উঠতে চাইছে ভিয়েতনাম, তার একটা ইঙ্গিত মেলে দানাং শহরে এলে। সেই দানাং, যেখানে আমেরিকান ডেস্ট্রয়ার থেকে প্রথম বিমান উড়ে এসে নেমেছিল এ দেশের জমিতে। আক্ষরিক অর্থে আমেরিকার সরাসরি জড়িয়ে পড়বার সেই শুরু। এখনও মার্বেল পাহাড়ের উপর তাদের ছেড়ে যাওয়া রাডার, তাদেও রানওয়ে,তাদের হ্যাঙ্গার এমনকি হয়তো তাদের পাতা মাইন পড়ে আছে দানাং বা তার আশপাশে। কিন্তু দানাং, যাকে বলে এখন হ্যাপেনিং সিটি। সমুদ্রতীরটি ভারি মনোরম, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে বহুলাংশে অগম্য। সেখানে বিশাল বিশাল রিসোর্ট, গলফ কোর্স, ক্যাসিনো– কী নেই! ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, গ্রেগ নরম্যানরা সেগুলোর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর। জুয়া ভিয়েতনামে নিষিদ্ধ; পতিতাবৃত্তিও। দানাং পসরা সাজিয়ে রেখেছে বিদেশি ভ্রমণার্থীদের জন্য, দেশিরা সেখানে না-পাক। জ্যাকি জানাল, জুয়া খেলতে ঘোর জুয়াড়িরা সীমান্ত পেরিয়ে কম্বোডিয়া চলে যায়। খেলা শেষে এপারে ফেরত। চীন, জাপান, আরব দেশগুলোর বিনিয়োগ এখানে। বিরাট বিনিয়োগ অভিবাসী ভিয়েতনামিদের, যারা এককালে দক্ষিণের ভরসা ছিল বলে রি-ইউনিফিকেশনের আগেই দেশ ছেড়ে পালায়। বেশির ভাগকে জায়গা দেয় আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া। তারা বা তাদের উত্তরসূরিরা এখন ভাগ্য বদলে কোটি কোটিপতি। প্রতি বছর তারা ১২ বিলিয়ন ডলারের উপর ফেরত পাঠায় ছেড়ে যাওয়া দেশে। সায়গনের বহুতল শপিং মল, ক্রুজ, হোটেল, গলফ, রিসোর্ট– সব কিছুতেই তাদের বিনিয়োগ চোখে পড়ার মতো।

ভিয়েতনামে গেলে হা-লং বে আপনার দ্রষ্টব্য তালিকায় একদম উপরেই থাকবে। প্রায় সাড়ে ৬০০ বর্গকিলোমিটারের এই জলাভূমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে

ছোট ছোট ১৬০০ মার্বেল পাথরের পাহাড়। সেগুলোর মধ্যে ৪০টিতে আদিবাসী জনজাতি মৎস্যজীবীদেও বাস। অবশিষ্ট যাকে বলে বায়োডাইভার্সিটি হট স্পট। একাধিক দ্বীপে দেখা মিলবে স্ট্যাল্যাগমাইট গুহাপুঞ্জ। দেখা মিলবে ফিশিং ঈগল, ব্যান্টাম (এক ধরনের বনমোরগ), হর্নবিল এবং অতি বিরল 'ক্যাট-বা' বাঁদরের। হা-লং কথাটার অর্থ ডুবন্ত ড্রাগন। দ্বীপগুলোকে ড্রাগনের পিঠের সারিবদ্ধ বর্ম কল্পনা করেই হয়তো এই নামকরণ। হা-লং বে ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট এবং নয়া সপ্তমাশ্চর্যের একটি বলে বিবেচিত। ভ্রমণার্থীদের জন্য সেখানে নানা আয়োজন। দিন দিনেই ডিজেলচালিত বোটে ঘুরে আসা যায় ঝটিতি সফরে অথবা রাত কাটান ভাসমান ছোট বা মাঝারি ক্রুজগুলোর কোনো একটাতে। রাত্রে তাদের মেটালিক বিচ্ছুরণ, কারাওকে সঙ্গীত– সব মিলিয়ে অনির্বচনীয় অন্ধকারের খোঁজে সেখানে এলে কিছুটা হতাশ হতে হবে বৈকি। কিন্তু ক্রুজের আতিথেয়তা, অতি উত্তম খাদ্যসম্ভার, রন্ধনশৈলী শেখানোর ক্লাস, স্কুইড শিকার আর নিজস্ব ডেক ক্যাবিন– সব মিলিয়ে আমার মধ্যবিত্ত মেজাজ যদি সামান্য উচ্চমার্গের হয় এক রাতের জন্য, তা হলেও ফিরে আসার পর কিছু সম্মোহনের রেশ থেকে যাবার কথা।

ভিয়েতনামের ম্যাপকে কোনো যুবতীর দক্ষিণে 'নন-লা' অর্থাৎ বাঁশের শঙ্কু আকৃতির টুপি পরা মাথা, সরু কোমরের মধ্যভাগ এবং এলানো স্কার্টের পাদদেশরূপে কল্পনা করে সেখানকার লোকজন। তিনটে ভাগ মিলিয়ে ভিয়েতনাম কিন্তু ঝটিতি সফরের জায়গা নয়। ধীরে-সুস্থে সময় নিয়ে আসা উচিত এখানে। কেননা, মধ্য ভিয়েতনামের হোই-আন বা দক্ষিণের মেকং নদীর অববাহিকা তো আপনি বাদ দিতে পারবেন না। মনে হয়, এককালের বন্দর শহর হোই-আন তার গৃহ বা উপাসনাস্থল, দোকান-বাজার, রাস্তা বা সংগ্রহশালায় ধরে রেখেছে সময়ের সব

হ্যানয় জাপানিজ প্যাগোডা

ছাপ। জাপানি প্যাগোডা সেতু, চীনাদের দ্বারা নির্মিত ষোড়শ শতাব্দীর ফুওক-কিন অ্যাসেম্বলি হল, যেখানে পূজিত হন সমুদ্রের দেবী– সব প্রায় অপরিবর্তিত অবস্থায়। জানা গেল, একটি সাধারণ জেলেদের গ্রামে পর্যবসিত হওয়া হোই-আনকে এরা আজকের পুরোনো অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছে গত কয়েক দশকে। রাত্রে থু-বন নদীর উপর লোকে লণ্ঠন ভাসিয়ে দেয়। রাতের বাজারটির মূল আকর্ষণ ঐ নানা রকমের, নানা শৈলীর চীনা লণ্ঠন। সারা পৃথিবী থেকে ভ্রমণার্থীরা আসে এখানে। কোলাহল আর সংরক্ষণ মিলেমিশে যায়।

অবশেষে সায়গন। কথাটা আসলে সাই গন, মানে লেবুর বাগান। ফরাসিদের শাসনকালে ইন্দোচীনের প্রধান শহর হয়ে ওঠে এই সায়গন। ১০০ বছরের ফরাসি আধিপত্য খতম হয়ে যায় ১৯৫৪তে, যখন জেনেভায় বসে বড় মাথারা দেশটাকে উত্তর ও দক্ষিণ দুটো ভাগে ভাগ কওে দেন। উত্তরে কম্যুনিস্টরা ক্ষমতায়। হো চি মিন চাননি আমেরিকা এই ভাই-ভাইয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ুক। কিন্ত উত্তরের পাশেই চেয়ারম্যান মাও-এর চীন, রুশ আর কিউবার সমর্থন তাদের নার্ভাস কওে দিল। ১৯৭৫-এ যখন শেষ আমেরিকান এ দেশ ছেড়ে চলে গেল, তখন অবধি সাধারণ আমেরিকান বুঝে উঠতে পারেনি– এ যুদ্ধে তারা জড়াতে গেল কেন! হো চি মিনের সামরিক বাহিনী এক ফরাসিভাষী হিস্ট্রি টিচারের নেতৃত্বে যা করে যাচ্ছিল তা হলো এক হার না মানা রেজিস্ট্যান্স। জেনারেল ভো-ইউয়েং-গিয়াপ তার নাম। সায়গন থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে চু চি টানেল এই প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে সংরক্ষিত। ২০০ কিলোমিটারের এই গুহাতন্ত্র কম্বোডিয়া থেকে ভিয়েতনাম পর্যন্ত লম্বা হো চি মিন ট্রেইলের অন্তিম প্রান্ত, যা হাজারো বোমায় আমেরিকানরা ধ্বংস করতে পারেনি। সায়গনে আছে ‘ওয়ার রেমন্যান্ট মিউজিয়াম’, যেখানে প্রদর্শিত নাপাম থেকে হাউইৎজার– সব কিছু। আমেরিকান ট্যুরিস্টরাও আসেন এখানে। আমার ভ্রমণসঙ্গীও ছিলেন প্রাক্তন মেরিন। আমার জানতে ইচ্ছে করেনি কী অনুভূতি হচ্ছিল তার, তিনিও বলেননি। কিন্তু সে দেশের পরাজয়ের এমন কোনো মনুমেন্ট সারা বিশ্বে যে নেই। সুতরাং অস্বস্তি তিনি এড়াবেন কী করে?

আজ এই শহরের নাম হো চি মিন সিটি। সারা পৃথিবীর মানুষে আজ জমজমাট রীতিমতো। ফরাসি স্থাপত্যের ছাপ রয়ে গিয়েছে শহরের গায়ে। পুরোনো প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস আজ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত। রি-ইউনিফিকেশনের চুক্তি সই হয়েছিল যে কক্ষে, সেটায় গিয়ে দাঁড়ালাম। অদূরে দেখা যাচ্ছে লাল পতাকা আর চাচা হো-র একটি ব্রোঞ্জের আবক্ষ মূর্তি। ঐ অত বড় ঘরে তখন আর কেউ নেই; আমি একা। আমার মনে হলো, এই কক্ষে কোলাহল তিনিও নিতান্তই অপছন্দ করবেন। এ নির্জনতা তার পক্ষে বেমানান নয়, অনভিপ্রেতও নয়।

TELE TELL COMMUNICATIONS

We deals with government of Bangladesh projects including equipment, infrastructure and defense

Tele Tell Communications was established in 1992 and has been dealing in the Government projects, import, marketing, installation & commissioning, and after-sales services of Telecom Equipment and accessories and Enterprise solutions.

সম্পাদক ॥ মাহমুদ হাফিজ

সম্পাদক কর্তৃক লিটল ম্যাগ প্রাঙ্গণ, ৭৯,আজিজ সুপার মার্কেট, ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।